বাংলার লোকঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী
যতীন্দ্রনাথ রায়

ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস
লিখিত ও সম্পাদিত

প্লা সে ন্টা

Banglar Lok Oitihyer Uttaradhikari
Jatindranath Ray

By Dr. Sujit Kumar Biswas

ISBN: 978-93-6128-063-4

প্রকাশকাল: আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক:
প্লাসেন্টা পাবলিকেশন, বগুলা কলেজ পাড়া,
বগুলা, নদিয়া, পিন-৭৪১৫০২
86375 62282

প্রচ্ছদ স্কেচ: সুজিতকুমার মণ্ডল, রানাঘাট
প্রচ্ছদ: সায়ন কুণ্ডু, কৃষ্ণনগর
বর্ণসংস্থাপন: প্লাসেন্টা গ্রাফিক্স
মুদ্রণ: শান্তি প্যাকার্স, কলকাতা ০৯

প্রাপ্তিস্থান:
ধ্যানবিন্দু
কলেজ স্কোয়ার ইস্ট, ব্লক ৪, স্টল ৬,
বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

Order on WhatsApp: 8637562282
eduola.in

মূল্য: ₹250.00

প্লা সে ন্টা

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ রায়ের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন
তাদের উদ্দেশ্যে

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থঃ

১। পাগলাখালির মাহাত্ম্য (১৪১০ বঃ)
২। বাদকুল্লা পরিচয় (২০০২)
৩। পায়রাডাঙা: নানা প্রসঙ্গ (২০০৪)
৪। নির্মল বিদ্যালয়ের রূপরেখা, দীপ প্রকাশন, (২০১৫)
৫। সুফিয়া মমতাজ (২০১৯) (কাহিনিকাব্য)
৬। শিশুবান্ধব বিদ্যালয়, দীপ প্রকাশন (২০২০)
৭। বৃহত্তর বাদকুল্লা তাহেরপুর ২০২১
৮। জন ইতিহাসবিদ মোহিত রায় (যন্ত্রস্থ)

সূচিপত্র

ভূমিকা

যতীন্দ্রনাথ রায় মৃত্তিকা- সংলগ্ন সংস্কৃতি- সাধক। লোকসংস্কৃতিচর্চায় তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগ প্রবল ও অকৃত্রিম এবং তা বহুমাত্রিকও। একদিকে তিনি লোকসংস্কৃতির নানা উপকরণ সংগ্রহ ও নিবন্ধ রচনায় আগ্রহী, অপরদিকে তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভায় লোকসংস্কৃতিচর্চার ভুবন প্রসারিত হয়েছে যার নিদর্শন নদিয়া জেলার প্রান্তিক পল্লি ভীমপুর আসাননগরে প্রবর্তিত লালনমেলা- আর -একদিকের কথায় বলতে হয় নবীন লোকগবেষকদের কাছে তিনি অপার প্রেরণা ও মরমি আশ্রয়।

যতীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুকালের- সেও ওই লোকসংস্কৃতির সূত্রেই, বিশেষভাবে বলতে গেলে লালনের কল্যাণে, লালনমেলার সুবাদে। ক্রমে এই সম্পর্ক গভীর ও প্রসারিত হয় পারিবারিক পর্যায়ে- সুখের কথা সেই সম্বন্ধ আজও অবিচ্ছন্ন ও তার শেকর বহুদূর বিস্তৃত।

এই সজ্জন-হিতকারী গ্রামমনস্ক মানুষটির মূল্যায়ন ও সমাদর যথাসময়ে হয়নি। এখন তাঁর অপরাহ্ন বেলা- যথেষ্ট বিলম্বেই গুণগ্রাহী স্বজনেরা তাঁর লোকসংস্কৃতি- সম্পৃক্ততার বিষয়টি সুধী সমাজে উপস্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর প্রিয়জনদের নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্য ধারণ করেছে ডক্টর সুজিতকুমার বিশ্বাস সম্পাদিত 'বাংলার লোকঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী যতীন্দ্রনাথ রায়' বইটি- এক বিশেষ অর্থে এই বইকে তাঁর সম্মাননা স্মারক হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। এই পরিণত বয়সেও যতীন্দ্রনাথ রায়ের সারস্বত সাধনা অব্যাহত থাকুক ও অন্যকে প্রাণিত করুক, এই শুভকামনা রইল।

১৩ জানুয়ারি ২০২৪

আবুল আহসান চৌধুরী
প্রফেসর বাংলা বিভাগ (অবসরপ্রাপ্ত)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

অভিমত
যতীন্দ্রনাথ রায়

আঞ্চলিক ইতিহাস মানবসভ্যতার ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। ঐতিহ্যবাহী বহমান সময়ের আঞ্চলিক ঘটনাবলির সমীক্ষার নিখুঁত চালচিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে সভ্যতার সামগ্রিক ইতিহাসের রূপদান করা হয়। তাই খন্ডিত ইতিহাস নয়, সামগ্রিক ইতিহাসেরই অঙ্গ হয়ে ওঠে আঞ্চলিক ইতিহাস। আঞ্চলিক ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা প্রধান না হলেও কখনও কখনো তাকে স্বীকার করতে হয়। ব্যক্তির সেই ভূমিকা সমাজের সামগ্রিক রূপের অংশবিশেষ। ডক্টর সুজিতকুমার বিশ্বাস আঞ্চলিক ইতিহাসের গবেষক হিসেবে বর্তমানে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব।

তিনি একটি অঞ্চলের ব্যক্তিবিশেষের কর্মকাণ্ডের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন করে তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। যা সমাজসংস্কৃতির ও লোকসংস্কৃতির অখন্ড ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়। আঞ্চলিক অথবা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সমাজের সামগ্রিক কর্মকান্ডে সেই সময়ের মানুষের ভূমিকা এবং ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সমাজের অগ্রগতির একমাত্র সহায়ক হয়। ব্যক্তির পরিচয়ের চেয়ে সমাজে সেই কর্মকাণ্ড যুগান্তকারী অবদান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। আলোচ্য বইটি লোকসংস্কৃতি জগতে ব্যক্তির অবদানের ভূমিকার চেয়ে সেই সময়ের সামাজিক সাংস্কৃতিক সামগ্রিক ইতিহাসের দলিল হয়ে ওঠে। আলোচ্য বইয়ে লেখক ও সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ রায়ের জীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোকপাত করেছেন। কেন্দ্রবিন্দুতে আছে লোকায়ত সংস্কৃতির যুগান্তকারী প্রেক্ষাপট। প্রকৃত অর্থে গবেষক হিসেবে সময় এবং সমাজে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন দক্ষতার সঙ্গে।

নিপুন শব্দচয়নে, তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণে সামগ্রিক সমাজের উন্নয়নে সংস্কৃতির ভূমিকা যেখানে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক অবদান, সংস্কৃতির বিপণ্নতা নিরসনের প্রয়াস সহ সংস্কৃতির বহুমাত্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন গবেষক সুজিতকুমার বিশ্বাস।

শ্রী রায়ের সবকিছু ক্রিয়াকর্ম সমাজের চলমান সময়ের ইতিহাসের চালচিত্র। ব্যক্তি নয়, সমাজের সামগ্রিক ইতিহাসের খণ্ডিত ছবি মাত্র। বইটিকে তিনি বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। যেমন- জন্ম শিক্ষা সাহিত্য লোকসংস্কৃতি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি লালন ফকির বিজয় সরকার অষ্টক পুতুলনাচ বাউল কবিগান সংগঠক সহ নানান বিষয়ে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও এপার ওপার বাংলায় সেতুবন্ধনের প্রয়াস, গুণীজন সান্নিধ্য ও বহু অপ্রকাশিত বিষয়ে আলোচনা এবং সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যোগ গ্রহণ করা তাঁর এক প্রশংসনীয় কাজ। সেই সঙ্গে অনুরাগীজনের মূল্যবান শুভেচ্ছা প্রতিবেদন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

সবশেষে একটি কথা বলা ভীষণ প্রয়োজন, এ বই আমাকে ঘিরেই। বহির গাছি আমার স্বপ্নের জনপদ। তাই আত্মকথন অতিরিক্তই বটে! আমার ধারণার অতীত যে আমাকে ঘিরে এমন একটা কাজ হতে পারে। আমি আপ্লুত। আনন্দিত। আমাকে ঘিরে আমার কথা ভেবে যারা কলম ধরেছেন তাদেরকে আমার অন্তরের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা।

ভালো থাকবেন সকলে।

লেখকের কথা

সালটা ২০০০। আমি তখন বহিরগাছি উচ্চবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের আংশিক সময়ের শিক্ষক। তার আগেই অবসর নিয়েছেন এই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়। কিন্তু এই বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র মুক্তবিদ্যালয়ের একটা শাখা ছিল। সেই সূত্রে তিনি এই বিদ্যালয়ে প্রায়শই আসতেন। একটা লম্বামাপের নিপুণ মানুষ। ধুতিপাঞ্জাবি পরিহিত। মাথার চুলগুলিতেও এক অনন্য বাহার। চুলগুলি আঁচড়িয়ে মাথার পিছনের দিকে দিয়ে দিতেন। এককথায় একবার দেখে ভদ্র কর্মঠ উদ্যমী পুরুষ বলে আমার মনে হত।

ঠিক ওই সময়ে যতীন্দ্রনাথ রায়ের মাতৃবিয়োগ হয়। আমরা বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক শিক্ষাকর্মীরা মিলে ওনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেই প্রথম মানুষটির সামনাসামনি আমার বসা। দেখা ও আলাপ। একটা আদ্যপান্ত আধুনিক মানুষ। অতি ধীরে ধীরে গুছিয়ে কথা বলতেন। একজন প্রণম্য ব্যক্তি তিনি। সেই থেকে মানুষটার নাম জানা। তার প্রতি একটা ভক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তৈরি হয়েছিল। বহিরগাছি গ্রাম যেমন সে সময় আমার প্রিয় হয়ে ওঠে, ঠিক এই গ্রামের প্রবাদপ্রতীম যুগপুরুষ শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ রায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়তে থাকে।

নদিয়া জেলার অন্যতম লোকচর্চার পীঠস্থান ছিল কদমখালি। এই স্থানটির পরিচিতি পায় দুই বাংলার লালনমেলা উৎসব হবার পর থেকেই। সেই বয়সে কয়েকবার এই তীর্থে আমি গিয়েছি। কিন্তু সে সময় আমি জানার চেষ্টা করিনি বা জানতে পারিনি যে, এই মেলার বা উৎসবের দীর্ঘদিনের সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ রায়। তারপর থেকে লোকচর্চার এবং স্থানীয় ইতিহাসের প্রতি ঝোক বাড়তে থাকায় অনেক স্থানে বা অনেক গ্রন্থ পত্রপত্রিকা উল্টেছি নিজের প্রয়োজনে। কিন্তু বারবার অনেকের সাথে একটি নাম নজরে পড়ত খুব বেশি। সেটি হল শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ রায়।

নদিয়া জেলার বহিরগাছি গ্রামে এই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির বাস। তিনি ১৯৬৬ সালের প্রধান শিক্ষক হিসেবে বহিরগাছি উচ্চবিদ্যালয়ে যোগ দেন। দীর্ঘদিনের প্রধানশিক্ষক ছিলেন তিনি এই বিদ্যালয়ের। নিজের গ্রামে নানাবিধ ও সামাজিক ও লোকসংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞে তিনি সামিল হয়েছেন স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে। মানুষটি আজ নদিয়া জেলার সীমানা ছাড়িয়ে দুই বাংলার একজন পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন। বহুবার তিনি বাংলাদেশে গিয়েছেন বিবিধ প্রয়োজনে। অনেক বিদগ্ধ পন্ডিত ব্যক্তিদের সাথে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছেন এই সময়ে। বহুবার বক্তব্য রেখেছেন বিভিন্ন আলোচনাসভায়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে লোকচর্চার কাজে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া পশ্চিমবঙ্গ লালনমেলা সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম সদস্য। সভাপতি, সহ-সভাপতি হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন কাজ সামলেছেন।

লোককবি বিজয় সরকারের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের নিবিড় সম্পর্ক। এই বিষয়েরও কমিটিতে যতীন্দ্রনাথ রায়ের ভূমিকা অন্যতম। লোকসাহিত্য ও লোকসংগীত বিষয়ে তাঁর

প্রবল আগ্রহ। আমাদের নদিয়া জেলার কিছু নিজস্ব লোকসংস্কৃতি রয়েছে। বোলান অষ্টক পুতুলনাচ তার মধ্যে অন্যতম। তিনি এসব বিষয়ে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছেন। যতীন্দ্রনাথ রায়ের লেখা প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। লালন ফকির, বিজয় সরকার, লোকগান তার মধ্যে অন্যতম। লেখকের বেশ কয়েকটি বই বর্তমানে প্রকাশের পথে। অকৃতদার মানুষটি অনেক ক্ষেত্রে আমার প্রেরণা। তিনি এই বয়সে পৌঁছেও নিজের কাজের প্রতি চিরতরুণ। ঘর ভর্তি বিবিধ গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার সম্ভার আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি এখন বিভিন্ন গ্রন্থ লেখার কাজে ব্যস্ত।

আমার মনে হয়েছে এই ব্যক্তিত্বকে নিয়ে একটা কাজ করা দরকার। দুই বাংলার বহু মানুষের সাথে তাঁর যোগাযোগ ও প্রতিনিয়ত আলাপ। “বাংলার লোকঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী যতীন্দ্রনাথ রায়” সম্পর্কে আমি তাই একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করতে ব্রতী হই। যতীন্দ্রনাথ রায়ের নিকট থেকে তাঁর সম্পর্কে অনেক তথ্য পেয়েছি। দুই বাংলার অনেক বিদগ্ধজন তাঁর বিষয়ে কতিপয় মন্তব্য দিয়ে এই গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেছেন।

যারা এই কাজে আমাকে সহযোগিতা করলেন তাদের প্রত্যেককে আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন। যতীন্দ্রনাথ রায় তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে চিরতরুণ থাকুন এ আমার প্রত্যাশা। প্রচ্ছদে যতীন্দ্রনাথ রায়ের স্কেচ এঁকে দিয়েছেন সুজিতকুমার মণ্ডল। তাকে আমার শুভেচ্ছা। বইটি ছাপার দায়িত্ব নিয়েছেন প্লাসেন্টা প্রকাশনীর পক্ষে রণজিৎ বালা। এই গ্রন্থে যে সকল জ্ঞানীগুণীজন লেখা দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আগামীদিনে প্রয়োজনীয় লেখা নিয়ে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত হবে। আর যাকে নিয়ে এই গ্রন্থ রচনা সেই ব্যক্তিত্ব যতীন্দ্রনাথ রায়কে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।



পর্ব এক
প্রথম অধ্যায়
জন্ম, শৈশব, শিক্ষা, পেশা

লেখক গবেষক যতীন্দ্রনাথ রায়ের ছোটোবেলার তথ্য সে রকম ভাবে পাওয়া যায় না। অনেক অল্প বয়সে তিনি এই দেশে চলে আসেন। তাই বাল্যকালের অনেক ঘটনায় তিনি স্মরণে আনতে পারেননি। অতি দ্রুততার সাথে প্রকাশিত হতে চলেছে লেখকের অন্যতম গ্রন্থ 'কাঁটাতারের ওপার এপারঃ আত্মকথনের পদাবলি'। এই বইয়ে লেখক তাঁর জীবনের অনেক কথা বর্ণনা করেছেন।

লেখকের পূর্বনিবাস ছিল বাংলাদেশের যশোর জেলার মাগুরা শ্রীপুরের অন্তর্গত রাধাকান্তপুর গ্রাম। লেখকের জন্মস্থান রাধাকান্তপুর। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২রা অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ ও সংগঠক শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায়ের পিতা ছিলেন কৃষ্ণলাল রায় এবং মাতা ছিলেন তুলিরানি দেবী। কৃষ্ণলাল রায়ের চারপুত্র ও তিনকন্যার মধ্যে যতীন্দ্রনাথ রায় শিক্ষকতা পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ রায়ের ভাই ও বোনেরা হলেন যথাক্রমে মন্মথনাথ, ক্ষিরোদচন্দ্র, তপন, সুধারানি, গীতা ও অনিতা।

বর্তমানে নদিয়া জেলার রানাঘাট ২ ব্লকের বহিরগাছি গ্রামে লেখকের বর্তমান ঠিকানা। নিকটবর্তী রেলস্টেশন- বহিরগাছি হল্ট ও ডাকঘর- হাটবহিরগাছি। লেখক জন্মভূমিতেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে পরিবারের সাথে বহিরগাছি গ্রামে আসেন। লেখকের জ্যাঠামশাই ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব কেশবলাল রায়। তাঁর নামের সাথে এলাকার বিশেষ পরিচিতি। সেই সময় থেকে বিভিন্ন কাজে নেতৃত্ব দিতেন কেশবলাল। তৎকালীন ইউনিয়ন বোর্ডের তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সে সময় বহিরগাছি জনপদে এক মুসলমান জমিদার ছিল। তাঁর নাম ছিল সৈয়দ মির্জা।

এলাকায় একটি মসজিদ ছিল। আগে যে এখানে বসতি ছিল তা এই মসজিদ প্রমাণ করে। কিছুকাল আগে পর্যন্তও অনেকে দেখেছেন। কিন্তু বর্তমানে তার আর কোনো অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। বিভিন্ন সময়ে লেখক যতীন্দ্রনাথ রায় জ্যাঠামশাই কেশবলাল রায়ের সাথে বহিরগাছি জনপদের উন্নয়নে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এই এলাকার উন্নয়ন নিয়ে তিনি অনেক ভাবনাচিন্তা করেন। জ্যাঠামশাইয়ের আদর্শ দেখেপরবর্তীকালে যতীন্দ্রনাথ রায় উৎসাহিত হন।

লেখকের ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহ ছিল বরাবর। তিনি ইতিহাস বিষয় নিয়ে স্নাতক সম্মানিক ও পরে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি উত্তীর্ণ হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৬৬ সালে সরাসরি বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। ১৯৯৯ সালে বহিরগাছি বিদ্যালয় থেকে ৩৩ বছর কর্মসম্পাদন করার পর কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
শিক্ষায়তন ও প্রধানশিক্ষক

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর এই দেশে সাধারণ মানুষ শিক্ষার উপযোগিতা অনুভব করতে থাকেন। সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ভুলে মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ পেল। পশ্চিমবঙ্গে একটা উদ্বাস্তু মানুষের আগমন ঘটতে থাকে। মানুষের ঢল নামল এই বাংলার বিভিন্ন স্থানে। গভীর নির্জন পথে পা বাড়াল অগণিত ছিন্নমূল মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের বনজঙ্গল গ্রামগঞ্জে মানুষের বসবাস শুরু হল নতুন করে। বহিরগাছি তার ব্যতিক্রম নয়। এখানেও শুরু হল নতুন বসতি। বিভিন্ন জীবজন্তুর ভয় দূর করে মানুষ নতুন করে ঘর বাঁধার সাহস পায় বহিরগাছিতে কিছু স্থানীয় মুসলমান ও হিন্দু নিয়ে স্বাধীনতা পূর্বের বহিরগাছিতে।

এই জনপদে শিক্ষায়তন বলতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। অগণিত মানুষের পদধ্বনিতে মুখরিত হল এই সাধারণ অঞ্চল। সাধারণ মানুষ অনুভব করে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। একটি জুনিয়র হাইস্কুল সমবেত প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বিদ্যালয় পরবর্তীকালে উন্নীত হয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। আজ যেখানে বিদ্যালয় ও খেলার মাঠ এই জায়গায় একদিন ছিল ঘন জঙ্গল। একটা ভয়ের পরিবেশ। সেই বনজঙ্গল কেটে স্থাপিত হয়েছিল জুনিয়ার হাই স্কুল। মানুষের দুর্জয় সাহস ও দূরন্ত প্রেরণায় ছিল তাদের সম্বল।

একটা দীর্ঘ সময় ধরে যতীন্দ্রনাথ রায় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। সরাসরি এই পদেই তার নিয়োগ। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ে এসেছেন অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মচারী। কত ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছেন এই সময়কালের মধ্যে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নানান ক্ষেত্রে প্রতিভাধর মানুষেরা এসেছেন। প্রধান শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ রায় শুধু বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে তাঁর প্রভাব সীমাবদ্ধ রাখেননি। স্থানীয় পরিমন্ডলে জেলার মধ্যে তার বিদ্যালয়কে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচিত করে তুলেছিলেন। অনেক সময়ে আপন চেষ্টায় নানাবিধ কার্যসম্পাদন করেছেন তিনি। লোকসংস্কৃতির অনেক অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছেন নিজের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

বহিরগাছি উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তিনি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে আয়োজন করেন পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পী ও সহশিল্পী সমাবেশ এবং কবিগানের আসর। তখন বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি সংসদের তিনি সাধারণ সম্পাদক। প্রসঙ্গত এই সংস্থার তৎকালীন সভাপতি ছিলেন মানিক সরকার। বাংলার কবির লড়াই বা কবিগান বাঙালির বিশেষ করে কৃষিজীবী শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষের প্রাণের প্রিয় সম্পদ। এই সম্পদকে ধরে রাখার জন্য বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি সংসদ বহিরগাছি উন্নয়ন সংঘ মতুয়া মহাসংঘ ও এলাকার জনসাধারণের সহযোগিতায় লোককবি রাজেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের জন্মশতবর্ষ দিবসে পশ্চিমবঙ্গের লোককবি ও সহশিল্পীদের সমবেত করে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের এই উৎসব এক ভিন্নমাত্রা এনে দেয়।

পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২৫ থেকে ২৬ শে জানুয়ারি ১৯৯৪ সালে বহিরগাছি উচ্চতর

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাংলার কবিয়াল সম্মেলন হিসাবে এক কবিগানের আসর বসান। কবিগানের ক্রমবিকাশ এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধন, লোককবি বা কবিয়ালদের ঐক্যবন্ধন তাদের সাধনার মান উন্নয়নের প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যতীন্দ্রনাথ রায় মুখ্য ভূমিকা রাখেন। সেই অনুষ্ঠানে "কবিগান ও কবি" নামে একটি সম্পাদিত পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। যার সম্পাদনা করেন মানিক সরকার ও গৌতম অধিকারী। প্রসঙ্গত বলে রাখি ১৯৭৫ সালে বাদল সরকারের কালজয়ী নাটক এই হাইস্কুল প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ হয়েছে।

প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন যতীন্দ্রনাথ রায়ের জীবনে এই দুই অনুষ্ঠান যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। একটি এলাকার এত বড়ো বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক হিসেবে যতীনবাবুকে অনেক কাজ সামলাতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর জীবন পড়ে থাকত লোকগবেষণার প্রতি। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে বহু ছাত্রছাত্রী আজ সাফল্যের শিখরে পৌছেছে। আজও 'মাস্টারমশাই' নাম নিয়ে তিনি নিজের এলাকায় যথেষ্ট সম্মান নিয়ে বেঁচে আছেন। বিদ্যালয় প্রধানশিক্ষক আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান ও যতীন্দ্রনাথ রায় মিলেমিশে আছে একটি পংক্তিতে।

কোনো একটি স্থানে সেখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অধিক গুরুত্ব রাখে। এলাকার আর্থসামাজিক শিক্ষা সংস্কৃতির এক চিহ্নিত পরিসর বিদ্যালয় থেকে প্রতিভাত হয়। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর অনেক স্মৃতি নিয়ে ছিন্নমূল মানুষেরা এই পশ্চিমবঙ্গে আসেন। মানুষের ঢল নামল বনে জঙ্গলে বা সাধারণ স্থানে। গভীর পরিবেশে নির্জনে দলবদ্ধ হয়ে তাঁরা বসবাস শুরু করেছিল শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে। বহিরগাছিও তার বাইরে নয়। এখানেও ছিন্নমূল মানুষেরা দলবদ্ধ ভাবে এসে নতুন করে জনপদপত্তন করে।

মানুষের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের পর শিক্ষা স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল। এখানে শিক্ষায়তন বলতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল। অগণিত মানুষের পদধ্বনিতে মুখরিত হল এই অঞ্চল। জনবসতির সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষায়তনের প্রয়োজন অনুভূত হল। প্রতিষ্ঠিত হল জুনিয়র হাই স্কুল। স্কুলের সমবেত প্রচেষ্টা অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এবং অকৃপণ দানে। এই বিদ্যালয় পরবর্তীকালে উন্নীত হল উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়েই যতীন্দ্রনাথ রায় ৩৩ বছর প্রধান শিক্ষকতা করেছেন। তাই বিদ্যালয়ের অনেক ঘটনার তিনি পরিচালক ও ঘটনার সাক্ষী।

আজ যেখানে এই বিদ্যালয় ও খেলার মাঠ এই জায়গাও ছিল ঘন জঙ্গলে ঘেরা। জঙ্গল কেটে স্থাপন হয়েছিল বিদ্যালয়। বহু মানুষের অকুণ্ঠ দানে, সহযোগিতায় ও নিরলস প্রচেষ্টায় বহিরগাছি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। সম্ভবত ১৯৫০ সাল নাগাদ জুনিয়র হাই স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে ক্লাস শুরু হয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণিকে নিয়ে। তারপর নানাভাবে বিদ্যালয় ভবন তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়। খেলার মাঠের জমি, বিদ্যালয়ের ঘর তৈরি প্রস্তুতির কাজগুলি নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে হাত দেওয়া হয়। সাম্মানিক স্নাতক ডিগ্রি পাস করে স্নাতকোত্তর পড়ার সময় সকলকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলেন যতীন্দ্রনাথ রায়। এই সময়ে অর্থনৈতিক সংকট ছিল বিদ্যালয়ের প্রধান অন্তরায়। স্বেচ্ছায় বিনামূল্যে জমি দান, স্বেচ্ছাশ্রমে বন জঙ্গল কেটে বিদ্যালয় গৃহের পত্তন, আর্থিক সহায়তা গ্রহণ, সকলের সম্মিলিত আন্তরিক প্রয়াস ছিল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার

নেপথ্য ইতিহাস। আর এইসব কাজে সকলের পুরোভাগে যিনি অন্যদের সাথে থেকেছেন তিনি হলেন যতীন্দ্রনাথ রায়। ১৯৬৪ সালের ১ জানুয়ারি এই বিদ্যালয় হাইস্কুলের অনুমোদন পায়। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক শরৎকুমার মৃধা অবসর গ্রহণ করলে। ৫ই মে ১৯৬৬ তে যতীন্দ্রনাথ রায় প্রধানশিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি জরুরিভাবে অনেকগুলি শিক্ষক পদের অনুমোদন মঞ্জুর করেন। ১৯৭৬ সালে বিদ্যালয়টি উচ্চমাধ্যমিক পর্বে উন্নীত হয়। প্রারম্ভিক স্তরে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কম হওয়ায় ছাত্রছাত্রী সংগ্রহের জন্য অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে প্রধানশিক্ষক যতীন্দ্রনাথ রায় অংশ নেন এবং প্রধানশিক্ষক বিদ্যালয়কে একটি মানে পৌঁছে দেবার জন্য অনেকগুলি সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর অবদানের কথা বহিরগাছির মানুষ কোনোদিন ভুলবে না। 'মাস্টার মশাই' এই শব্দটি বহিরগাছির মাটিতে শুধুমাত্র যতীন্দ্রনাথ রায়ের জন্য। এই বিদ্যালয়ের পাশাপাশি এলাকাতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং রবীন্দ্র মুক্তবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনে বাঁধাহীন অবদান স্থাপন করেছেন তিনি।

তৃতীয় অধ্যায়

জনহিতকর উন্নয়নমূলক কাজ

শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ রায় তাঁর সারাটি জীবন ধরে শুধুমাত্র উন্নয়নমূলক কাজ করে গিয়েছেন। এলাকার স্বার্থে মানুষের স্বার্থে তিনি প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার উন্নয়নমূলক কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন তিনি। ফরিদপুরের গান্ধী চন্দ্রনাথ বসুর সাথে একসময়ে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। চাষাবাদের সুবিধার জন্য খাল কাটার কর্মযজ্ঞে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এবং নিম্নবর্গের মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন প্রতিনিয়ত। বিপ্লবী ও সমাজসেবী পান্নালাল দাশগুপ্তের সাথে ছিল এক নিবিড় সম্পর্ক। ১৯৭১ সালে চন্দ্রনাথ বসু ও পান্নালাল দাশগুপ্তকে সাথে নিয়ে বন্যা কবলিত এলাকায় ব্যাপক ত্রাণের কাজ এবং বহিরগাছিতে স্টেশন নির্মাণ করার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

শিক্ষা পরিবেশ আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে পান্নালাল দাশগুপ্তের কর্মযজ্ঞে নিজেকেযুক্ত করাই ছিল যতীন্দ্রনাথ রায়ের জীবনের অন্যতম ব্রত। সামগ্রিক এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মের রুপরেখা তৈরি, সমীক্ষার ক্ষেত্রে নিরলস কর্মে যুক্ত থাকা এবং ক্ষেত্রসমীক্ষার পর সিএডিপির জন্মে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নিজের বাড়িতেই গড়ে ওঠে ধর্মগোলা। পান্নালাল দাশগুপ্ত, অজিত নারায়ণ বসু, বাদল সরকার, বিষ্ণু মন্ডল, গৌরকিশোর ঘোষ, অম্লান দত্ত, আরতি সেন এদের সঙ্গে সেমিনারে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন শ্রী রায়। একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতেই হবে যে এলাকা উন্নয়নমূলক নানা প্রবন্ধ তিনি 'কম্পাস' পত্রিকায় নিয়মিত পাঠিয়েছেন এবং সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে নিয়মিত। স্বনির্ভর প্রকল্পে ঋণ দান, বৃক্ষরোপণ,,মীনমঙ্গল উৎসব, ইছামতি সংস্কার আন্দোলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা পুরুষ। এক বিঘা জমি দান করে তিনি গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতি এবং পাঁচ কাঠা জমি দান করে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি ভূমিকা রাখেন।

যতীন্দ্রনাথ রায়ের জীবনের এই পথ অতি দীর্ঘ। অবিভক্ত ভারতের যশোর জেলার রাধাকান্তপুর থেকে নদিয়ার বহিরগাছি। কিশোর বয়সের সেদিন আর আজকের জনজীবনের মধ্যে কত ব্যবধান! জঙ্গলাকীর্ণ এলাকার মাঝে উদ্বাস্তু আগমন এবং সেখানে নতুনভাবে বসবাস শুরু করা। এ সময়ে না ছিল সুস্থ জীবন জীবনযাত্রার উপায় বা জীবনের স্বাচ্ছন্দ। তবে রেল লাইনটা ছিল বহিরগাছির ল্যান্ডমার্ক। বাকি সবটাই অকল্পনীয় যন্ত্রণাময় দিনযাপন। উদ্বাস্তু আগমনের পর এখানকার জনসংখ্যা স্বাভাবিক নিয়মে বেড়ে যায় এবং বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজন হয়। পথঘাট পুকুর হাটবাজার এগুলি ছিল প্রাথমিক প্রয়োজন। এলাকার এই সমস্ত কাজের সাথে শ্রদ্ধেয় শ্রী রায়ের অন্তর্ভুক্তি এবং ভূমিকা ছিল অকৃত্রিম। তৎকালীন ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন কেশবলাল রায়। তিনি সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথ রায়ের জ্যাঠামশাই।

সকলের সাথে যতীন্দ্রনাথ রায় এলাকার পথঘাটের দিকে প্রথম নজর দেন। কাদাময়

আঁকাবাঁকা দুর্গম রাস্তাকে ব্যবহারের উপযুক্ত করার জন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তবে এই কাজে অনেক বাধারও সম্মুখীন হন তিনি। পরবর্তীতে এলাকার হাট বাজার গড়ে তোলার জন্য সকলের সাথে তিনিও ভূমিকা রাখেন। কালের নিয়মে বহিরগাছির হাট আজও নদিয়ার একটি জনপ্রিয় হাট হিসেবে পরিচিত।

বহিরগাছিতে তারপর প্রয়োজন হয় একটি পোস্ট অফিসের। দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বহিরগাছিতে ডাকঘর প্রতিষ্ঠার জন্য সকলে মত দেন। আজও যতীন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতিতে আছে হরিপদ রানারের কথা। পরবর্তীকালে হাইস্কুল সংলগ্ন একটি ঘরে পোস্ট অফিস স্থানান্তর হলে যতীন্দ্রনাথ রায় সেই ডাকঘরের উন্নতিকল্পে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তপশিলি অধ্যুষিত বহিরগাছি এলাকায় অনেকে তাঁতের কাজ করতেন। তাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁত সমিতি। কয়েক বছর চলার পর বন্ধ হয়ে গেলে তাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যতীন্দ্রনাথ রায় আরেকটি সভা ডাকেন। এই বিষয় নিয়ে যেখানে যেখানে যাওয়ার দরকার তা তিনি নিজে গিয়েছেন। রেল স্টেশন নির্মাণ এবং ফ্লাগ স্টেশন বহিরগাছিতে করার জন্য অনেক দিন ধরে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিনিয়ত ডিআরএম, জিএম এবং রেলবিভাগের সর্বস্তরে যোগাযোগ করা, রেলের পরিসেবা, গেদে -শিয়ালদহ বিভাগের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা বিভিন্ন দাবি দাওয়া পেশ, প্ল্যাটফর্ম, ওভার ব্রিজ, রেল গেট ইত্যাদি বিষয়ে অবস্থান অবরোধ রেলবিভাগের দৃষ্টিআকর্ষণ ও প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের জন্ম থেকে প্রশংসনীয় ভূমিকা ও রানাঘাট গেদে, রানাঘাট বনগাঁ শাখার বৈদ্যুতিকরণের দাবি নিয়ে পাঁচজনের টিমে দিল্লিতে রেলমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান এর সাথে সাক্ষাৎকার এবং পরে বৈদ্যুতিকরণ সম্ভব হয়। এর পিছনে যতীন্দ্রনাথ রায়ের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

পাঁচ এবং ছয় এর দশকে বহিরগাছির ছাত্র-ছাত্রী ও যুব সম্প্রদায় স্টেশনের দাবিতে বিভিন্ন উপায়ে ট্রেন থামাতে থাকেন। তারপর বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিয়ত আবেদন পত্র পাঠানো হয়। যার মূলে ছিলেন যতীন্দ্রনাথ রায়। রেল ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল রেলগেট বা লেভেল ক্রসিং চিহ্নিত করা। এর জন্য কয়েকবার অবরোধ করা হয়। প্রতিনিধিরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দাবিপত্র পেশ করেন। সকলের সহযোগিতায় সেই কাজও একদিন সম্পন্ন হয়। বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্তের সান্নিধ্যে যতীন্দ্রনাথ রায় নিজের এলাকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেন। স্থানীয় কলমার বিল থেকে বেরিয়ে আসা একটি খাল নতুন করে কাটা হয় সকলের সুবিধার জন্য। ১৯৭২ সালে বরণবেড়িয়াতে একটি মহিলা সমিতি গঠিত হয়। তাদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে শ্রী রায় অন্যতম ভূমিকা রাখেন।

বহিরগাছি এলাকার স্যালো ডিপ টিউবওয়েল বসানো এবং গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের জন্য লিখিত আবেদন, গ্রাহক তালিকা তৈরি করা এবং আড়ংঘাটা অফিস থেকে জেলা স্তরের অফিস পর্যন্ত ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজ শুরু করা হয়। বহিরগাছিতে বৈদ্যুতিকরণের জন্য প্রথম সভা ডাকেন যতীন্দ্রনাথ রায়। কিন্তু সকলে সেভাবে সাড়া দেননি। রমেশ সরকারকে সাথে নিয়ে তিনি সবার বাড়িতে পৌঁছান ও কিছু গ্রাহক জোগাড় করেন। এক্ষেত্রে অনেক গ্রামবাসী ইলেকট্রিকের তার লাগাতে বাধা দেয়। আজ বহিরগাছিতে যে বিদ্যুতের আলো এসেছে, জনজীবনে অজস্র সুযোগ-সুবিধা এসেছে তা

যতীন্দ্রনাথ রায়ের সৌজন্যে।

বিল নদী পরিবেশ ভাবনা নিয়েও যতীন্দ্রনাথ রায়ের অনেক ভাবনা ছিল। এবং তিনি সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেন। খাল সংস্কার, স্লুইস গেট তৈরি, বহিরগাছির দক্ষিণে কলমার বিল নিয়েও তাদের অনেক ভাবনা ছিল।

সে সময় বহিরগাছি এলাকাতে জনস্বাস্থ্য নিয়ে তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। এই এলাকায় একসাথে বহু মানুষের আগমন হওয়ায় স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেকেই সমস্যায় পড়তে থাকেন এবং চিকিৎসার জন্য গভীর সংকট তৈরি হয়। বিশেষ প্রয়োজনে রোগীদের পার্শ্ববর্তী আড়ংঘাটায় নিয়ে যাওয়া হত। ১৯৭৫ সাল নাগাদ তৎকালীন বিডিও সাহেবের পরামর্শে একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গঠনের অনুমোদন মেলে। কিন্তু নানা প্রতিকূলতার জন্য তা ফলপ্রসু হয় না। পরে সেখানে তৈরি হয় একটি শিশুদের স্কুল। বিদ্যালয় এর নামটিও দেন যতীন্দ্রনাথ রায়।

নদিয়ার প্রথম ধাপের প্রথম স্থানের রবীন্দ্র মুক্তবিদ্যালয় ছিল বা বিকল্প শিক্ষালয় ছিল বহিরগাছিতে। শিক্ষা ব্যবস্থায় মুক্ত শিক্ষা চালু করার পর থেকে বহিরগাছিতে সাফল্যের সাথে এই বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ রায়ের জন্য বিদ্যালয়ের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এই বিদ্যালয় থেকে ভালো ফল করে জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে ও সফল হয়। নদিয়ার বহু স্থান থেকে ছাত্রছাত্রীরা এখানে পাঠ নিতে আসত। এই সাথে জাতীয় সেবা প্রকল্প জনসেবার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা জনসেবা করার সুযোগ পায়। বহিরগাছি উচ্চ বিদ্যালয়ে তাই প্রধানশিক্ষক যতীন্দ্রনাথ রায় জাতীয় সেবা প্রকল্প চালু করেন।

এই সাথে যতীন্দ্রনাথ রায় আরও অনেকগুলি পরিকল্পনার রূপরেখা প্রস্তুত করেন। আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য আদর্শ পরিকল্পিত পরিবেশের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। বহিরগাছি গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতি তাঁর সৃষ্ট একটি মঞ্চ। এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ দেখা ও তার যথার্থ প্রয়োগ করা এই সংস্থার প্রধান দায়িত্ব। প্রতিটি কাজের সঙ্গে শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ রায় চিরকাল আদৃত হয়ে থাকবেন এলাকার মানুষের কাছে।

যতীন্দ্রনাথ রায় ছিলেন বহিরগাছি উচ্চ বিদ্যালয়ের দীর্ঘ ৩৩ বছরের প্রধানশিক্ষক। তাই বিদ্যালয়ের নানা ঘটনা ও কার্যক্রমের তিনি অন্যতম পুরোধা। সে কথা অপর অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। নারী শিক্ষার বিস্তারের জন্য বহিরগাছি হাইস্কুল কিছুদিনের জন্য তিনি বালিকা বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করেন। যা পরবর্তীকালে অনুমোদন লাভ করে এবং অনেক ছাত্রী নিয়ে বিদ্যালয়টি চলছে। এ ক্ষেত্রে মাস্টার মশায়ের ঋণ কেউ ভুলতে পারবে না। যতীন বাবু এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এ কথা বহিরগাছির মানুষ কোনোদিন ভুলবে না।

বহিরগাছি এলাকায় জলপ্রকল্পের উদ্যোগ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বহিরগাছি গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে জমি দিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। পঞ্চায়েত অফিস সহ বর্তমানে একটি সুন্দর ব্যবসাবাণিজ্যের জায়গা প্রস্তুত হয়েছে। বহিরগাছি থেকে কত মানুষ এখন বাইরে জীবিকার সন্ধানে যাতায়াত করছেন। একদিনের সেই বহিরগাছি আজ প্রকৃতই নতুন হয়ে উঠেছে। হাজার স্বপ্ন পরিকল্পনা রয়েছে এর পিছনে। এখনও কত স্বপ্ন আছে শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ রায়ের কাছে।

চতুর্থ অধ্যায়

লোক সংস্কৃতি লালনমেলা ও বিজয় সরকার

লোকসাহিত্য ও লোকসংগীত বিষয়ে অবিরাম যোগাযোগ, সংহতি স্থাপন ও দুই বঙ্গের মধ্যে সেতুবন্ধনের বিষয়ে যতীন্দ্রনাথ রায় মুখ্য ভূমিকা রাখেন। কয়েক দশক ধরে অষ্টক দলের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ তাঁর। হাঁসখালি ব্লকের গাড়াপোতায় অষ্টক মেলার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন দীর্ঘদিন। চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক পূজা ও গাজন উৎসবে অষ্টক গানের প্রবেশ এক ভিন্নমাত্রা যোগ করে। দূরদর্শনে কয়েক বছর আগে এই নাচ প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়। বঙ্গীয় পুতুল নাট্য সংঘের সঙ্গে প্রথম থেকে সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। বর্তমানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুতুল নাচ প্রদর্শনের কাজে সক্রিয় ভূমিকা অব্যাহত। ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি সংসদ। প্রথম থেকেই এই সমিতির সাধারণ সম্পাদক তিনি। লোক শিল্পীদের বিষয়ে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ও সংরক্ষণ। লোক শিল্পীদের সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন বিষয়ে সমিতির মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা এখনও অব্যাহত।

নদিয়া জেলা তথা দুই বাংলায় লালন ফকিরের নামাঙ্কিত মেলা ও উৎসবের পিছনে যাদের নাম আছে তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিলেন যতীন্দ্রনাথ রায়। সে বছর ছিল লালন ফকিরের মৃত্যুর শততম বর্ষ। সেই দিনকে লক্ষ্য রেখে নদিয়া জেলার কতিপয় বিদগ্ধ মানুষ এই অনুষ্ঠান করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সকলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমান ক্ষেত্র অর্থাৎ কদমখালির বুকে ঝরো নদীর পাড়ে এই লালন মেলার প্রস্তুতি আয়োজন শুরু হয়। ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই মেলা। সকলের উদ্যোগে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালন মেলা সমিতি। প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম সদস্য এবং মেলার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায়। সহ-সভাপতি হিসেবে প্রথম বর্ষে তাঁর প্রবেশ। তারপর কার্যকরী সভাপতি এবং সভাপতি হিসেবে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে তিনি কার্যসম্পাদন করেছেন। ২০১৮-১৯ সালেও তিনি আবার দায়িত্বে ফিরে আসেন।

লালন মেলার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানুষ সত্য ও মানবতাবাদের বাণী এবং লালনের ও অন্যান্য পদকর্তার ও মহাজনের গানে আলোচনায় ও সেমিনারে এই মেলা দুই বাংলার তার স্থান করে নিয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে সর্বপ্রথম আয়োজিত লালন মেলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামীণ চিরায়ত সংস্কৃতির জাগরণ এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যাপক সেতুবন্ধনের সম্পর্ক রচিত হয়। এই কাজে অন্নদাশঙ্কর রায়, মানিক সরকার, ডক্টর অরুণ বসু ও বাংলাদেশের ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরি, ডক্টর মোমেন চৌধুরি ও মনিরুজ্জামান সহ দুই বাংলার অসংখ্য বাউল ফকিরের আগমনে ও সুরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

যতীন্দ্রনাথ রায় তাদের প্রতিষ্ঠিত লালন মেলা নিয়ে একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করছেন। সেই বইটিও প্রকাশের পথে। গ্রন্থের নাম 'লালন মেলার ইতিবৃত্ত ও লালনতীর্থ কদমখালি'।

এই মেলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আমরা যতীন্দ্রনাথ রায় কে বেশি চিনে থাকি। লোকসংস্কৃতির প্রতি অদম্য প্রেম এই মেলা থেকেই। নদিয়াবাসি উপলব্ধি করেছে।

১৩৯৭ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৯০ সালে এই মেলার শুভ প্রবর্তন হয়। বাউল ফকিরদের নাম নথিভুক্তিকরণ, মাঙ্গলিকী, বেদি নির্মাণ ও প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠান্তে শ্রদ্ধা নিবেদন, লালনগীতি পরিবেশন, বাউল ফকিরদের সভা, বাউল গানের আসর এই উৎসবের প্রধান দিক। তখন আশ্বিন মাসের শেষ দিন মেলার উদ্বোধন হত। আর কার্তিক মাসের প্রথম তিন দিন চলত এই মেলা। এই লালন মেলার প্রচার প্রসার এতটাই ছিল যে, স্থানীয় মানুষেরা প্রচুর আগ্রহ দেখাতেন ও ভিড় করতেন। শুধু বয়োজ্যেষ্ঠরা নয়। সব বয়সী মানুষেরাই দলবেঁধে আসতেন এবং বিভিন্ন কণ্ঠে লালন ফকিরের গান শুনতেন।

প্রথম বছরের কার্যনির্বাহী সভাপতি ছিলেন মানিক সরকার। সহ-সভাপতি ছিলেন যতীন্দ্রনাথ রায় ও সুশান্ত হালদার। সম্পাদক ছিলেন সুকুমার সরকার। আর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। প্রথম এই অনুষ্ঠানের জন্য শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন মাননীয় অন্নদাশঙ্কর রায়। ডঃ আবুল আহসান চৌধুরি। বিদগ্ধ জনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শান্তিদেব ঘোষ, ডক্টর তুষার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর অরুণ বসু, ডঃ সুধীর চক্রবর্তী, মোহিত রায়। ও প্রবীণ বাউল আজমত শাহ।

লোক কবি বিজয় সরকারের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ রায়ের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিনের। বিজয় জন্মোৎসবেও দীর্ঘদিন যুক্ত এবং বিশেষ করে বিজয় সরকারের জন্মশত বর্ষ উদযাপন ও বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, বাংলাদেশে যাওয়া ও মহসিন হোসাইন ডঃ খন্দকার রিয়াজুল হক নিরঞ্জন অধিকারী মীনা বড়ুয়া এদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত করার ক্ষেত্রে এবং কার্যকরী সভাপতি হিসেবে গুরু দায়িত্ব পালন করা। এপার বাংলার ডক্টর তুষার চট্টোপাধ্যায় পবিত্র সরকার দীনেশ সিংহ সমস্ত কবিয়াল ও লোকশিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে ও পরবর্তীতে আবু বক্কর সিদ্দিকী মোস্তফা জামান আব্বাসি ফেরদৌসী রহমান নাসিদ কামাল রওশন আলি সইফুল ইসলাম ও আসাম ত্রিপুরা শিল্পীদের উৎসবে যোগদানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

মহাত্মা লালন ফকির ভারতীয় উপমহাদেশের এক মহান সাধক ও বিস্ময়কর প্রতিভা। গান চলচ্চিত্র প্রবাদ রচনার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ কমবেশি লালন ফকির সম্পর্কে সম্যক অবগত। সাধক গায়ক কবি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক মানবতাবাদী এক মহান পুরুষ হিসেবে লালন ফকিরের বিশ্বব্যাপী নাম। অথচ আশ্চর্য শিষ্ট সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের তথাকথিত স্বীকৃতি না মিললেও লালনের অসাধারণ সৃষ্টি আপামর জনসাধারণের মনের করাক ও প্রাণের সঞ্জীবনী শক্তি হয়ে শতাব্দীকাল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগৎকে শুধু সমৃদ্ধই করেননি, লোকসংস্কৃতিকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এবং বাঙালি সমাজ জীবনের বিবর্তনের ইতিহাসে মহাত্মা লালন ফকিরের এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

এই লালন কে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ রায়ের চর্চা। তাকে এই বাংলায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য

হাজার আন্দোলন। আজ তিনি সফল। লালন ফকিরের জীবন ও দর্শনের ওপর তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। লালনের একজন প্রসিদ্ধ গবেষক বললেও তাঁর সম্পর্কে অত্যুক্তি হয় না। এই বাংলার লালন সংক্রান্ত বহু ক্ষেত্রে তাঁর সাবলীল যাতায়াত এবং লালন বিজয় বিষয়ে তিনি সুন্দর মনোগ্রাহী বক্তব্য রেখে চলেন।

লালন গীতি ও চর্চার পাশাপাশি তিনি লোকসাহিত্যের একজন পূর্ণ সময়ের আলোচক। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় তাঁর সহজ অভীক্ষা লাভ। নদিয়া জেলার একটি লোকসংস্কৃতি হল পুতুল নাচ। পুতুল নাচ লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পুতুল নাচ লোকনাট্যের একটি বিশেষ ধারা। অভিনয়, নৃত্য ভঙ্গিমা সঙ্গীতের মাধ্যমে জনসাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে প্রাচীনকাল থেকে। আমাদের এই জেলায় কয়েকটি ক্ষেত্রে পুতুল নাচের অধিক প্রাধান্য। বগুলা সন্নিহিত মুড়াগাছা ও বরণবেড়িয়া তার মধ্যে অন্যতম। এইসব শিল্পীদের সাথে যতীন্দ্রনাথ রায়ের সহজ যাতায়াত। তিনি অতি সহজেই এদের সাথে মিশে যেতেন। এবং এদের সমস্যা দুর্দশা নিয়ে বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। ১৯৮৭ সালে বগুলার ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাচের শিল্পীদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পুতুল নাচ নিয়ে একসময় নদিয়া গবেষক মোহিত রায় একটি পূর্ণাঙ্গ কাজ করেন। জেলা সংস্কৃতি পর্ষদের অন্যতম সদস্য মোহিত রায়ের সাথে যতীন্দ্রনাথ রায়ের একটি সুসম্পর্ক ছিল। যতীন্দ্রনাথ রায় পুতুল নাট্য সংঘের সদস্য ছিলেন। ১৯৯০ এ পুতুল নাচ নিয়ে লালন মেলায় প্রদর্শনের জন্য সুশান্ত হালদার মানিক সরকার ও যতীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে আলোচনা হয় এবং লালন পালা মেলায় প্রদর্শনের জন্য প্রস্তাব দেন সুশান্ত হালদার। রচিত হয় লালন পুতুল নাট্য পালা এবং লালন মেলায় তা প্রদর্শিত হয়। পুতুল নাচিয়েদের দলগুলির শিল্পীদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে যাতে ভবিষ্যতে পুতুল নাচ সংরক্ষণ ও নতুন সম্ভাবনার উদ্দিপ্ত ও নতুন প্রেরণায় ভবিষ্যতে বাংলার সমৃদ্ধ লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতিকে আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে যতীন্দ্রনাথ রায় বলেছেন।

অষ্টক আমাদের নদিয়ার নিজস্ব লোকসংস্কৃতি। এই গান নাচ সহ গীত হয়। এই গানের ধারার সাথে যতীন্দ্রনাথ রায় বিশেষ জড়িত। ভিটেছাড়া সর্বহারা মানুষেরা যখন বহিরগাছিতে আসতে শুরু করে। প্রথমদিকে তাদের জীবন ছিল দিশেহারা এবং দুঃখজনক। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন জরুরি। দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে আনন্দ দেওয়াটাই তখন ছিল প্রধান কাজ। শুরু হয় আনন্দে মেতে ওঠার উৎসব অষ্টক গান। প্রথম থেকেই এই কাজে উৎসাহ দেন যতীন্দ্রনাথ রায়। তিনি এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। চৈত্র সংক্রান্তির সময় আসন তোলা, চৈত্র পূজার অনুষ্ঠানে অষ্টক গানের আয়োজন করেন। পরবর্তীতে তারকনগরে ১৫ দিন ধরে একটি কর্মশালা হয়। এবং অষ্টক গান চলতে থাকে। এবং তারপর এই দল নিয়ে কলকাতা দূরদর্শনে যাবার একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেখানে অষ্টক গান প্রদর্শিত হয়। যা অষ্টক গানের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বহিরগাছিতে কয়েকবার অষ্টক মেলার আয়োজন করা হয়েছে। প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এর পিছনে যাদের ভূমিকা ছিল প্রধান তাঁরা হলেন জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বসন্ত বিশ্বাস মঙ্গল মণ্ডল কিরণ সরকার দিলীপ বিশ্বাস ছিলেন অন্যতম। নদিয়ার গাড়াপোতায় বহু বছর ধরে একটি অষ্টক মেলার আয়োজন হয়। শ্রী যতীন্দ্রনাথ

রায় এই মেলার সভাপতি হিসেবে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে যুক্ত আছেন। বিভিন্ন লেখক গবেষক ও বিশিষ্টদের উপস্থিতির জন্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। এই মেলায় যারা শ্রী রায়ের সান্নিধ্যে থেকেছেন তারা হলেন ঢাকা বাংলা একাডেমির উপ পরিচালক সাইমন জাকারিয়া। এছাড়াও উপস্থিত থেকেছেন মুড়াগাছা ও পানিখালি অষ্টক মেলায়।

যতীন্দ্রনাথ রায়ের জ্যাঠামশাই কেশবলাল রায়ের সময় থেকেই রামায়ণ গান গাজীর গান বিজয় সরকারের গান ও লোকগানে এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন ধারার গানে বহিরগাছি অঞ্চলে এক মিশ্র সংস্কৃতির মাধ্যমে এক নতুন সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি হয়। এখানে গর্বের সাথে অভিনীত হয় যাত্রা থিয়েটার। কলকাতার বিখ্যাত যাত্রাদল অভিনেতাদের দলের অভিনয়ের ব্যবস্থায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কেশবলাল রায়। স্থানীয় যাত্রা থিয়েটারে অংশ নেন। এর মাধ্যমে এলাকায় একটা সংস্কৃতির পরিবেশ তৈরি হয়। এই সম্প্রীতি ঐক্য সমন্বয় তৈরি করে যে নতুন যুগের যাত্রা শুরু হয়। তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই যতীন্দ্রনাথ রায় যুক্ত ছিলেন। বছরের বিভিন্ন সময়ে কবিগান, বিজয় সরকারের গান, বাউল পল্লীগীতি, গার্সি ও হালুই গান মতুয়া গীতি কখনও অষ্টকে টানা সুরের ঢেউ এর মতো সুর বেজে উঠেছে এলাকায়। বাংলার কবির লড়াই বা কবিগান বাঙালির বিশেষ করে কৃষিজীবী শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষের প্রাণের প্রিয় সম্পদ। এই ঐতিহ্যমন্ডিত সম্পর্ক রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য এত অখ্যাত লোককবিরা বহু কঠোর সংগ্রাম করে চলেছেন। বর্তমান নগরকেন্দ্রিক জীবনে এবং অবক্ষয়ের সর্বগ্রাসী দাপটে এই গানের প্রভাব তেমন ভাবে অনুভূত হয় না। কিন্তু গ্রাম ও কৃষিকেন্দ্রিক জীবনে এর প্রভাব প্রবল। এর বিপুল শ্রোতা রয়েছেন। লোককবিরা আজ মানুষের নিত্যকার জীবন সংগ্রামের এবং নৈতিক আত্মিক ও সামাজিক জীবনের বিশ্বস্ত লোকশিক্ষক। সমাজের মানুষের চিত্ত জাগরণে ধর্মান্ধতা সহ সকল গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে তারা নিয়োজিত। এর প্রয়োজন অনুভব করেছেন সজীব একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি সংসদ। লোকশিল্পীদের নিয়ে একাধিক বৈঠক সম্মেলন ও সমাবেশের মধ্য দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তুলে ধরতে চেয়েছেন লোকশিল্পীদের অভাব অভিযোগ কে। এই সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ রায়।

পঞ্চম অধ্যায়
গুণীজন সান্নিধ্য

আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ রায় তাঁর এই সীমিত কর্মময় জীবনে আমাদের সমাজের অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন। কখনও তাদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন, নিজের কাজের প্রসারে অনেককেই নিয়ে এসেছেন নিজের বাসভূমিতে ও বিদ্যালয়ে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন–

মহাশ্বেতা দেবীঃ এই জীবনে যতীন্দ্রনাথ রায় অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য পেয়েছেন। তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। সংস্কৃতি ও ইতিহাস চেতনার অন্যতম মুখ ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। যতীন্দ্রনাথ রায় দীর্ঘদিন ধরে সম্পাদনা করে আসছেন 'শঙ্খচিল' পত্রিকা। মহাশ্বেতা দেবী এই পত্রিকার একজন অন্যতম আপনজন ছিলেন। তাঁর লেখা উপদেশ ও পরামর্শে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল 'শঙ্খচিল' পত্রিকা। তিনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক, সচেতন সমাজকর্মী। চলমান সমাজের বিবেক এবং আপসহীন প্রতিবাদী কণ্ঠ। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জন করে ওঠা মানুষটির সাথে যতীন্দ্রনাথ রায়ের ছিল নানাবিধ কাজের নিবিড় সম্পর্ক।

একটি লেখায় যতীন্দ্রনাথ রায় তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন– সত্তরের দশকে জ্যোতির্ময় বসুর বালিগঞ্জের বাড়িতে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখতাম, টেবিলে কাগজ ও ফাইলপত্র সব নিয়ে এক বিস্ময়কর কর্মমুখর পরিবেশ। কখনও ব্যস্ত সহকারে ফাইল এনে লিখছেন চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়ার কাজ। আবার ডাইরি লেখা ও সাহিত্যকর্মে ডুবে আছেন। মহাশ্বেতা দেবীর অনেক কাজে যতীন্দ্রনাথ রায় সঙ্গী হয়েছেন। ১৯৮০ সালে যতীন্দ্রনাথ রায় 'বর্তিকা' পত্রিকার গ্রাহক হন এবং সদস্য হয়ে আদিবাসীদের জন্য অর্থ সংগ্রহের দায়িত্বে তিনি সঙ্গী হয়েছেন। সেই সময় লেখিকার সাথে যতীন্দ্রনাথ রায়ের একটা সুন্দর কাজের বিষয়ে অনেক আলোচনা হয় এবং যতীন্দ্রনাথ রায় একজন ভরসার মানুষ হয়ে ওঠেন।

১৯৮৪ সালে মহাশ্বেতা দেবী কয়েকজনের সাথে বহিরগাছিতে আসেন এবং সারাদিন অবিরাম হেঁটে গ্রামের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি পরিবেশ রাস্তাঘাট, হল্ট স্টেশন এবং সেই সময়কার গ্রামীণ সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করেন। এই বিবরণ সেই সময়ের যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই ঘটনা বা মহাশ্বেতা দেবীর আগমন বহিরগাছি অঞ্চলের আঞ্চলিক ইতিহাসের অন্যতম দলিল হয়ে থাকবে।

শ্রদ্ধেয় সিদ্ধার্থ বসু তাঁর 'অন্য মহাশ্বেতা' গ্রন্থে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। ঢাকুরিয়ার সুরঙ্গমা থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সেখানে একটি স্থানে লেখা হয়েছে – 'এক সময় গাড়ি এসে থামল আমাদের বহু প্রতীক্ষিত বহিরগাছি স্টেশনে। স্টেশন বলতে আমরা যা বুঝি মোটেই সেই রকম কিছুই নয়। মাটি আর লাল শুড়কির একটা উঁচু জায়গা। স্টেশনেই অপেক্ষা করছিলেন বহিরগাছি স্কুলের হেডমাস্টার মশাই যতীন রায়। তিনি পান্নালাল দাশগুপ্তের

টেগোর রিসার্চ সোসাইটির হয়ে কাজ করেন নদিয়ায়। দত্তপুলিয়া শ্রীমা মহিলা সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েই বহিরগাছি গ্রামের মানুষের দুর্দশার কথা তুলে ধরতে এই আসা'। তারপরে আরও লেখা আছে- নামতেই যতীন বাবু বললেন, চলুন দিদি একটু বিশ্রাম নিয়ে আমরা বেরুব। এই কথা শোনা মাত্রই দিদি হিহি করে হেসে উঠলেন। -আগে চলো গ্রামে ঢুকি। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে অনেক। পরে বিশ্রাম হবে। চলো। তাই আমরা সবাই হাঁটতে লাগলাম গ্রামের দিকে। দিদি ততক্ষণে কালো চামড়ার ব্যাগ থেকে লেখার প্যাড আর ডটপেন বের করে ফেললেন। খানিকটা হাঁটতেই দিদি থমকে দাঁড়ালেন। তারপর বলে উঠলেন -যতীন এটা কী?

যতীন বাবু একটু হেসে বললেন, হেলথ সেন্টার। এর কথাই আপনাকে জানিয়েছিলাম। ফলক বসানোর পর খানিকটা গাঁথনি হয়েছিল। তারপর আর কাজ এগোয়নি। দিদি তখন বলে চলেছেন তাহলে মানুষ চিকিৎসার জন্য যায় কোথায়?

-রানাঘাট হাসপাতালে।

আর সাপে কাটলে!

ভরসা গ্রামের ওঝা। না হলে রানাঘাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। তবে যেতে যেতে পথেই অর্ধেক মানুষ মারা যায়। যতীন বাবু বললেন গল্পকথা হতে পারে না এইগুলি। এটা ইতিহাস। এর সাথে যুক্ত বহিরগাছি ও যতীন্দ্রনাথ রায়। মানুষ আজও হয়তো বুঝতে পারেনি এই মাস্টারমশায়ের অবদান। একদিন বহিরগাছির আরও বিকাশ ঘটবে। আলোকিত হবে চারদিক। কিন্তু আজ থেকে ৪০ বছর আগের স্মৃতি কিছুতেই ম্লান হবার নয়। সেদিন বহিরগাছি থেকে বিদায় নেবার আগে মহাশ্বেতা দেবী ট্রেনের জানালা দিয়ে চিৎকার করে বলেন- যতীন আবার আসব। যা দেখলাম সব লিখব। মানুষকে জানাব। মহাশ্বেতা দেবী সে কথা লিখেছিলেন দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায়।

যতীন্দ্রনাথ রায় তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখায় তাঁর জীবনে মহাশ্বেতা দেবীর কথা উল্লেখ করেছেন। এ যেন বাস্তব থেকে নেওয়া এক ইতিহাসের পাঠ। তিনি স্নাতকোত্তর পর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সমস্ত পন্ডিত ব্যক্তিদের নিকট থেকে ইতিহাসের পাঠ নিয়েছেন যতীন্দ্রনাথ রায় তাদের সাথে সুশোভন সরকার অসীম দাসগুপ্ত ও অমলেশ ত্রিপাঠির নাম উল্লেখ করেছেন।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দলিত শোষিত মানুষের যাপিত জীবন বিষয়ে মহাশ্বেতা দেবীর যে বিশ্বাস ও সংস্কার ছিল, তা পরবর্তীকালে যতীন্দ্রনাথ রায়ের জীবনে প্রবাহিত হয়। জীবনে চলার পথে যে অমূল্য সম্পদ তিনি দেখেছেন। সেগুলিকে দেখতে শিখিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয়া মহাশ্বেতা দেবীই। তাই লেখক যতীন্দ্রনাথ রায় জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও তাকে শ্রদ্ধা জানাতে ভুল করেননি। 'অন্য মহাশ্বেতা' গ্রন্থে সিদ্ধার্থ বসু ওরফে বুদ্ধবাবু সেই ঘটনাকে ছবির মতো তুলে রেখেছেন। পাঠক পাঠ করলে ৪০ বছর আগের বহিরগাছির রেলস্টেশন, গ্রামজীবন পথঘাট সবটাই একবার প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে নেবার জন্য 'দোলা' বলে একটা বস্তু ছিল। এটাও বর্তমান প্রজন্ম ভাবতেই পারে না। দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষী

তিনি। সেই সময় থেকে যতীন্দ্রনাথ রায় একটা কথা বুঝিয়েছিলেন যে গ্রাম বহিরগাছির তিনি ছিলেন আপনজন। বহু উন্নয়নমূলক কাজে তিনি প্রধান কান্ডারী। মহাশ্বেতা দেবীর সাথে এই সম্পর্ক চিরন্তন ও চিরকালের।

মোহিত রায়ঃ নদিয়া জেলার যে সকল গুণী মানুষের সাথে যতীন্দ্রনাথ রায়ের সম্পর্ক বা কাজের পরিচিতি ছিল তাদের মধ্যে মোহিত রায় অন্যতম। গুরুপদ মন্ডল সম্পাদিত 'উৎসব ভূমি' (২০০২) পত্রিকায় 'অন্তরঙ্গ মোহিত রায়' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন যতীন্দ্রনাথ রায়। যতীন্দ্রনাথ রায়ের মতে, মোহিত রায় নদিয়ার এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। মোহিত রায় নদিয়ার ইতিহাসের বহমান ধারার একনিষ্ঠ পরিশ্রমী ক্ষেত্রসন্ধানী ও নিবেদিত প্রাণ গবেষক ও সংগ্রাহক। যতীন বাবু যেহেতু কদমখালি লালন মেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তাই সেদিনের স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেন না। সেখানে যতীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

'১৯৯০ সাল। ভীমপুর আসাননগর লালনতীর্থ কদমখালিতে লালন বেদি প্রতিষ্ঠা ও লালন মেলা প্রবর্তনে যারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন মোহিত রায় তাদের মধ্যে অন্যতম। লালন মেলায় মোহিত রায়ের সানুগ্রহ উপস্থিতি ও সহযোগিতা মেলার অন্যমাত্রা এনে দেয়। প্রতিবছর স্মারক গ্রন্থে তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধ সমূহ নদিয়া তথা বঙ্গ সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ। সুন্দর হস্তাক্ষরে যথাসময়ে প্রবন্ধ প্রাপ্তি এ সবই স্মারকগ্রন্থের সম্পাদক হিসাবে আমার এক বিরল অভিজ্ঞতা। তিনি যে নিষ্ঠাবান লেখক এটা ছিল তাঁর বলিষ্ঠ পরিচায়ক'।

যতীন্দ্রনাথকে মোহিত রায় অনেকটাই প্রভাবিত করেছিল। লোকসঙ্গীতের ও লোকশিল্পের এক দরদি সংগ্রাহক ও সংরক্ষক মোহিত রায়। বোলান নদিয়ার ঐতিহ্যবাহী সম্পদ। মোহিত রায় পুতুল নাচ গ্রন্থে ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচের তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ দিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের সাথে ছিল মোহিত রায়ের নিবিড় সম্পর্ক। মোহিত রায়ের প্রতিভা বহুমুখী। এক কথায় বলতে গেলে এই সমস্ত কাজে যতীন্দ্রনাথ প্রায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মোহিত রায়ের সান্নিধ্য পেয়েছেন। তাঁর সাথে পথ চলে, কথা বলে, এক মঞ্চে পাশাপাশি বসে অনেক পরিকল্পনার কথা লেনদেন করতেন।

যতীন্দ্রনাথ রায় পরবর্তীকালে পুতুল নাচ বা লোকসংস্কৃতির নানা বিষয়ের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং কতিপয় গবেষণার কাজ সম্পাদন করে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এইসব ক্ষেত্রে তিনি মোহিত রায়ের ঋণ স্বীকার করতে অনীহা দেখান না। যে পথে যে আদর্শে মোহিত রায় কার্যসম্পাদন করে স্বাক্ষর রেখে গেছেন এই নদিয়া জেলায়, তাঁর প্রকৃত উত্তরসূরী হিসাবে যতীন্দ্রনাথ প্রায় অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। গ্রামগঞ্জ ঘুরে নানা তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে সর্বোপরি দায়িত্বশীল পদে থেকে তিনি সেই কাজ সম্পাদন করেছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন একজন অন্যতম বক্তা। এই বাংলায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁর স্বাক্ষর রেখেছেন। বহু মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সকলের প্রিয়জন। বগুলা অঞ্চলের পুতুল নাচের ওপর যতীন্দ্রনাথ রায় পৃথকভাবে সমীক্ষা করেছেন। নদিয়ার বোলান গানের ওপর পর্যায়ক্রমে তিনি অনেকগুলি কাজ করেছেন। অষ্টক গানের ওপরেও যতীন বাবুর আগ্রহ এবং

সম্মন্ধ ছিল উল্লেখ করার মতো।

লালন মেলা ও বিজয় সরকারের গানের প্রতি যতীন বাবুর ছিল সীমাহীন আকর্ষণ। তিনি বিভিন্ন স্থানে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। নিজের এলাকাতেও বহু শিল্পী সমন্বয় করে এক কবি গানের আসর বসাতেন নিজের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। এ সকল কাজে যতীন্দ্রনাথ রায় ছিলেন অনেকের থেকে আলাদা। তাঁর আগ্রহ অন্যদের ঈর্ষার কারণ হত। বাংলার লোকগানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যতীন্দ্রনাথ রায়ের অবদান কম নয়।

আমি মনে করি, নদিয়া গবেষক মোহিত রায়ের বিবিধ কর্মে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ রায়। নিজের কাছে যে সংগ্রহ আছে তা আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর সৃষ্ট প্রবন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ নির্মাণ হতে পারে। তাই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মোহিত রায়ের যে নিবিড় সম্পর্ক তাকে কোনো মতে অস্বীকার করা যায় না। মোহিত রায় আর যতীন্দ্রনাথ রায় প্রকৃতই অন্তরঙ্গ। দুজন যদি একসাথে দীর্ঘদিন কাজ করে যেতে পারতেন তাহলে এই নদিয়ার ইতিহাস আরও বিস্তৃত হত। আরও প্রসারিত হত তার বিভিন্ন ধারা।

পান্নালাল দাশগুপ্তঃ শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ রায়ের জীবনে অতিশয় প্রভাব ফেলেন পান্নালাল দাসগুপ্ত। যার চিন্তা ও চেতনায় উঠে আসে বিকল্প সভ্যতার সন্ধান। পান্নালাল দাশগুপ্ত তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন সমাজসেবা ও মুক্তচিন্তার গভীর চেতনায়। তিনি ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবী। ২৫ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করেন তিনি। একটা বিশেষ পর্যায়ে পান্নালাল দাশগুপ্তের সাথে যতীন্দ্রনাথ রায়ের সাক্ষাৎ হয়। পান্নালাল দাশগুপ্তের জীবন, ত্যাগ ও বিপুল কর্মধারা ও প্রজ্ঞা যতীন্দ্রনাথ রায়কে আকর্ষণ করে। কারা মুক্তির পর, দারিদ্র মুক্তি ও মানব মুক্তির আর এক নতুন বিপ্লব শুরু করেন তিনি। সশস্ত্র আন্দোলনের পরিবর্তে তিনি অহিংস আন্দোলন বেছে নেন। শুরু করেন পরবর্তী জীবনের কর্মকাণ্ড।

১৯৭১ এর ভয়াবহ বন্যায় ডুবে যায় নদিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বহিরগাছি অঞ্চলও সমুদ্রের রূপ নেয়। তখন পান্নালাল দাশগুপ্ত নানাভাবে সহযোগিতা করেন। সব থেকে বড়ো কথা পান্নালাল দাশগুপ্ত ‘কম্পাস’ নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন সে সময়। তখন এই অঞ্চলে যতীন্দ্রনাথ রায় তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে যতীন্দ্রনাথ রায় এলাকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছেন।

পান্নালাল দাশগুপ্ত সমাজ সেবার দীক্ষা নিয়েছিলেন জীবন ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। বহু প্রকল্পের প্রতিষ্ঠাতা ও স্রষ্টা তিনি। ‘টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট’ সংস্থাটি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কাজ করে চলেছে নিয়মিত। নদিয়া জেলার অনেকগুলি গ্রামে তিনি সম্পাদন করেন গ্রামসমীক্ষার কাজ। নদিয়া জেলার বহিরগাছি এলাকার কয়েকটি নাম নিয়ে এই সমীক্ষার কাজ শুরু হয়। এই সমীক্ষার কাজে বহু মানুষ অংশ নেন। পান্নালাল দাশগুপ্তের একান্ত আপন মানুষ ছিলেন যতীন্দ্রনাথ রায়। এই মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে বিভিন্ন সময়ে এই বিষয়ে কার্যপ্রণালী সম্পাদন হয়েছে। পান্নালাল দাশগুপ্তকে যতীন্দ্রনাথ রায় নিজের জীবনদেবতা বলে ভেবেছেন। ১৩৭১ বঙ্গাব্দের বন্যা নিয়ে তিনি অনেক সদর্থক চিন্তা করেছেন।

মানিক সরকারঃ যতীন্দ্রনাথ রায় লালন মেলা ও লোকসংস্কৃতি প্রসারের জন্য যাদের

সাহায্য পান তাদের মধ্যে মানিক সরকার অন্যতম। তিনি ছিলেন লোকসংস্কৃতির সাধক পুরুষ। সহজ সরল জীবনের অধিকারী মানিক সরকার লোকসংস্কৃতির এক জীবন্ত দলিল। তিনি ছিলেন লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যের চলমান প্রতিষ্ঠান। পঠনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ প্রয়াত ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের সান্নিধ্যে আসেন। তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগে যোগ দিয়ে বাংলার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক তিনদিনের আলোচনা সভার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তা বহু প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সফল হয়।

জেলাস্তরে লোকসংস্কৃতিপর্ষদ গঠন, জেলা এবং মহকুমার লোকশিল্পীদের নাম তালিকাবদ্ধ করার ব্যবস্থা হয়। সরকারি কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর বাউলশ্রেষ্ঠ লালন ফকিরের মৃত্যু শতবর্ষে স্থানীয় কতিপয় লালন প্রেমিকের ঐকান্তিক সহায়তায় নদিয়ার ভীমপুর আসাননগরের কদমখালিতে লালন বেদি প্রতিষ্ঠা এবং লালনমেলার প্রবর্তনে মানিক সরকার এবং যতীন্দ্রনাথ রায়ের ভূমিকা অগ্রণী হিসেবেই ছিল। সেই থেকে মানিক সরকার ও যতীন্দ্রনাথ রায় এক অভিন্ন হৃদয়ের ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। লালন মেলাতেই জন্ম হয় বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি সংসদের। এই সংগঠন সৃষ্টিতে তাদের দুজনের ভূমিকা অগ্রগণ্য। সৃষ্টিকাল থেকেই সভাপতি মানিক সরকার এবং সাধারণ সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ রায়। এই দুজনে মিলে এই বাংলার অনেক স্থানে লালনের মাহাত্ম্য ও লোকসংস্কৃতির দিগন্তকে প্রসারিত করেন।

যতীন্দ্রনাথ রায় যে আজ এই ক্ষেত্রে অতিপ্রসিদ্ধ তা কিন্তু মানিক সরকার ও অন্যান্য বিদগ্ধ জনের সাহচর্যে। তাই যতীন্দ্রনাথ রায় প্রতিমুহূর্তে তাকে স্মরণ করেন এবং স্মৃতি রোমন্থন করেন। তাঁর সান্নিধ্য উজ্জ্বল করেছে যতীন্দ্রনাথ রায় কে।

আবুল আহসান চৌধুরিঃ লোকসাহিত্যের জীবনী গ্রন্থমালার এবং বাংলা সাহিত্যের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত গবেষক, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও উভয়বঙ্গের সুপরিচিত সাহিত্যিক। মূলত লালন বাউল ও লোকসংস্কৃতির গবেষক হিসাবেই দেশে বিদেশে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। আমাদের এই বঙ্গে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন লোক অনুষ্ঠানে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত। এই বাংলার অনেকের সাথে তাঁর প্রাণের সম্পর্ক। তার মধ্যে অন্যতম যতীন্দ্রনাথ রায়। বহুবার তিনি তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন। লোকসংস্কৃতি নিয়ে বলেছেন বহু কথা। ১৯৯০ সালে বাংলা একাডেমিতে লালন মৃত্যুশতবর্ষে তিনি মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং ১৯৯৫ সালে লালনতীর্থ কদমখালিতে তিনি লালন বক্তৃতা প্রদান করেন।

আবুল আহসান চৌধুরি মনে প্রাণে সবসময় তিনি নদিয়া লালন উৎসবের পাশে থেকেছেন। কখনও প্রত্যক্ষ বা কখনও পরোক্ষভাবে। তাঁর উপস্থিতি, শুভেচ্ছা বার্তা ও প্রবন্ধ প্রদানের মাধ্যমে লালন মেলাকে তিনি সাফল্য ও সার্থক করে গড়ে তুলেছেন। এই মহান ব্যক্তিত্বের সাথে যতীন্দ্রনাথ রায়ের একটি নিবিড় অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সম্পর্ক। তাঁর নিজস্ব ও বাংলাদেশের প্রকাশিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়ে তিনি যতীন্দ্রনাথ রায়কে গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তিনি যথার্থই কঠোর পরিশ্রমী, নীরব তন্নিষ্ঠ এক বিরল গবেষক। যিনি বহু জটিল প্রশ্নের ও তথ্যের রহস্যের গভীরে প্রবেশ করে সমাধান করতে চেয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ রায় একাধিকবার তাঁর বাংলাদেশের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন।

আজও প্রতিমুহূর্তে আবুল আহসান চৌধুরির সাথে টেলিফোনে কথা হয়। একটা গাঢ় যোগাযোগ সেখানে প্রত্যক্ষ করা যায়। সমস্ত ব্যাপারে তিনি এই মানুষটিকেই মনে করেন। যতীন্দ্রনাথ রায়ের এই যে লোকসংস্কৃতির প্রতি অটুট প্রেম তা এখান থেকে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্নদাশঙ্কর রায়ঃ যতীন্দ্রনাথ রায় উল্লেখ করেছেন নদিয়া লালন মেলার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিষ্ঠাকাল থেকে যাদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় মেলা অনুষ্ঠিত হয় তাদের মধ্যে দুই অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হলেন এপার বাংলার শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায় আর ওপার বাংলার ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরি। প্রতিবছর এই মেলা উপলক্ষে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক মানবতাবাদী শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায়ের শুভেচ্ছাবার্তা এসে পৌঁছেছে যথা সময়ে। তিনি তাঁর লেখনী দিয়ে লালন মেলাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

অনেক কথার অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটিয়েছেন দুজনে। এক ফ্রেমে বন্দি আছে তাদের অনেক ছবি। বাংলা সাহিত্যে বহু অবদান রেখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। এছাড়া পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গৌরকিশোর ঘোষ, কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও কার্তিক মোদকের সাথে বহুবার সাক্ষাৎ হয়েছে আমাদের সবার প্রিয় যতীন্দ্রনাথ রায়ের।

সব মিলিয়ে যতীন্দ্রনাথ রায় আমাদের সমাজের অনেক জ্ঞানী গুণীজন সান্নিধ্য লাভ করেন। সকলের নাম আর একবার পাঠ করে নেওয়া যেতে পারে। আমাদের প্রিয় যতীন্দ্রনাথ রায় এই তালিকা প্রস্তুত করে দিয়েছেন একান্তে।

মনীষী অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রজ্ঞাবান অম্লান দত্ত, অনন্য মহাশ্বেতা দেবী, শান্তিদেব ঘোষ, বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্ত, আরতি সেন, রুচিরা শ্যাম, জয়া মিত্র, আবু সয়ীদ আইয়ুব, গৌরী আইয়ুব, রূপদর্শী গৌরকিশোর ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন চক্রবর্তী, ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়, ড. অরুণ বসু, ড. বরুণ চক্রবর্তী, ড. দুলাল চৌধুরি আবুল বাশার, রাম বসু, মঙ্গলাচরণ মুখোপাধ্যায়, দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়, প্রণবেশ সেন, জয় গোস্বামী, তরুণ সান্যাল, কৃষ্ণা বসু, কমল দে শিকদার, নিজন দেচৌধুরী, কার্তিক মোদক, সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায় লালন ভুবনে যাদের বসবাস ড. সুধীর চক্রবর্তী, ড. শক্তিনাথ ঝাঁ, ড. রতন নন্দী, ড.সুরঞ্জন মিদ্দে, ড. তপন বিশ্বাস, ড. কাকলী ধারা মন্ডল, ড. অপূর্ব দে, ড. উপেন বিশ্বাস, পুলকেন্দু সিংহ, দীনেশ সিংহ, প্রদীপ ঘোষ, জগন্নাথ বসু, সুস্মিতা চক্রবর্তী, মানিক সরকার, গৌতম বিশ্বাস, ড আবুল আহসান চৌধুরি, ড. আনোয়ারুল করিম, মনিরুজ্জামান, ইয়াসমিন আরা সাথি, শামসুজ্জামান খান, ড. মযহারুল ইসলাম ড. পবিত্র সরকার, নাট্যকার বাদল সরকার, ড. আবদুল জলিল, ড. আবদুল খালেক, ড. শাহিদা খাতুন, ড. আবুল হাসান চৌধুরি, ড, তপন বাগচি, ড. স্বরোচিষ সরকার, ড. সাইমন জাকারিয়া, ড. অনুপম হীরা মণ্ডল, কবি শামসুর রাহমান, কবি আসাদ চৌধুরি, ড. মোমেন চৌধুরি, ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, আলম আরা জুঁই, স্বপন গুহ, জীবন রায়, মহসিন হোসাইন, ড. কাকলী ধারা মন্ডল, ড. তপন বিশ্বাস, মুস্তফা জামান আব্বাসী, ড.সুখবিলাস বর্মা, পার্বতী দাস বাউল, লতিফ শাহ, টুনটুন ফকির, বীরেন দাস বাউল, অর্জুন ক্ষ্যাপা, কিরণচন্দ্র রায়, কৃষ্ণকীর্তন দাস, মীনা বড়ুয়া, কাননবালা সরকার, সরদার হীরক রাজা, শান্তা সরকার, মিঠু মন্ডল বিশ্বাস, ফরিদা পারভীন,

চন্দনা মজুমদার, নাসিদ কামালতাম্মানা ইসলাম, ড. সুজয় মন্ডল ড অসীমানন্দ গাঙ্গুলী, গৌতম বিশ্বাস, ড ইয়াসমিন আরা সাথী, রওশন আলী, আজাহার ফকির, মনসুর ফকির, বীরেন দাস, এনায়েত ফকির, মিনতি মহন্ত, ষষ্ঠী ক্ষ্যাপা, খৈবর রহমান, আসমত ফকির, গোলাম ফকির, ইলা মা, আয়ুসী, কৃষ্ণদাস বাউল, গৌর ক্ষ্যাপা, সুরেন ফকির, সিন্ধু দেবী, কেষ্টদাস বাউল, তুলসি দাসী, প্রমীলা দাসী, সুভদ্রা দাসী, গঙ্গা তুলিকা, শ্যামাদাস বাউল, স্বপন বিশ্বাস, সুকুমার সরকার রণজিত্‌ বিশ্বাস, সলিল বিশ্বাস, তুষার বিশ্বাস, শ্যামা ভট্টাচার্য, তপন মজুমদার, নিমাই সরকার, করুণাময় বিশ্বাস, গোবিন্দ বিশ্বাস, গণপতি মজুমদার, শঙ্কর বিশ্বাস, সুব্রত বিশ্বাস, জিতেন সরকার, সন্তোষ সরকার, কাজল অধিকারী, বাদল অধিকারী নিতাইপদ সরকার, প্রভাস বিশ্বাস, শুভেন্দু মাইতি, তাপসী রায়চৌধুরি, দেবপ্রসাদ ঘোষ, ড. বরুণ চক্রবর্তী, বারিদবরণ দাস, লোককবি বিজয় সরকার, নিশিকান্ত সরকার, সুরেন সরকার, অমূল্য সরকার, রসিক সরকার, অনাদি সরকার, শ্রীনিবাস সরকার, অসীম সরকার, মনোরঞ্জন সরকার, ক্ষিতিশ সরকার, সন্ধ্যা সরকার, কৃষ্ণ সরকার, নীলাদ্রিশেখর সরকার, সুকান্ত মজুমদার, বাসুদেব মোসেল, আবদেল মান্নান, আশিস গিরি, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বক্তা, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক

'শঙ্খচিল' বর্তমান সময়ের একটি স্বনামধন্য প্রচারিত ও প্রকাশিত পত্রিকা। বর্তমানে ৩৬ তম বর্ষের শারদসংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটি বর্তমানে আইএসএসএন যুক্ত এবং একটি পিয়ার রিভিউ জার্নাল। শুরুর কাল থেকে এই পত্রিকার সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ রায়। পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক শুভেন্দু শুকুল মহাশয় এবং সভাপতি নিতাইপদ সরকার। পত্রিকার সহ-সম্পাদক সুজিতকুমার হোতা ও স্বপন মল্লিক। অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিরা পত্রিকার রিভিউ কমিটিতে আছেন। পত্রিকায় প্রবন্ধ কবিতা সহ নানা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকায় বহু লেখক সাহিত্যিক কলম ধরেছেন।

'শঙ্খচিল' পত্রিকার যাত্রা শুরু হয়েছিল ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৮। ওই বছর ২২ নভেম্বর প্রয়াত বিশ্বশান্তির শেষ পারাবত হেমাঙ্গ বিশ্বাস। কেরানীর কলম শ্রমিকের হাতুড়ি কৃষকের কাস্তে যার কলমে সেই ধানের সোনালি শীষের নাম হেমাঙ্গ বিশ্বাস। তাঁর বহু প্রশংসিত গানের একটির নাম 'শঙ্খচিল'। হিরোসিমা পারমাণবিক বোমাও ধ্বংস করতে পারে না 'শঙ্খচিল' কে। সেদিন পত্রিকার নামকরণ তাই 'শঙ্খচিল'কেই সাদরে গ্রহণ করে। 'শঙ্খচিল' শুধু একটা লিটল ম্যাগাজিন নয়, শুরু থেকেই এর বৈশিষ্ট্য ছিল আঞ্চলিক সাহিত্যের পত্রিকা। যা লেখকের স্বাধীন চিন্তা ও স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির বাহক। 'শঙ্খচিল' বঙ্গদর্শন সাধনা প্রবাসী ভারতী সবুজপত্র পরিচয়-এর উত্তরাধিকার।

উভয়বঙ্গের প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিক অধ্যাপক গবেষকগণের মূল্যবান লেখায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ। অপরদিকে নবীন প্রবীণ সাহিত্যসেবীগণের সাহিত্যচর্চার মাধ্যম রূপে 'শঙ্খচিল' এর পরিচিতির ক্ষেত্রটিও বর্তমানে বেশ প্রসারিত। প্রতি সংখ্যায় দুইজন নির্বাচিত রিসার্চ স্কলারের গবেষণাপত্র প্রকাশের সুযোগ রাখা হয়। বর্তমানেও এই পত্রিকাটি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ হয়ে চলেছে। এর প্রতি সংখ্যাতে যতীন্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে নিয়মিত। বর্তমান সময়ের বিবিধ প্রেক্ষাপটে তিনি লিখে চলেছেন। শুধু 'শঙ্খচিল' নয় বহু পত্রপত্রিকায় তিনি ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ প্রতিবেদন লিখেছেন। এগুলি পৃথক তালিকায় তুলে ধরলাম।

'কম্পাস' পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছেন তিনি। মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিত 'বর্তিকা' পত্রিকাতেও তিনি লিখেছেন বিভিন্ন বিষয়ে।

যতীন্দ্রনাথ রায় একজন গবেষক ও সুবক্তা। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারাকে নিয়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে তথ্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। আকাশবাণী দূরদর্শনে যতীন্দ্রনাথ রায়ের অনেকগুলি কাজ ছিল। লোক আলোচনামূলক বিষয় নিয়ে অন্দরমহলে অনেকগুলি আলোচনা সম্পন্ন করেছেন। সল্টলেকের ঐকতান ভবনে, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগ সহ বাংলাদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় কক্ষে তিনি লোক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনেক স্থানে অনেক গ্রন্থে অনেক প্রতিবেদনে যতীন্দ্রনাথ রায়ের আমরা উল্লেখ পাই।

পাশাপাশি নাটক যাত্রা অষ্টক গান নিয়ে যতীন্দ্রনাথ রায়ের অনেক ভাবনাচিন্তা। কবিগান বিষয়টিকেও তিনি ভিন্নভাবে বোঝার চেষ্টা করেছেন। বাংলার হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি অনেক কর্মশালা সভাসমিতি সম্পাদন করেছেন। বহু মানব জীবনের ওপর তিনি কলম ধরেছেন। লিখেছেন প্রতিবেদন। নতুন অবয়বে কবিতাও এসেছে তাঁর কলমে। সব মিলিয়ে তিনি শিক্ষা সাহিত্য লোকচর্চার ক্ষেত্রে এক অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হয়ে তিনি চিরকাল সমানভাবে সকলের নিকট থেকে মর্যাদা পেয়ে থাকবেন। মাস্টার মশাই যতীন্দ্রনাথ রায়ের নাম আরও বিস্তৃত হোক দশ দিকে এই অনুজের সেই আবেদন।

লোকায়ত সংস্কৃতির সংগঠক ও লেখক যতীন্দ্রনাথ রায়। ছাত্রাবস্থা থেকেই বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন লেখক যতীন্দ্রনাথ রায়। নদিয়া জেলার ভীমপুর আসাননগরে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালনমেলা সমিতি। শ্রীরায় প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। মেলার সম্প্রসারণে ও উন্নয়নে কার্যকরী সভাপতি ও সভাপতি হিসাবে ১৯৯০ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছেন এবং মেলার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবতাবাদের বাণী পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

বিজয় জন্মোৎসবেও দীর্ঘদিন যুক্ত এবং ভূমিকা পালন করেছেন এবং বিশেষ করে জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং বাংলাদেশে গিয়ে মহসিন হোসাইন, খোন্দকার রিয়াজুল হক, নিরঞ্জন অধিকারী, কৃষ্ণকীর্তন দাস, মীনা বড়ুয়া এঁদেরকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত করার ক্ষেত্রে এবং কার্যকরী সভাপতি হিসাবে গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে ফিরদৌসি রহমান, নাসিদ কামাল, নাদিরা বেগম, রওশান আলি, সইফুল ইসলাম ও আসাম ও ত্রিপুরার শিল্পীদের এবং মাননীয় মন্ত্রী অনিল সরকার ও সুভাষ চক্রবর্তী সকলের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়।

লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত বিষয়ে অবিরাম যোগাযোগ সংহতিস্থাপন ও উভয়বঙ্গের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন করে চলেছেন। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে লোকশিল্পীদের সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য কার্যকর ভূমিকা অতীতে ও বর্তমানেও পালন করে চলেছেন। শ্রী রায় প্রবন্ধ এবংগবেষণমূলক লেখাতেও সিদ্ধহস্ত। ‘কম্পাস’ ও অন্যান্য পত্রপত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত। লালন স্মারকগ্রন্থের দীর্ঘদিন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। দীর্ঘদিন ‘শঙ্খচিল’ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করে চলেছেন। উৎসবভূমি, বাণীপুর লোক উৎসব স্মারক, যুব উৎসব স্মারক ও বাংলাদেশের ‘ইস্পাত’ সাপ্তাহিক ও অন্যান্য পত্রিকায়ও তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

দলিত সাহিত্য, বিশেষত লোকায়ত সাহিত্যের এবং লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ, কবিগান, লোককবি সংস্থা গঠন, মতুয়া আন্দোলন, গুরুচাঁদের বাস্তব কর্মমুখী যুক্তিবাদী শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিবেশ বিষয়ক চিন্তাধারা প্রচারে ও প্রসারে সক্রিয় ভূমিকায় আছেন।

আকাশবাণী কলকাতায় বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচক ও কথক

হিসাবে অংশগ্রহণ করেছেন। দূরদর্শনের একটি টিম নিয়ে বহিরগাছি ও তারকনগরে গাজন ও অষ্টকের দৃশ্য কলকাতা দূরদর্শনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় তাঁর উদ্যোগে। শ্রী রায় উভয়বঙ্গেই বিভিন্ন সময়ে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হয়েছেন। নীচে তাঁর বিবিধ লেখার তালিকা দেওয়া হল।

মূলত প্রাবন্ধিক এবং গবেষণামূলক রচনাতেও নিয়োজিত আছেন। কম্পাস পত্রিকায় দীর্ঘদিন প্রবন্ধ সমীক্ষা প্রকাশিত। লালন স্মারকগ্রন্থের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন। লালন স্মারকগ্রন্থে অচিন পাখি, সহজ মানুষ, সোনার মানুষ, মানুষ, অটল মানুষ, আরশিনগর, মানুষ রতন ইত্যাদি স্মারক গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। দীর্ঘদিন 'শঙ্খচিল' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। নদিয়া জেলা পত্রপত্রিকা পরিষদের অন্যতম সদস্য। 'উৎসব ভূমি' বাণীপুর লোক উৎসব সমিতির স্মারক পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত। বাংলাদেশের 'ইস্পাত' ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

শঙ্খচিল পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ:

১) নবান্ন ও পৌষ মেলা
২) মহাশ্বেতা দেবীঃ লোকসংস্কৃতি ও ইতিহাস চেতনা
৩) কবি কার্তিক মোদক
৪) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়- প্রসঙ্গ দিলীপকুমার রায় ও সুধীর চক্রবর্তী
৫) পান্নালাল দাশগুপ্তঃ বিকল্প সভ্যতার সন্ধান
৬) গোপাল চক্রবর্তী -প্রসঙ্গ পান্নালাল দাশগুপ্ত
৭) কাছের মানুষ আবুল আহসান চৌধুরি
৪) ব্যতিক্রমী পরিচালকঃ তানভির মোকাম্মেল
৯) রবীন্দ্রনাথঃ প্রসঙ্গ শিলাইদহ ছেউরিয়া
১০) অনালোকিত জনপ্রিয় পদকর্তা প্রফুল্ল গোঁসাই
১১) মানিক সরকারঃ লোকসংস্কৃতি সাধক
১২) শতবর্ষে পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়
১৩) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ঃ নিশ্চিন্তপুরের যাত্রী
১৪) পুতুল নাচ
১৫) লালন ফকির ও কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা
১৬) লোককবি বিজয় সরকারের মূল্যায়নে ওপার এপার
১৭) বহুমাত্রিক সাহিত্যসাধক সুরজিৎ দাশগুপ্ত
১৮) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথাকার গৌরকিশোর
১৯) ব্যতিক্রমী গৌরকিশোর ঘোষ

কম্পাস পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ ও ফিচার:

১) আলোচনা- যদুবংশ সম্বন্ধে ১০/১১/১৯৭৩
২) সমালোচনা- বেকার সমস্যা ২০/৪/১৯৭৪
৩) সংস্কৃতির স্বরূপ প্রসঙ্গে ১০/৩/১৯৭৬
৪) অষ্টাদশ বর্ষীয় কম্পাস ২৩/৫/১৯৮১
৫) পুলিশ প্রহরায় গণতন্ত্র ২৯/৫/১৯৮২

৬) পশ্চিমবাংলা- সংবাদ শিরোনামে নদিয়া ১২/৬/১৯৮২
৭) সমবায়ের সম্ভাবনা ও কিছু ভাবনা ৩১/১২/১৯৮৩
৮) স্মরণে লোককবি বিজয় সরকার ৯/৭/১৯৮৮
৯) মমতার মৃত্যু নেই ১২/২/১৯৯৪
১০) একটি টিউবয়েলের কাহিনি (স্কুল সংলগ্ন, বহিরগাছি) ২৮/১২/১৯৯৬
১১) চিকিৎসা সংকট, যোগব্যায়াম ও শান্তির ঠিকানা ২৮/১২/১৯৯৬
১২) লালনমেলা ১৯৯৬ ২৮/১২/১৯৯৬
১৩) লালনচর্চার প্রাসঙ্গিকতাঃ সংবাদ শিরোনামে নদিয়া
১৪) একুশে কবিতা সংকলন।

অন্যান্য পত্রিকা/ স্মরণিকা:

১) বঙ্গসংস্কৃতি ও ভাষার আয়নায় আমাদের উপলব্ধির জগত -ভাষা শহিদ স্মারক সমিতির মুখপত্র ১৪০৯
২) বিবেকানন্দ সমকালীন উত্তর কাল
৩) মনে পড়ে, তিতাস একটি নদীর নাম -সীমান্ত সাহিত্য
৪) ব্রহ্মা ব্রহ্মপুত্র গোমতী মহানদীর লোকায়ত ধারা
৫) ভারতে ও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বিজয় চর্চা -লোককবি বিজয় সরকার স্মারকগ্রন্থ (২০১৪)
৬) মহাত্মা লালন ফকির তিরোভাব প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত (১৩৯৭)
৭) বরুণ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'লোকসংস্কৃতি কোশ' গ্রন্থে যতীন্দ্রনাথ রায়ের সাতটি বিষয়ে লেখা আছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ছয় এর দশকে লেখালেখির সূত্রপাত। ৬৯ সালে দিশারী সাহিত্য পত্রিকার লেখা প্রকাশ হয়। ৭৮ এ আড়ংঘাটার শারদীয়া পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত প্রবন্ধ 'সাংস্কৃতিক স্বরূপ প্রসঙ্গে'।

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ:

১) কাঁটা তারের ওপার এপারঃ আত্মকথনের পদাবলি (দুটি খন্ড)
২) লালনমেলার ইতিবৃত্তঃ লালনতীর্থ কদমখালি (ভূমিকা আবুল আহসান চৌধুরি)
৩) রূপদর্শীর স্বরূপ সন্ধানে (ভূমিকা-পবিত্র সরকার)
৪) বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্ত
৫) কবিতা বিকল্প অবয়বে
৬) আঞ্চলিক ইতিহাসে বহিরগাছি

বিবিধ কমিটিতে লেখক যতীন্দ্রনাথ রায়:

সভাপতি- মহাত্মা শ্যামাচরণ শর্ম সরকার জন্ম দ্বিশতবর্ষ উদযাপন সমিতি। শুভ সূচনা হয় ২০ মার্চ ২০১৩ তারিখে মামজোয়ানে, যার সম্পাদক ছিলেন দীনবন্ধু সরকার। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালনমেলা সমিতি (১৯৯০) কদমখালি। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি- পশ্চিমবঙ্গ বিজয় লালন মেলা সমিতি (১২ বছর যাবৎ)। কার্যকরী

সভাপতি- লোককবি বিজয় সরকার স্মারক সমিতি (কেউটিয়া), সভাপতি- রঘুনাথপুর লালন মেলা, সভাপতি- গোষ্ঠ মেলা ও লোক উৎসব (বগুলা), সভাপতি- সুবল দাস বাউলমেলা (আড়ংঘাটা), কফি হাউস সাহিত্য সংগঠন বগুলা, ঊষাগ্রাম ট্রাস্ট এর এডভাইসারি বোর্ড মেম্বার। সেবামূলক প্রতিষ্ঠান মানস (মদনপুর), শ্রীমা মহিলা সমিতি। সাধারণ সম্পাদক-বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি সংসদ (নোনা চন্দনপুকুর), অষ্টক মেলা (গাড়াপোতা), অষ্টক মেলা (বহিরগাছি), সহ-সভাপতি ভাষাশহিদ স্মারক সমিতি। এছাড়া অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। বনগাঁ কলেজের কবিগান সিলেবাস কমিটির একজন বিশেষ রিসোর্স পারসন।

সভাপতি- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালনমেলা সমিতি, সভাপতি- লোককবি বিজয় সরকার স্মারক সমিতি, সাধারণ সম্পাদক- বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি সংসদ, সভাপতি-পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজয়মেলা সমিতি,প্রাক্তন সহ সভাপতি- ভাষা শহিদ স্মারক সমিতি, সভাপতি -শ্যামাচরণ শর্ম সরকার জন্ম দ্বি-শতবর্ষ উদযাপন সমিতি।

যে সমস্ত বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন

১) বৃহত্তর বগুলা পরিক্রমা, প্রবীর রায়চৌধুরি

২) প্রফুল্ল গোসাই (গীতিকার)

৩) জ্ঞানেন্দ্রগীতি – পলাশ বিশ্বাস

সম্বর্ধনা ও পুরস্কার লাভ যতীন্দ্রনাথ রায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মঞ্চে সম্মানিত হয়েছেন। তার কিছু ঝলক এখানে উঠে এসেছে।

প্রণবেশ সেনের প্রয়াণের পর প্রণবেশ সেন স্মরণ অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা। বাংলাদেশের 'ইস্পাত' পত্রিকার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা, অন্তর্দীপন ট্রাস্টের প্রথম মোহিত রায় গবেষক পুরস্কার, বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য অনুষ্ঠানে স্মারকবক্তা; কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্নদাশঙ্কর রায় ও মহাত্মা লালন ফকির বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'বাউল পদ্মার বাঁকে বাঁকে' গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে গ্রন্থ বিষয়ে মুখ্য বক্তা ছিলেন তিনি।

নিম্নবর্গের উন্নয়নে সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তিনি। আন্দোলন সেমিনার ও দলিত সাহিত্য বিশেষত লোকায়ত সাহিত্যের এবং লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ কবিগান লোককবি সংস্থা মতুয়া আন্দোলন সংগঠন গুরুচাঁদের বাস্তব যুক্তিবাদী শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক চিন্তাধারা প্রচারে ও প্রচারে কার্যকর ভূমিকা রেখেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (২০০৯), বাল্মীকি পুরস্কার বাংলা একাডেমি সভাঘরে, প্রণবেশ সেন পুরস্কার বাংলা একাডেমি সভাঘরে, মোহিত রায় গবেষক পুরস্কার ও সমবর্ধনা অন্তর্দীপন ট্রাস্ট কর্তৃক, ইস্পাত পত্রিকা পুরস্কার বাংলাদেশ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্নদাশঙ্কর বিষয়ক কবিতা, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় লালন বিষয়ক বক্তা; 'বাউল পদ্মার বাঁকে বাঁকে' গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে অন্যতম বক্তা সাহিত্য পরিষদে; লালন বিষয়ের স্মারক বক্তা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; দ্বীপ বাংলা আন্দামান পুরস্কার ও সম্বর্ধনা, নির্ণয় গোষ্ঠী পুরস্কার ফরিদপুর বাংলাদেশ; ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগে বিজয় স্মারক বক্তৃতার অন্যতম বক্তা ও সমবর্ধনা; নদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তা ও সংবর্ধনা খুলনা; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (২০০১) বক্তা ও সংবর্ধিত। বঙ্গীয় অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ পরিষদ থেকে জীবনকৃতি পুরস্কার; কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় লালন বিষয়ে বক্তৃতা -বিষয় অন্নদাশঙ্কর; লালন একাডেমিতে (ছেউড়িয়া)সংবর্ধনা ও বক্তব্য পেশ; বিষয় দুই বাংলায় বিজয় লালন; জীবনকৃতি সম্বর্ধনা পশ্চিমবঙ্গ লালনমেলা সমিতি, কদমখালি; গুণীজন সম্বর্ধনা, নেতাজি উৎসব ২০০৩; সংবর্ধিত বাউল উৎসব ২০১০; সংবর্ধিত ও সম্মানিত গাড়াপোতা অষ্টক মেলা। বক্তা ও সম্মানিত কবিগান একাডেমি; স্মারক বক্তা লালনশাই-অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ বিভাগ। এছাড়াও বিজয় ফাউন্ডেশন নড়াইল বাংলাদেশ, ডুমদি বিজয় সংসদ, বিদ্যালয় শতবর্ষ উৎসব, আম্বেদকর সম্মান পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মর্যাদা অনুষ্ঠান রানাঘাট, বহিরগাছি উচ্চ বিদ্যালয়। ক্রীড়া ও লোকসংস্কৃতি উৎসব থেকে সম্মানিত হয়েছেন।

বিশিষ্টদের সাথে কাঁটাতারের এপারেওপারে:

"দুয়ারে খিল, টান দিয়ে তাই খুলে দিলাম জানলা/ ওপারে যে বাংলাদেশ, এপারে সেই বাংলা"। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই মন ছুঁয়ে যাওয়া উচ্চারণ যেন কখন অজান্তেই শুরু হয়েছিল লেখক যতীন্দ্রনাথ রায়ের শৈশবের ওপার এপার বাংলার যাতায়াতের মাধ্যমে। ঠাকুরদার হাত ধরে, মাথায় পোটলা নিয়ে নবগঙ্গা পাড়ে হাটগোপালপুর হয়ে দর্শনা- বানপূর পেরিয়ে নদিয়ার বহিরগাছিতে। তখন পাশপোর্ট ভিসার বালাই ছিল না। এরপর ছাত্রাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাতায়াত শুরু। ছাত্রাবস্থায় পাসপোর্ট করেন ১১/৫/১৯৬১ সালে। পাসপোর্ট নম্বর--৩৫৫৩৪৯ নাম ছিল -যতীন্দ্রনাথ রায়। জন্ম— রাধাকান্তপুর,জেলা--যশোর। জন্ম তারিখ-১২/১১/১৯৩৫ (কিন্তু এটা সঠিক নয়, আনুমানিক) উচ্চতা--৫'-৭' পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। সাধারণত তিনি ছাত্রাবস্থায় একাই যাতায়াত করতেন। বাস, ট্রেন, ভিন্ন পরিবেশ, অজানা অচেনা মানুষের সান্নিধ্য সেই কৈশোরেই যেন কখন নিজের অজান্তেই বয়স্ক মানুষের পৃথিবীতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, যার ফলে সেই সময় থেকেই সব ধরনের মানুষের সঙ্গ পেয়ে সবার সঙ্গে মেশার নেশা পেয়ে বসেছিল। এপারে বন কেটে বসত ওপারে ভাঙাচোরা সমাজের ছিন্নমূল ভিটেছাড়া অগুনতি মানুষের ভিন্ন দেশে যাত্রা। পূর্বপাকিস্তান বিরোধী মানসিকতা নতুন সমীকরণে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করছে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। এই সময়ের তাপ উত্তাপ তাঁর মনে গভীর ছায়া ফেলে ছিল। বিশেষ প্রয়োজনে ১৯৬১ তে পাসপোর্ট করেন। পাসপোর্টে পেশা--ছাত্র। সেই থেকেই শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতির অদ্ভুত সমীকরণের নিরন্তর যোগাযোগের সূত্রপাত তাঁর জীবনে। তারপর 'কম্পাস' পত্রিকার গ্রাহক এবং প্রবন্ধ লালন মেলা ও লোককবি বিজয় সরকার স্মারকসমিতি, বিজয় লালনমেলা সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই সময় থেকেই এপার ওপারের সেতুবন্ধনের প্রয়াস লেখক যতীন্দ্রনাথ রায়ের।

২৪/১১/২০০১ এ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে অংশগ্রহণ সেখান থেকে ঢাকায় যাত্রা। তিনি একাই যান সেমিনারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে ঢাকায় দেখা করেন

কবি শামসুর রহমান এবং শামসুজ্জামান খান ও মুস্তাফা জামান আব্বাসীর সঙ্গে, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর, লালন ফকির ও লোককবি বিজয় সরকারকে কেন্দ্র করেই আলোচনা চলে। রবীন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্করের প্রসঙ্গ বিষয়ও প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসে। ৩/২/২০০২ সালে লোককবি বিজয় সরকারের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিজয় অনুরাগীদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বাংলাদেশে একাই যান এবং মোমেন চৌধুরি, খন্দকার রিয়াজুল হক, মহসিন হোসেন, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, কৃষ্ণকীর্তন দাস মীনা বড়ুয়া, কবি শামসুর রহমান শামসুজ্জামান খানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সবাই বিজয় সরকারের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উত্তর চব্বিশ পরগনার কবির বাসস্থান কেউটিয়াতে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ২৭/৩/২০০২ একটি দল বাংলা দেশে কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়া এবং লালন বিষয়ক অনুষ্ঠানে এবং সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ যাওয়া হয়। দলে যতীন্দ্রনাথ রায়, বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

৪/৩/২০০৪ বাংলাদেশে কুষ্টিয়ার সবার সঙ্গে দেখা আলোচনা সেরে ঢাকায় যান। শামসুর রহমান অন্যান্য বিশিষ্টদের সঙ্গে লালন মেলা ও বিজয় সরকারের অনুষ্ঠান নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাত্‌কার গ্রহণ করেন এবং অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান।

১৬/১০/২০০৮- গেদে-দর্শনা হয়ে বাংলাদেশ, কুষ্টিয়া, ঢাকা বাংলাদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালনমেলা বিষয়ে এবং বিজয় সরকার বিষয়ে আবুল আহসান চৌধুরি, আনোয়ারুল করিম এবং ঢাকায় গিয়ে শামসুর রহমান, শামসুজ্জামান খান, ও অন্যান্যদের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা হয়। ১৬/১০/২০০৯ গেদে-দর্শনা হয়ে বাংলাদেশে যান। বাংলাদেশে বিভিন্ন সেমিনারে ও অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। লোককবি বিজয় সরকারের মূল্যায়নে পশ্চিমবঙ্গে কীভাবে লোককবি বিজয় সরকার স্মারক সমিতি কাজ করছে সে বিষয়ে সবার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

৭/১২/২০১০ নড়াইলে চারণকবি বিজয় সরকার নামক সংগঠনের পক্ষ থেকে সভাপতি যতীন্দ্রনাথ রায় এবং কবিপুত্র কাজল অধিকারী, সেই সঙ্গে ড. শক্তিনাথ ঝাঁ, ডড চক্রবর্তী, ড, রতন নন্দী, ড.সুরঞ্জন মিদ্দে, ড, কাকলীধারা মন্ডল, ড, নন্দদুলাল মহন্ত নন্দী উপস্থিত হন। আক্রান্ত শাহিদ চুন্নুর তদারকিতে অনুষ্ঠানে আলোচনা, সেমিনার ও সম্বর্ধনায় অনুষ্ঠান ভিন্নমাত্রা যোগ করে। এরপর যাত্রা কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আবুল আহসান চৌধুরির আমন্ত্রণে ও তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানে আলোচনা, আন্তরিকভাবে অধ্যাপকের উপস্থিতিতে লোককবি বিজয় সরকারের ওপর তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা ও মূল্যায়নে সেই সভা অনন্য মর্যাদা লাভ করে। পরবর্তীতে ড, আনোয়ারুল করিম সভাপতি যতীন্দ্রনাথ রায় সহ সবাইকে নিয়ে খুলনায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান এবং রূপান্তরের আবাসনে সেমিনারের আয়োজন করেন। স্বপন গুহের সহযোগিতায় সেমিনারে বিজয় সরকারের মূল্যায়নে এবং লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার ওপর আলোচনা ও উদাহরণ প্রদর্শনে সেমিনার অসাধারণ হয়ে ওঠে। ৪/১২/২০১১ তারিখে চারণকবি বিজয় সদনের আমন্ত্রণে যতীন্দ্রনাথ রায়, কাজল অধিকারী ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি লোককবি বিজয় সরকার স্মারকসমিতির পক্ষ থেকে নড়াইলে শিল্পকলা একাডেমীতে

চারণকবি বিজয় সরকারের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে যোগদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জহুরুল হক জেলা প্রশাসক, আবু জুফর সিদ্দিকী মহাপরিচালক বাংলাদেশ টিভি, স্বপন গুহ, অধ্যাপক সুশান্ত সরকার, রাজিকুল ইসলাম, সঙ্গীত শিল্পী তাপসী রায়চৌধুরি। সঙ্গীত পরিবেশন করেন রওশন আলি, কবিগানে কৃষ্ণকান্ত সরকার ও সন্ধ্যারানি সরকার। ফরিদপুরের নির্ণয় গোষ্ঠীর আমন্ত্রণে কাজল অধিকারী যান এবং যতীন্দ্রনাথ রায় এবং কবি পুত্র কাজল অধিকারীর নিকট উভয়ের স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

৪/১২/২০১২ তারিখে নড়াইলের সংগঠনের পক্ষ থেকে নড়াইলের শিল্পকলা একাডেমিতে লোককবি বিজয় সরকার স্মারক সমিতিকে বিজয় সরকারের প্রয়াণ দিবস স্মরণে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সভাপতি যতীন্দ্রনাথ রায়, কাজল অধিকারী, বিশিষ্ট গবেষক অসীমানন্দ গাঙ্গুলি, তাছাড়া অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, জেলা প্রশাসক জহুরুল হক, ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

২৬/২/২০১২-২/৩/২০১৩ লোককবি বিজয় সরকার স্মারক সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতি যতীন্দ্রনাথ রায় এবং কবিপুত্র কাজল অধিকারী বাংলাদেশে যান। ঢাকা বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক সম্বর্ধনা জানানো হয় অত্যন্ত হৃদ্য পরিবেশে, লোককবি বিজয় সরকারের একুশে পদক প্রাপ্তি এবং দুই দেশের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সেতুবন্ধনের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদানের জন্য। সাক্ষাত করা হয় ড. তপন বাগচী উপ-পরিচালক বাংলা একাডেমি এবং অন্তরঙ্গ পরিবেশে বিজয় সরকারকে নিয়ে আলোচনা করা হয়। এক অশান্ত পরিবেশে শাহবাগ আন্দোলনের ঐতিহাসিক সময়ের অভিজ্ঞতা সঙ্গে নিয়ে ফেরার পথে নড়াইলে এসে জেলা প্রশাসক জহুরুল হক এবং আক্রাম শাহিদ চুন্নু ও অন্যান্যদের উপস্থিতিতে একুশে পদকের প্রতিলিপি প্রদান করা হয় অত্যন্ত সৌহার্দ্যের পরিবেশে।

এখানে উল্লেখ্য ৩/১২/২০১৪ তারিখে নড়াইলে বিজয় সরকারের প্রয়াণ দিবস স্মরণের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত লোককবি বিজয় সরকার স্মারকসমিতির পক্ষ থেকে যতীন্দ্রনাথ রায়, কাজল অধিকারী, শেখ মকবুল ইসলাম, পুষ্প বৈরাগ্য, ইয়াসমিন আরা সাথি, ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের যোগদানে সেমিনারে আলোচনা, সম্বর্ধনা ইত্যাদি মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।
৪/১২/২০১৭-১৭/১২/২০১৭ নড়াইলে চারণকবি বিজয় বিজয় সদনের আমন্ত্রণে যতীন্দ্রনাথ রায়, কাজল অধিকারী, পবিত্র সরকার, শেখ মকবুল ইসলাম, পুষ্প বৈরাগ্য, কাকলিধারা মন্ডল, তাপসী রায়চৌধুরি, শুভেন্দু মাইতি, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে, তপন বাগচী, সলিমুল্লাহ খান কৃষ্ণকীর্তন দাস ও অন্যান্য সকলে সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন এবং সবাইকে সম্মান জানানো হয়।

২২/৩/২০১৯ তারিখে যতীন্দ্রনাথ রায় এবং সত্যরঞ্জন মন্ডল কুষ্টিয়ায় যান মহাত্মা লালন ফকিরের জন্মোৎসব উদযাপন অনুষ্ঠানে, সম্বর্ধিত হন লালন মেলার সভাপতি যতীন্দ্রনাথ রায় এবং শিল্পী সত্যরঞ্জন মন্ডল। আলম আরা জুঁই ও অন্যান্যেরা ছেউড়িয়াতে এবং শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে সঙ্গ দিয়ে আপ্লুত করেন। ২৬/৭/২০১৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সেমিনারে

আমন্ত্রিত হয়ে যতীন্দ্রনাথ রায় এবং শুভেন্দু শুকুল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে যান। সেমিনারে তাঁর বিশেষ পরিচিত, ড. তপন বাগচী, ড. অমিতাভ বিশ্বাস, শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, নীলাদ্রিশেখর বিশ্বাস, স্বরোচিষ সরকার, আবুল আহসান চৌধুরি ও অন্যান্য বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষকবৃন্দ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত যতীন্দ্রনাথ রায় এবার নিয়ে তিনবার ২০০১/২০১০/২০১৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।



পর্ব দুই

সমাজের বিভিন্ন গুণীজনের চোখে যতীন্দ্রনাথ রায়

যতীন্দ্রনাথ রায় এই দীর্ঘ জীবনে বহু মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। আমরা এই বইটিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছি। প্রথম ভাগে তাঁর জীবনের কিছু কথা সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই দ্বিতীয় ভাগে আছে দুই বাংলার বহু খ্যাতিমান মানুষের কথা। যারা বিভিন্ন সময়ে যতীন্দ্রনাথ রায়ের সাথে সময় কাটিয়েছেন, সান্নিধ্য পেয়েছেন। আমি ও শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ রায় এই সময়ের মধ্যে আনেকের সাথে যোগাযোগ করেছি। তাঁরা পৌঁছে দিয়েছেন তাদের অমূল্য মতামত। যারা এই সময়ের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছেন তাদের শুভেচ্ছা বাণী বা অমূল্য লেখা তাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। যারা সময় অভাবে পৌঁছে দিতে পারলেন না প্রথম সংস্করণে, তাদের কাছে অনুরোধ আপনার অমূল্য লেখাটি পৌঁছে দেবেন আমাদের ঠিকানায়। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা প্রকাশ করব। লেখকদের এই তালিকা বর্ণানুক্রমিক ভাবে প্রস্তুত হয়েছে।

অনির্বাণ বসু: 'মোহিত রায় স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করি

শ্রদ্ধেয় লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রগবেষক শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায়কে অন্তর্দীপন ট্রাস্ট থেকে ৩০ জুলাই ২০০৬ 'মোহিত রায় স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করি। ২০০৪ থেকে তাঁকে কাছে পেয়েছিলাম ঊষাগ্রাম ট্রাস্টের কর্মকর্তা হিসাবে। ২০০৫ এ সান্নিধ্য পেয়েছিলাম আসাননগর ভীমপুর লালনমেলায়। পরিচয় হয়েছিল ২০০২ সাল নাগাদ মোহিত রায়ের পরিচালিত একটি কৃষ্ণনগরের অনুষ্ঠানে। সহজ সরল একজন মানুষ নদিয়ার বহু লোকসংস্কৃতির সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি বহু জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু নিজের জীবন পথের কোনো কথা তিনি লিখে গেলেন না। এটাই আমাদের কাছে বিশাল ক্ষতি। আপনাকে আমার অকুন্ঠ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনার সুদীর্ঘ সুন্দর জীবনের প্রার্থনা করি। আপনার সফল ও সার্থক কর্মোদ্যোগের প্রত্যাশা থাকল।

অনুপকুমার ঘোষ: যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে যেমন দেখেছি

বর্তমান মিডিয়ার যুগ। মানুষ সুনামের জন্য কত কী না করে। নিজের সুনামের জন্য কত লোক কত ভাবে প্রচার করে। সেই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায় প্রচার থেকে অনেকটা দূরে থাকেন। তিনি কখনও মিডিয়ার সামনে আসতে চান না। অনেকে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, গান লেখেন- সেটা আবার ফেসবুকে পোস্ট করেন, যা লোকে জানতে পারে। যতীন্দ্রনাথ রায় তা করেন না।

যতীন্দ্রনাথ রায় সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি। কেন না তিনি এত বড়ো মানুষ, তার বিচরণ লোকসাহিত্যের সব দিকে। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা লিখব সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।

আজ যতীন্দ্রনাথ রায় সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমার মতো একজন সামান্য গীতিকার কী লিখবে। তবে যতীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে আমার বহুদিনের সম্পর্ক। তাঁর স্নেহ পেয়ে আজ আমি গীতিকার। যতীন্দ্রনাথ রায় আমার গান লেখার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। আজ আমি এপার বাংলা ওপার বাংলাতে গান লেখার জন্য যে পরিচিতি পেয়েছি সবই যতীন্দ্রনাথ রায়ের দৌলতে।

১৯৯৩ সালে যতীন্দ্রনাথ রায়ের সাথে আমার পরিচয় পশ্চিমবঙ্গ লালনমেলা সমিতির মাধ্যমে। তখন এত মোবাইল ছিল না। আমি ও আমার বন্ধু মুরারী লালনমেলার একটি চিঠি দিতে বহিরগাছি উচ্চবিদ্যালয়ে (উ.মা) গিয়েছিলাম। তখন তিনি ওই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। সেই আমার সাথে রায় মহাশয়ের প্রথম পরিচয়। তখন আমি বগুলা শ্রীকৃষ্ণ কলেজে বি.এ. ক্লাসের ছাত্র। আজ প্রায় ৩০ বছর হয়ে গেল। এই ৩০ বছরে রায় মহাশয়ের সাথে এপার বাংলা ওপার বাংলার বহু মেলা ও অনুষ্ঠানে গিয়েছি। রায় মহাশয়ের সাথে চলতে চলতে বহু গুণীমানুষের সান্নিধ্য লাভ করেছি। রায় মহাশয় যে সমস্ত মেলার সাথে সরাসরি যুক্ত আছেন বা ছিলেন সে গুলি উল্লেখ করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গ লালনমেলা সমিতি,শান্তিনিকেতন মেলা, বাণীপুর মেলা, অগ্রদ্বীপ মেলা, জয়দেব মেলা, বিজয় মেলা, গোড়ভাঙা ফকিরি মেলা, বহিরগাছি লালনবিজয় মেলা, কুষ্টিয়া লালনমেলা, ঝিনাইদহ পাগলাকানাই মেলা প্রভৃতি।

মানুষ হিসাবে তিনি খুব কম কথা বলেন। রায় মহাশয় এপার বাংলা ও এপার বাংলাতে লেখার জগতে সমানভাবে পরিচিত। এখনও কত লেখক সাহিত্যিক তাঁর গ্রামের বাড়িতে অবাধ যাতায়াত করেন। তিনি যাদের সঙ্গে চলাফেরা করেছেন, তাঁরা বড়ো বড়ো দিকপাল সাহিত্যিক- কবি শঙ্খ ঘোষ, ডঃ শক্তিনাথ ঝাঁ, আবুল বাশার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গোঙ্গোপাধায়, জয় গোস্বামী, আবুল আহসান চৌধুরি, মোমিন চৌধুরি প্রমুখ।

রায় মহাশয়ের গ্রামের বাড়িতে আমি, শিল্পী সত্যরঞ্জন মন্ডল, কবি কার্তিক বিশ্বাস, সাহিত্যিক শুভেন্দু শুকুল, কবি মুরারীমোহন বিশ্বাস মাঝে মাঝেই যাই তাঁকে দেখতে। আমরা অনেক্ষণ ধরে লোকসাহিত্যর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়। লেখালেখির বাইরে তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ করে বেড়ান। তিনি এপার বাংলা ওপার বাংলার বিভিন্ন সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। রায় মহাশয়ের কথা বলে শেষ করা যাবে না। আমি অনুপকুমার ঘোষ রায় মহাশয়ের সুস্থতা কামনা করে শেষ করছি।

অনুপ মণ্ডল: গুরু-শিষ্য পরম্পরা

বাংলার ঐতিহ্য লোকসংস্কৃতি। বাংলার ঐতিহ্য লোকসঙ্গীত। নদিয়া জেলার 'লোকসংস্কৃতি চর্চায়' অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। উপ মহাদেশ (ভারত) এ ১৯৯০ সালে সর্বপ্রথম 'লালন মেলা'র প্রতিষ্ঠা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ!

আর নদিয়া জেলার মধ্যে, এই 'লোকায়ত সংস্কৃতি' নিয়ে যাঁরা সুদীর্ঘ বছর ধরে কাজ করছেন,তাঁদের মধ্যে বহিরগাছি গ্রামের শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায়ের নাম সবার আগেই বলতে হয়। তাঁর সাথে আমার প্রথম আলাপ ২০০৮ সালে, আমি তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। ধীরে ধীরে তাঁকে অনুসরণ করি। লালন মেলা,বাউল মেলা,বিজয় সরকারের মেলা, লোক উৎসবে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য শুনে, তাঁকে গুরুর আসন প্রদান করি। তিনি লোক সংগঠক,লোকসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক,কবি,প্রাবন্ধিক এবং 'শঙ্খচিল' - সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। (পত্রিকাটি ৩ দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রকাশিত হচ্ছে)। তিনি একটি হাই স্কুলের 'প্রধানশিক্ষক' হিসাবে সুদীর্ঘ বছর শিক্ষা প্রদান করেছেন।

এক কথায় কৃতীমান পুরুষ। আমি তাঁর স্নেহধন্য! তিনি আমার পরম গুরু, শিক্ষক,গাইড। আমাকে সকল সময়ে উৎসাহিত করেছেন।

বিশেষ উল্লেখ্য - আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অনুভবে মহাত্মা লালন সাঁই' (২০২১) উৎসর্গ করেছি যতীন্দ্রনাথ রায় ও শুভেন্দু শুকুল স্যার কে। কারণ এই দুই কৃতী ব্যক্তিত্ব আমাকে 'Folklore ও লালন ফকির (১৭৭৪-১৮৯০)' কে জানতে অনেকটা সাহায্য করেছেন। আমার প্রতিষ্ঠিত 'মনের মানুষ লোকসংস্কৃতি ও শিল্প আকাদেমি'র প্রদত্ত প্রথম বর্ষের 'বিশ্ববাউল মহাত্মা লালন ফকির মহাসম্মান' ২০১৫ সালে, যতীন্দ্রনাথ স্যারকে প্রদান করেছিলাম 'রঘুনাথপুর লালন মেলা-২০১৫' (লালন মহামঞ্চ) থেকে।

এই রকম আরও নজীর রয়েছে। আসলে সনাতন ধর্মাবলম্বী হিসাবে 'গুরু শিষ্য পরম্পরায় বিশ্বাসী' মানুষ আমি। 'গুরু কৃপাহি কেবলম্' গুরু কৃপা ছাড়া, ভালো কাজ সম্ভব নয়। তাই আমার সকল শিক্ষক, গাইডদের মতোই নদিয়ার গৌরব, শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে উচ্চ স্থানে রেখেছি। তাঁকে নিয়ে আমিও ভবিষ্যতে কাজ করতে ইচ্ছুক। ক্রমশ প্রকাশ্য। ভালো থাকুন স্যার!

অপূর্ব দে: যতীন্দ্রনাথ রায়- অনেক বড়ো মাপের মানুষ

যতীন্দ্রনাথ রায়। লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির জগতে এক বিশেষ নাম। এপার ওপার বাংলায় তাঁর জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি এককথায় অতুলনীয়। খুব বড়ো মনের মানুষ তিনি। সজ্জন ব্যক্তি বলতে যা বোঝায় তিনি হলেন তাই। পেশা ছিল শিক্ষকতা। নেশা লোকসংস্কৃতির চর্চা। লোকসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান অপরিসীম। বয়স শারীরিক অসুস্থতাকে তুচ্ছ করে ছুটে গেছেন গ্রাম থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে। লালন ফকির বিজয় সরকার জসীমউদ্দীন প্রমূখদের জীবন দর্শন গান লোকসমাজে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে যতীন্দ্রনাথ রায় অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন। নদিয়া জেলার ভীমপুর আসাননগরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালনমেলা সমিতির সম্মানীয় সদস্য হিসাবে তিনি তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ করেছেন। যতীন্দ্রনাথ

রায় সমিতির সভাপতি তথা কার্যকরী সভাপতি হিসেবে (১৯৯০ থেকে ২০০৮) লালনমেলা কে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। নিজের গ্রাম বহিরগাছিতে তিনি প্রায় একক প্রচেষ্টায় 'লালন মেলা'র আয়োজন করতেন। দু তিন দিনব্যাপী এই মেলায় নানা স্থান থেকে মানুষজনের উপস্থিতি ও স্বতঃস্ফূর্ততা যতীন্দ্রনাথ রায়ের সাংগঠনিক শক্তিকেই প্রমাণ করে। কাকিনাড়ার কেউটিয়া গ্রামে বিজয় সরকারের স্মরণে 'বিজয় উৎসব' এ পথের ক্লান্তি ভুলে তিনি যে ভাবে রাত জেগে অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সফল করে তুলতেন তা এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। 'শঙ্খচিল' পত্রিকাটি যতীন্দ্রনাথ রায়ের স্বপ্ন আবেগ ভালোবাসা রক্ত ও ঘামের সোনার ফসল। লোকশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর ছিল আত্মিক যোগাযোগ। তাদের সুখ দুঃখের ঢেউ খেলানো জীবনের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ রায়ের জীবন যেন এক সূত্রে বাঁধা পড়েছিল।

যতীন্দ্রনাথ রায় আমার পরম শ্রদ্ধেয় যতীন দা। যতীনদার সঙ্গে আমার আলাপ বিজয় উৎসবকে কেন্দ্র করে। বিজয় সরকারের সুযোগ্য পুত্র কাজল অধিকারী (কাজল দা) আমার সঙ্গে যতীন দার মিলনের সেতু তৈরি করে দিয়েছিলেন। খুব অল্পদিনের মধ্যে যতীন দা আমাকে স্নেহের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে নিলেন। এক বছরের বিজয় অনুষ্ঠান শেষ হলেই পরের বছরের পরিকল্পনা করতেন। বিজয় উৎসবের সভাপতি ছিলেন যতীন্দ্রনাথ রায়। ফোনের মাধ্যমে সারা বছর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। শুধু আমি নই, সকলের সঙ্গেই। সকলেই যে তাঁর আপন। বহিরগাছিতে লালন মেলায় প্রতিবার আমন্ত্রণ করতেন। দু তিনবার আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। যতীনদা সুবক্তা হিসেবেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। একবার কলকাতা দূরদর্শনের সাহিত্য সংস্কৃতি বিভাগে বিজয় সরকারের ওপর একটি অনুষ্ঠান করেছিলাম। বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী শুভেন্দু মাইতি এবং যতীন্দ্রনাথ রায়। আমি ছিলাম সঞ্চালকের ভূমিকায়। তখন দূরদর্শনের এই অনুষ্ঠানটি লাইভ হত। যতীন দা বিজয় সরকারের ওপর এত সহজ সরলভাবে আলোচনা করেছিলেন যে শুধু শ্রোতাবন্ধুরা নয়; আমিও একজন ছাত্রের মতো মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। আদ্যন্ত লোকসংস্কৃতি লোকসংগীতপ্রেমী মানুষটিকে বিগত ১২/১৪ বছরেও রাগতে বা কারও ওপর অভিমান করতে দেখিনি। যতীন দার সান্নিধ্য যারা পেয়েছেন, তারা অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, যতীন দার মতো আমাদের সমাজে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। ভীষণ প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার অধিকারী তিনি। মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধনে তিনি সবসময় ইতিবাচক ভূমিকা নিতেন। যতীনদার জীবন কর্ম দর্শন সৃষ্টি নিয়ে আপনারা গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে এক মহান কাজে ব্রতী হচ্ছেন। কেন না আজকের প্রচার সর্বস্ব যুগে যতীন দা প্রচারের আলোর বাইরে থাকতেই ভালোবাসেন। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরীদের দায় থাকে ব্যতিক্রমী পূর্বসূরীদের সময় ও সমাজের অবদানকে আলোতে নিয়ে আসা। লোকসমাজে আরও বেশি করে পরিচিতি ঘটানো। আপনারা সেই ঋণ স্বীকার করায় আপনাদের শৈল্পিক অভিনন্দন আর যতীন দাকে আমার বিনম্র প্রণাম।

অরুণ বিশ্বাস (গোঁসাই): যতীন বাবু আমাদের গর্ব

যতীন বাবুকে আমরা আমাদের যতীনবাবু বলে গর্ব করি। তিনি বহিরগাছি উচ্চমাধ্যমিক

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তা বলে আমাদের গর্ব করার কিছু নেই। কারণ উচ্চ মাধ্যমিকের প্রধান শিক্ষক প্রতি পঞ্চায়েত এলাকায় দুই এক জন পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের যতীনবাবু তো গুণের আধার এবং ধৈর্যশীল। বয়স ৯০ এর কাছাকাছি। দার গ্রহণ করেন নি। চিরকুমার একজন গৃহী সন্ন্যাসী। একজন লোক সংস্কৃতি বিভাগের ধারক বাহক। তিনি দুই বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত। কবি সাহিত্যিক গবেষক বিদগ্ধ পন্ডিত সমাজের সঙ্গে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালনমেলার সংগঠনের সভাপতি ছিলেন তিনি দীর্ঘদিন।

তিনি আমাদের বহিরগাছি রাজ্য বিজয়লালন মেলার সভাপতির পদে আছেন। উত্তর ২৪ পরগনার কেউটিয়ায় বিজয় সরকারের স্মৃতি বহন করে আসছে এক স্মারক সমিতি। সেই সংগঠনের সভাপতিও তিনি। যতীন বাবুর হাত ধরে বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানের মঞ্চে ওঠার সুযোগ পেয়েছি। কবিগান করেছি, সংবর্ধনা পেয়েছি। এছাড়া প্রাইজ তো আছেই।

এছাড়া যতীন বাবু একজন সমাজসেবী। দুই বঙ্গের বিশিষ্ট সমাজসেবিক। চন্দ্রকান্ত বসুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কৃষকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কাজ করেছেন। সিএডিপি প্রকল্প স্যাংশন করে বোরো চাষের অনেক কাজ হয়েছে। বীজ সার জল পেয়েছে। কৃষকেরা সব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। বহু ছেলে কর্মে নিয়োগ হল। যে সব মাঠে বর্ষার জল আটকে যেত, খাল কেটে সেই সব বিলের জল বের করে দেওয়ার পর আর ওই সব বিলের ফসল মার খায় না। অন্য দিকে গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা হল। সবই যতীন বাবুর মাধ্যমে হয়েছিল। মাঝেমধ্যে দূরদর্শনে যতীন বাবুর বক্তব্য শোনা যায়।

আনোয়ারুল করিম: লালন গবেষক ও সংগঠক

যতীন্দ্রনাথ রায়। তাঁর সাথে আমার পরিচয় বেশ পরে। অনেকটা আকস্মিক। ১৯৬০ সালে কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়া গ্রামে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রথমে লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র গঠন করি। পরে ১৯৭৫ সালে আমার বন্ধু জেলা প্রশাসক আবুল হাসানতি মোকাজ্জল করিমের সহায়তায় লালন একাডেমী নামকরণ করি। আমি তখন কুষ্টিয়া কলেজে চাকরি করি। ১৯৫৫ সালে সর্বপ্রথম একজন রিক্সাওয়ালা হারান ফকিরের কাছ থেকে লালনের গান শুনি। এর আগে লালনের গান শুনিনি। আমি তখন কুষ্টিয়া কলেজে পড়ি। বাবা সরকারি চাকুরী করতেন কৃষি বিভাগে। ১৯৫৪ সালে প্রথম যশোর এবং ১৯৫৫ সালে কুষ্টিয়া তে গঙ্গা কপোতাক্ষ পরিকল্পনায় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে তাঁর দায়িত্ব। কলেজ থেকে বিকেলে ফিরবার পথে রাস্তা ফাঁকা থাকায় হারান ফকির গুনগুন করে গান ধরেছিল। সুর আর গানের বাণী আমার মনে চমক লাগিয়ে দেয়। বাসার সামনে এলে হারান ফকির আমার আগ্রহ দেখে আরও কয়েকটা গান শোনাল। প্রশ্ন করে জানতে পারলাম– গানগুলো লালন সাঁইজির। ছেউড়িয়া গ্রামে তাঁর আখড়া। এটা শুনবার পর, পরদিন সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। তখন কেউই লালন ফকির এবং তাঁর গান সম্বন্ধে জানে না। ছেউড়িয়ার বন্ধু ইসমাইল বলল– তাদের গ্রামেই লালনের আখড়া। বললে, –তুই যাসনে। ওরা গাঁজা খায়। মেয়ে ছেলে একসাথে থাকে। সারারাত গান করে। তুই নামাজ পড়িস। ওখানে গেলে তোকে তুকতাক করে ফেলবে। আমার মন কি আর বাঁধ মানে। ছুটলাম ছেউড়িয়া গ্রামে। তখন বেলা দুপুর। দেখি আখড়ায় কেউ নেই। একজন মহিলা ও তার সাথে

একজন পুরুষ ত্রিশূল হাতে আখড়া থেকে বেরুচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন- বাবা সবাই ভিক্ষেয় বেরিয়ে যাচ্ছি। তুমি সন্ধ্যায় এসো।

দেখলাম একটা বড় আটচালা ঘর। জানলাম এই ঘরটাতে লালন থাকতেন আর শিষ্যদের নিয়ে গান গাইতেন।

এখন যতীন বাবুর কথা বলা যাক। ১৯৬২ সালে কুষ্টিয়া কলেজে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা। ১৯৬৩ সালে লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র এবং বাউল কবি লালন শাহ নামে সর্বপ্রথম পাকিস্তান আমলে লালনের উপর বই লেখা। অতঃপর কোনো এক সময় কুষ্টিয়াতে আমার ছাত্র মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও তাঁর স্ত্রী আলম আরা জুঁই এর সঙ্গে তখন যতীনবাবুর সঙ্গে দেখা। আবুল আহসান চৌধুরি এবং মহম্মদ মনিরুজ্জামান। আমার ছাত্র ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে। আমার কাছে ওরা লালনের কথা শোনে। তারপর দুজনেই বড়ো গবেষক। যা হোক যতীন বাবু বেশ কয়েকবার কুষ্টিয়ায় এসেছেন। একবার আমার বাসায়ও এসেছেন। অসাধারণ পন্ডিত মানুষ। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য লালন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। অনেক অনুষ্ঠান করেছেন। গ্রন্থ লিখেছেন। দুই বাংলায় তিনি লালন গবেষক এবং অন্যদের মধ্যে পরিচিত।

দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে যাবার মতোই কলকাতায় অনেকবার যাওয়া-আসা। একবার বিজয় সরকারের অনুষ্ঠানে কলকাতায় যাওয়া হলে উদ্যোক্তা কাজল অধিকারী যতীন দার সঙ্গে মিলিয়ে দেন। লালন এবং বাউল বিষয়ে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান। মানুষ হিসাবেও অসাধারণ। একবার কলকাতা থেকে ফিরবার পথে তিনি বনগাঁ পর্যন্ত এসেছিলেন। বলতে কি, তাঁর প্রচেষ্টায় পশ্চিমবাংলায় লালন সংগীত এবং বাউল ফকিরেরা জনপ্রিয়।

যতীনবাবু আমার বাসায় এসেছেন। কুষ্টিয়াতে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি। এমন একজন বিদগ্ধ মানুষ আজ বিরল। সময় অভাবে বড়ো করে লিখতে পারলাম না। তিনি দীর্ঘজীবী হউন।

(-সংক্ষেপিত)

আলম আরা জুঁই: তিনি আমাদের পরিবারের এক আপনজন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালন মেলা সমিতির সভাপতি জনাব যতীন্দ্রনাথ রায় প্রতিবছরই লালনমেলায় অংশগ্রহণের জন্য এবং স্মারক পত্রিকায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠানোর তাগিদ দিয়ে আমন্ত্রণ জানাতেন লালন গবেষক মমনির উজ জামান কে। জরুরী কথাবার্তা সেই সময় মহার্ঘ্য দুরাভাসে বলতেন।

১৯৯৩ সালে ১৮ই অক্টোবর নদীয়া জেলার ভীমপুর আসাননগরে লালন তীর্থ কদমখালীতে লালন মেলায় আমরা অংশগ্রহণ করি। গেদে বর্ডারে জনাব রায় সদলবলে আমাদের অভ্যর্থনা জানান। যতীনদার সাথে সেই প্রথম দেখা হলেও গভীর আত্মিক বন্ধনে আমরা জড়িয়ে ছিলাম বহু পূর্ব থেকে। জনাব যতীন্দ্রনাথ রায় মহান শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। তিনি স্থানীয় একটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। সবাই তাঁকে মাস্টারমশাই বলে ডাকেন।

বর্ডারে ইমিগ্রেশন থেকে শুরু করে মানি এক্সচেঞ্জ এর সবাই মাস্টার মশাইকে এত সম্মান আপ্যায়ন করলেন আমরাও তা থেকে বঞ্চিত হলাম না। গেদে বর্ডারে পা দিয়েই বুঝলাম

মৃদুভাসি এই মহান শিক্ষককে যেভাবে সবাই সম্মান দিয়ে কথা বললেন তা দেখে বড় আনন্দ হল। আমরা নির্বিঘ্নে বর্ডারের নিয়ম মাফিক কার্যক্রম শেষ করে ট্রেনে উঠলাম। লালন মেলার এত বড় আয়োজন সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে যেয়ে তাঁকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হতো।

ফলে তার কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে যেত শরীর ভেঙ্গে পড়তো তবু তিনি তাঁর কর্তব্য কাজ থেকে এক চুলও বিচ্যুত হতেন না। মনে হতো তিনি যেন গভীর এক সাধনায় নিমগ্ন হয়ে আছেন। প্রতি বছরই জনাব রায় লালন মেলায় আমাদের আমন্ত্রণ জানাতেন কিন্তু অফিশিয়াল জটিলতা নানাবিধ কারণে যাওয়া সম্ভব হতো না। লালন মেলার কত সব প্রিয় মুখ তাদের আন্তরিকতা আদর আপ্যায়ন আজও মনে পড়ে। এই আনন্দ আয়োজনে শরিক হতে না পারার কষ্ট বুকের মধ্যে তোলপাড় করতো।

মেলা শেষ করে আমরা কলকাতায় যেতাম কবি, সুলেখক এবং দলিত সাহিত্য আন্দোলনের দক্ষ সংগঠক প্রিয়জন কল্যাণী ঠাকুরের বাসায়।

কলকাতা থাকাকালীন যতীন দা সব সময় আমাদের খোঁজ খবর রাখতেন একজন অভিভাবকের মত। কলকাতা থেকে কবে ফিরব, কোন ট্রেনে ফিরব, এটা জেনে নিতেন। মাজদিয়া স্টেশনে ট্রেন থামলে যতীনদা ব্যাগভর্তি টিফিন নিয়ে ট্রেনে উঠে আমার হাতে দিতেন। শেষ স্টপেজ গেদেতে নেমে সমস্ত ফর্মালিটিজ সম্পূর্ণ করে নো ম্যানস ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতেন। জলে ভরে যেত চোখ। ঝাপসা চোখে হাত নাড়তে নাড়তে আমরা বাংলাদেশ বর্ডারে পা বাড়াতাম। ২০১৩ সালের শেষের দিকে লালন,মশাররফ,কাঙাল,রবীন্দ্র গবেষক ম .মনির উজ জামান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রথমে কলকাতা নেওয়া হয়। যতীন দা কলকাতা থেকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বাংলাদেশের বেনাপোল বর্ডারের ভেতর অ্যাম্বুলেন্স সহ প্রবেশ করেছিলেন। আমাদের কোনরকম বেগ পেতে হয়নি। শুধু মনির উজ্জামান কে কুষ্টিয়ার অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে নিয়ে কলকাতার অ্যাম্বুলেন্সে তুলেছিলাম বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে। এই অসম্ভব সম্ভব করেছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিয়জন অভিভাবক জনাব যতীন্দ্রনাথ রায়।

কলকাতা এবং ভেলর হাসপাতালে থাকাকালীন খোঁজ খবর নিয়েছেন আমাদের পিতৃতুল্য অভিভাবক যতীনদা। বিদেশ বিভূঁইয়ে আশীর্বাদ এর মতো তিনি আমাদের মাথার ওপরে ছিলেন। আত্মার আত্মীয় হয়ে তিনি আমাদের পরিবারের এক আপনজন হয়ে আছেন।

লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক নিভৃতচারি গুণী মানুষ জনাব যতীন্দ্রনাথ রায় এর জীবিত অবস্থায় ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস স্মারকগ্রন্থ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এজন্য তাঁকে সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

উৎপল ঝাঁ: সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির প্রসারে সদা-সক্রিয় এক মহৎপ্রাণ।

যতীন্দ্রনাথ রায় নামটি উচ্চারিত হলেই চোখের সামনে ঋজু দীর্ঘদেহী শ্যামলকান্তি সৌম্য এক মানুষের ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

তাঁর ক্ষিপ্র চলনের মতোই তিনি সদা সক্রিয়। তা সে নদিয়া জেলার কদমখালির লালন মেলা বা উৎসব সংগঠিত করা হোক, কিংবা লোককবি বিজয় সরকারের স্মরণসভার আয়োজন---তিনি

সদা ব্যস্ত একজন মানুষ। 'শঙ্খচিল' নামক একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের কাজও করে চলেছেন পাশাপাশি। খেয়াল করলে দেখা যাবে বহুবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গেই তিনি নিবিড় ভাবে যুক্ত। কিন্তু এই সব কর্মকাণ্ডের প্রেরণা হিসেবে রয়েছে সমন্বয়বাদী লোকসংস্কৃতির প্রসারে আত্মনিয়োগ।

১৯৯০ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি মনস্বী অন্নদাশঙ্কর রায়ের কক্ষেই তাঁকে দেখেছিলাম। বুঝতে অসুবিধা হয় না অন্নদাশঙ্কর রায়ের সমন্বয়বাদী উদার সাংস্কৃতিক চেতনা যতীনবাবুকে প্রাণিত করেছে 'লালনতীর্থ ' সংগঠিত করার ক্ষেত্রে।

আর সেই উদ্দেশ্যেই এপার বাংলার কদমখালি থেকে ছুটে যান ওপার বাংলায় কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ার লালনতীর্থে।

দেশব্যাপী ভেদাভেদের এই অস্থির সময়ে মৃদুভাষী, একাগ্রমনা শিক্ষাব্রতী মানুষটি সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির প্রসারে নিরন্তর সক্রিয় থেকে তিনি আমাদের সামনে এক উজ্জ্বল অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আমি তাঁর সুস্থ-নীরোগ ও আনন্দময় কর্মবহুল জীবন কামনা করি।

লালনের সমন্বয়বাদী চেতনা আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠুক।

কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর: লোকসংস্কৃতি জগতে এক শ্রদ্ধেয় নাম – যতীন্দ্রনাথ রায়

দুই বাংলার লোকসংস্কৃতি জগতে এক শ্রদ্ধেয় নাম - যতীন্দ্রনাথ রায়। পালক মাতা যেভাবে পারিপার্শ্বিক আক্রমণ থেকে বাঁচাতে নিজের ছানাগুলিকে প্রসারিত ডানার নিচে লুকিয়ে রাখে, যতীনবাবু তেমনি বাংলার লোকসংস্কৃতিকে ভালোবেসে প্রাণপণে তাকে আগলে রাখার চেষ্টা করেছেন আজীবন। এবিষয়ে তাঁর আন্তরিকতা এত দুর্মর যে প্রবল শারীরিক অসুস্থতাকে তিনি হেলায় অতিক্রম করেছেন। ভয় হয়, তাঁদের মতো মানুষের পরিচর্যা না পেলে লোকসংস্কৃতি জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। তিনি দীর্ঘকাল সুস্থ ও ক্রীয়াশীল থাকুন। –

করুণাপ্রসাদ দে: মানুষের খোঁজে এক পথিক যতীন্দ্রনাথ রায়

ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলা, মাগুরা থেকে বহিরগাছি। জন্মেছিলেন ১৯৩৯ সালে যশোহর জেলার মাগুরার সবুজ ঘেরা রাধাকান্তপুর গ্রামে। লেখাপড়া শুরু হয়েছিল পাশের গ্রাম রতনপুর প্রাইমারি স্কুলে। তারপর বুকের ভিতর ধর্মের কাঁটার বেড়ায় বিক্ষিত হয়ে এলেন নদিয়ায়। নতুন স্কুল আড়ংঘাটা ইউএম ইনস্টিটিউট এ শুরু করলেন লেখাপড়া। স্কুল শেষে কলকাতার স্কটিশ চার্চ এ কলেজ জীবন। সে সময় তাঁর সহপাঠী ছিলেন পাবনার সুবিখ্যাত অ্যাডভোকেট কমলেশ সেন এর সুযোগ্য পুত্র প্রণবেশ সেন। যিনি পরবর্তীকালে হয়েছিলেন আকাশবাণী ও দূরদর্শনের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। কলেজে পড়া কালীন বাম আন্দোলনে যুক্ত হবার কারণে তাঁর কারাবাস হয়। বামপন্থী রাজনীতির সূত্রে ‘কম্পাস’ পত্রিকা অফিসে আনাগোনা। পরিচয় ঘটল বিশাল মাপের মানুষ পান্নালাল দাশগুপ্তের সঙ্গে।

যতীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন অন্য এক মানুষ। বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্ত জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে উন্নয়নমুখী পরিকল্পনায় গান্ধী দর্শনের প্রভাব ফরিদপুরের গান্ধী চন্দ্রনাথ বসুকে

নিয়ে কাজ শুরু করেন এবং এই পর্বেই যতীন্দ্রনাথ যুক্ত হন পান্নালাল দাশগুপ্তের কর্মযজ্ঞে। পান্নালালের রাজনৈতিক দর্শনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাজের একজন সহযোদ্ধা হয়ে উঠলেন। গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়নের কাজে গঞ্জে গঞ্জে সাধারণ মানুষের মধ্যে গমনাগমন। জেল থেকে বেরিয়ে যতীন বাবু সাংগঠনিক কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সেই সূত্রে আরসিপিআই এর সাথে যোগাযোগ এবং ঠাকুর পরিবারে শিকল ভাঙা পণ্ডিত রাজনীতিক রবীন্দ্রনাথের আদরের নাতি সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হন। ক্রমে গান্ধীবাদী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বিশিষ্ট রাজনীতিক অরুণা আসফ আলি প্রমুখের আপনজন হয়ে ওঠেন। দীর্ঘদিন তিনি নদিয়া জেলার বহিরগাছি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। যতীন্দ্রনাথ রায় ক্রমশ পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন লোকসংস্কৃতির সংগঠক হিসাবে। তবে শুধু লোকসংস্কৃতিই নয়, তিনি দলিতসাহিত্য কবিগান অষ্টকগান সকলকে নিয়ে লোক কবি সংস্থা গড়ে তোলেন। মতুয়া আন্দোলন এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে যুক্ত হন এই ধর্মনিরপেক্ষ মানুষটি। শৈশবে শোনা লালনের গানটি তাঁর জীবনের আচরণের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

“জাত না গেলে পাইনে হরি।
কি ছাড় জেতের গৌরব করি।
ছুসনে বলিয়ে।
লালন কয় জাত হাতে পেলে
পুরাতাম আগুন দিয়ে”।

এই জাতপাত ধর্মভেদ ধর্ম কুবুদ্ধির সারি সারি সব পাঁচিল টপকে মানুষ হয়ে মানুষের সঙ্গ করতেই আজীবন সচেষ্ট হয়ে ওঠেন আমাদের প্রিয় মানুষ যতীন দা। তাই তাঁর মনে লালনের সুযোগ্য শিষ্য ও লালন দর্শনের ভাষ্যকার বাউল দুদ্দু শাহ এর বাণী মাথায় রাখেন তিনি।

“যে ভাস্কর গড়ে পুতুল
তার চরণ করিয়া ভুল
পুজে সকল মাটির পুতুল”।

না, সত্যি যতীন বাবু মানুষ রেখে পুতুল পুজায় আটকে যাননি। তাই গ্রামেগঞ্জে শহরেনগরে মানুষের ভিড়ে চলতে চলতে একদিন পৌঁছে যান নদিয়ার ভীমপুর আসাননগরের কদমখালি লালন উৎসবের আঙ্গিনায়। মনের মানুষের খোঁজ পেয়ে যান লালনমেলায়। কদমখালিতে গড়ে উঠেছিল ১৯৮৮ সালে লালন ফকির মৃত্যু শতবর্ষে মেলা কমিটি। লালনের জন্ম ও মৃত্যুদিন পয়লা কার্তিকে মেলা শুরু হয় চারদিন ব্যাপী।

অনেক গুণীজনের সহযোগিতায় এই মেলা কমিটি গড়ে ওঠে। আশীর্বাণী পাঠান মনীষী লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়। এই কমিটির প্রথম সভাপতি হলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন সহ আধিকারিক মানিক সরকার। সেই সময় সর্বসম্মত সহ সভাপতি রূপে বরণ করা হয় যতীন্দ্রনাথ রায় কে। সেই সময় উপদেষ্টা হিসেবে দুই বাংলার অনেক গুণীজন এই মেলা উৎসবে যুক্ত হন। বাউল ও বাংলার সংস্কৃতি নিয়ে সারা জীবন কেটেছে সদ্য প্রয়াত সুধীর চক্রবর্তী লোকসংস্কৃতি বিশারদ সহজ মানুষ প্রয়াত পুলকেন্দু সিংহ, বগুলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পুতুলনাচের

সংগঠক লেখক প্রয়াত সুশান্ত হালদার। নদিয়ার বিশেষজ্ঞ প্রয়াত মোহিত রায় এবং কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরি প্রয়াত কবি অপূর্ব কর করুণাপ্রসাদ দে লালনগবেষক প্রয়াত মহম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখ।

প্রথম ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মানিক সরকার সভাপতি হিসেবে শুধু এই মেলার উৎকর্ষ সাধনে ব্যস্ত থাকতেন তাই নয়, নিজের টাকায় অনেকটা জমি ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা দান করে মেলার অঙ্গন কে প্রশস্ত করেছেন। ব্যারাকপুরের নিজ বাস ছেড়ে ওই গ্রামে দিনের পর দিন থেকেছেন মেলার অত্যন্ত সক্রিয় কর্মী সুকুমার সরকার ও তার স্ত্রী রিনি সরকারের প্রযত্নে। এমন মানুষটির জীবনাবসানে মর্মাহত আমরা মেলা কমিটির সভাপতি পদে তৎকালীন সহ সভাপতি যতীন্দ্রনাথ রায়কে সর্বজন স্বীকৃতিতে সভাপতি পদে বরণ করলাম। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সেই পদে আসীন থেকে সুশৃংখলভাবে তিনি পরিচালনা করেছেন। সকলেরই তিনি হয়ে ওঠেন প্রিয় যতীন দা।

দুই বাংলার মানুষ একাকার হয়ে আছে আমাদের যতীনদার জীবনে। শৈশবে জন্মভূমি ছাড়ার পরেও জন্ম মাটির টানে, সেখানকার মানুষের ডাকে বারে বারে ছুটে যান। মাঝে ১৯৬৪ সালে ভারত পাক যুদ্ধের ফলে দুই দেশে যাতায়াত ডাকযোগ সব বন্ধ হবার কারণে যেতে পারেননি। ওই সময়টুকু বাদ গেলেও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের শেষে আবার তাঁর যাতায়াত। কখনও যান কবিয়াল বিজয় সরকারের বিচরণ স্থানে, কখনও ছেউড়িয়ার লালন দড়গায় লালন উৎসবে। যান লালন গবেষক ডঃ আবুল আহসান চৌধুরি সাহেবের সান্নিধ্যে।

আমরা সবাই আশা রাখি আরও অনেক দিন তিনি তাঁর উপদেশাবলির মাধ্যমে লালন উৎসব ও বিজয় উৎসব সম্পন্ন করবেন। যদিও সেই ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত ক্ষীণকায় দীর্ঘদেহী মানুষের এই চলনে আজ এসেছে বয়সোচিত শ্লথগতি। কিন্তু তাঁর মনে এখনও চলার বাসনা, এখনও ছুটেছেন যেন এক সদ্য তরুণ। আরও ছুটবেন এমনটাই আশা রাখি।

তিনি শুধু কদমখালির লালন মেলাতেই নয়, শ্যামনগরের কেউটিয়া গ্রামে কবিয়াল বিজয় সরকারের জন্মোৎসব যা কবিয়াল পুত্র কাজল অধিকারী মহাশয় প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে বিপুল ব্যয়ে পালন করে থাকেন। যেখানে কাজল বাবু সুযোগ্য মানুষ হিসেবে যতীন্দ্র নাথ রায়কেই তাঁর বাবার জন্মোৎসব কমিটির সভাপতি হিসেবে সম্মানিত করেছেন। শারীরিক প্রতিকূলতাকে সর্বদাই উপেক্ষা করে আমাদের সর্বজনের যতীনদা বিজয় উৎসবে প্রতিবার উপস্থিত থেকে সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করেন।

আমরা চাই তাঁর আদর্শ ও কর্ম যেন দুই বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং দুই বাংলার মেলবন্ধনের প্রয়োজনে তাঁর আয়ু যেন দীর্ঘ হয়। আরও অনেকদিন তিনি আমাদেরকে প্রেরণা দিয়ে যান। চারিদিকে আজকের নানা রঙের তালিবানি শয়তানি বর্বরতায় চাপা পড়ে যাওয়া বিবেকের ওষ্ঠাগত প্রাণে যেন আবার গান জেগে ওঠে।

“মানুষ থুইয়া খোদা ভজ এই মন্ত্রণা কে দিয়াছে?
মানুষ ভজ কোরান খোঁজো পাতায় পাতায় লেখা আছে”।

আমরা দুই বাংলার প্রিয় মানুষ যতীন রায়ের মতো যদি এই সৈনিক হয়ে উঠতে পারি, যারা কবি

নজরুলের মহান মন্ত্র উচ্চারণ করে নতুন রেনেসাঁস ঘটানোর চেষ্টায় সক্রিয় হয়ে উঠতে সচেষ্ট হই, তবেই তো হবে বাঙালি জীবনের সার্থকতা।

“কাটায়ে উঠেছি ধর্ম আফিং নেশা।
ভাঙ্গি মন্দির ভাঙ্গি মসজিদ।
ভাঙিয়া গির্জা গাহি সংগীত।
এক মানবের একই রক্ত মেশা।
কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হ্রেষা।
বিংশ শতাব্দী কাজী নজরুল ইসলাম”।

কল্যাণী ঠাকুর: লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যের নিরলস কর্মী মাস্টারমশাই যতীন্দ্রনাথ রায়

যতীন্দ্রনাথ রায়কে আমি মাস্টারমশাই সম্বোধন করি প্রথম দিন থেকে। ট্রেনে যাতায়াত করত প্রায়শই। দেখতাম শীর্ণ দীর্ঘকায় ধুতিপাঞ্জাবি পরিহিত ঝোলা ব্যাগ কাধে দাঁড়িয়ে আছেন রানাঘাট স্টেশনে। অথবা, ট্রেন থেকে নেমে চলেছেন বগুলা বাজারের দিকে। দূর থেকে জানতাম বহিরগাছি স্কুলের হেড মাস্টারমশাই। আমি ১৯৯৩ সালের দিকে যতীনবাবুর অর্থাৎ মাস্টারমশায়ের সাথে আলাপ হওয়ার সুযোগ হয়। আমার বাবার পরিচিতির কারণে ওনার সাথে অল্প কিছু কাজ করার সুযোগ ঘটে সে সময়ে। তখন বগুলায় বসবাস শুরু করেছেন মানিক সরকার মহাশয়। সুশান্ত হালদার তো অনেক আগে থেকেই বগুলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। এই ব্যক্তিত্বের বলয়ে নিজের অজান্তেই ঢুকে পড়েছিলাম। যেতাম আসাননগরের কদমখালি লালন মেলায়। মেলা কমিটির সদস্যও ছিলাম। যার সম্পর্কে বলব, সেই মাস্টারমশাইয়ের পরিচিতি ও কর্মকাণ্ড নিয়ে দুচার কথা লেখার চেষ্টা করছি।

১৯৩৯ সালের ২রা অক্টোবর বর্তমান বাংলাদেশের যশোর জেলার মাগুরা সাব ডিভিশনের রাধাকান্তপুর গ্রামে জন্ম যতীন্দ্রনাথ রায়ের। বাবার নাম কৃষ্ণলাল রায়, মায়ের নাম তুলি রায়। পাশের গ্রাম রতনপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয় হাতেখড়ি হয়। পরে তিনি এই দেশে চলে আসেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬ সালে ইতিহাসে এমএ পাস করেন।

তাঁর এপারের গ্রাম বহিরগাছিতে ১৯৫৭ সালে একটি সমিতির মাধ্যমে স্কুল গড়ার আয়োজন চলতে থাকে। এই সময়ে কেশবলাল রায় তখনকার উদ্বাস্তুদের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রথম সভাপতি হন। বিশ্বনাথ গোস্বামী, যার নামে বিশ্বনাথপুর গ্রাম, তিনি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ১৯৬৪ সালে। যা বহিরগাছি জুনিয়র হাইস্কুল ও পরবর্তীতে হাইস্কুল ও বর্তমানে বহিরগাছি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে পরিচিত। ভিত্তি প্রস্তরের পাশাপাশি অতুল বালা, গৌরভাবিনী হলও প্রতিষ্ঠিত হয়। যতীন্দ্রনাথ রায়ের ছাত্রবস্থায় এই বিদ্যালয়ের গঠনের কাজে যুক্ত ছিলেন এবং ১৯৬৬ সালে এমএ পাস করার পর এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন।

তাঁর বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে আসাননগর ভীমপুরের মাঝে কদমখালির লালন মেলা কমিটি গঠন অন্যতম। এই কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় ১৯৯০ সালের ১৮ মার্চ শিবনিবাসে লালন মেলার আয়োজন করবেন। কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধার কারণে জায়গা বদল করে নিয়ে যাওয়া

হয় কদমখালিতে, শ্মশানের কাছে একটি খাড়ির পাশে। এই কমিটিতে ছিলেন মানিক সরকার সুশান্ত হালদার যতীন্দ্রনাথ রায় স্বপনকুমার ভৌমিক সুকুমার সরকার রঞ্জিত বিশ্বাস প্রমূখ। ১লা কার্তিক ১৯৯০ সালে লালন প্রয়াণ শতবর্ষ পালিত হয় কদমখালিতে। এই সময়ে কমিটির সভাপতি ছিলেন মানিক সরকার সহ-সভাপতি যতীন্দ্রনাথ রায় ও সুশান্ত হালদার, সাধারণ সম্পাদক সুকুমার সরকার। ১৯৯৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত যতীন্দ্রনাথ রায় সভাপতি ছিলেন এই সমিতির। মাঝে দু'বছর মানিক সরকার সভাপতিত্ব করে আবার ২০১৮-১৯ যতীনবাবু লালন মেলা কমিটির সভাপতিত্ব করেন। লালন মেলা কমিটির তরফে 'অচিন পাখি' নামে একটি লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে ১৯৯১ সাল থেকে। প্রথম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন সুশান্ত হালদার (১৯৯১)। দ্বিতীয় সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন মোহিত রায় (১৯৯২)। এবং ১৯৯৩- ২০০১ 'অচিন পাখি' সম্পাদনা করেন যতীন্দ্রনাথ রায়।

বহিরগাছিতে ১৯৯৩ সালে লোককবি সম্মেলন করেন এবং ১৯৯৪ ও পরবর্তী কয়েক বৎসর লোককবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বহিরগাছিতে তাঁরই প্রচেষ্টায়। বিজয় সরকার স্মরণোৎসব কমিটি গঠিত হয় কাকিনাড়ায়। প্রথমদিকে সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দাস ১৯৯৮-৯৯ নাগাদ। পরবর্তীতে বিজয় সরকার শতবর্ষ উদযাপিত হয় ২০০২ সালে। এই শতবর্ষ কমিটির সভাপতি ছিলেন পবিত্র সরকার। কার্যকরী সভাপতি ছিলেন যতীন্দ্রনাথ রায়।

বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি সংসদ গঠিত হয় ১৯৯০ সালে। এই সংসদের সভাপতি ছিলেন মানিক সরকার। সহ-সভাপতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ সরকার সুশান্ত হালদার ও পুলকেন্দু সিংহ। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ রায় ও কোষাধ্যক্ষ গৌতম অধিকারী। বহিরগাছিতে অষ্টক গানের অনুষ্ঠান শুরু করেন ২০০০ সাল থেকে। যদিও গাড়াপোতায় অষ্টক গানের ধারাবাহিক অনুষ্ঠান শুরু হয় ১৯৭৮ সাল থেকে। এই সংগঠনের সাথে তিনি যুক্ত।

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক 'শঙ্খচিল' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৮৭ সাল থেকে। যা এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। যতীন্দ্রনাথ রায় এই পত্রিকার সম্পাদক। ১৯৯৮ সালের ২৯ মে কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরের প্রয়াণের পর কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটির সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে মনোহরমৌলি বিশ্বাস সুশান্ত হালদার যতীন্দ্রনাথ রায় সমরচন্দ্র রায়। 'কম্পাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পান্নালাল দাশগুপ্তের সাথে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে যুক্ত ছিলেন তিনি। এই পত্রিকা শুরু হয় ১৯৬৩ সাল থেকে। ১৯৭৩ সাল থেকে তিনি গেদে রানাঘাট ও পরবর্তীতে গেদে শিয়ালদা ডেইলি প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের সাথে যুক্ত ছিলেন। এবং এই লাইনের বৈদ্যুতিকরণের কাজে দীর্ঘকাল লড়াই করেছেন তিনি। তাঁর আসন্ন পুস্তকরাজির অপেক্ষায় আমরা আছি সেগুলি হল- 'কাঁটাতারের এপার ওপারঃ আত্মকথনের পদাবলি', 'লালন মেলা্র ইতিবৃত্ত', 'রূপদর্শী গৌরকিশোরের স্বরূপ সন্ধানে', 'কবিতা বিকল্প অবয়বে'। যতীন্দ্রনাথ রায়ের মতো সমাজকর্মী আজকের প্রজন্মের মধ্য থেকে উঠে আসুক। তাঁর লোকসংস্কৃতি ও সমাজের কল্যাণমূলক কাজে লিপ্ত হোক। মাস্টার মশাইয়ের সুস্থ জীবন কামনা করি।

ডক্টর কাকলিধারা মন্ডল: তোমায় করি হে নমস্কার

“যিনি নানা কণ্ঠে কন, নানা ইতিহাসে
সাল মহৎ কর্মে পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে, দুঃখে কিছু নয়-
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্বভয়”।

এ পৃথিবী আজও শিশুর বাসযোগ্য আছে কিছু কিছু স্বার্থহীন মানুষের নিরন্তন প্রয়াসে। নীরবে নিভৃতে তাঁরা সামাজিক অসংখ্য কাজ করে যান। সকলের অগোচরে ক্লান্তিহীন সেই প্রয়াসই সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাকে চিরতরে কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে দেয় না। বহু বছর ধরে পিতৃতুল্য এই মানুষটিকে দেখছি- একই রকম নিরুচ্চার তাঁর কর্মকান্ড। তিনি শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায়। ১৯৯৯ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ অন্তত ৮৪ বছর বয়স তাঁর। বাংলায় যাকে বলে অশীতিপর বৃদ্ধ। কিন্তু সত্যিকারের বার্ধক্য আজও তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁকে দেখে ভরসা পাই। এই বয়সে তিনি যদি এমন কর্মক্ষম অবিশ্রান্ত থাকেন, আমরা কেন নয়? তিনি দীর্ঘ ৩৩ বছর বহিরগাছি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে করতে সবার কাছে ‘মাস্টারমশাই’ হয়ে গেছেন। গত ২৪ বছরের অবসরজীবনেও এই তকমা আজও সমুজ্জ্বল। আসলে অবসর তাঁর নাগাল পায়নি আজও। নদিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল বহিরগাছিতে তার বাস হলেও। প্রতিক্ষণে ছুটে বেড়ান এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলা- অসংখ্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সূত্রে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলেও তাঁর প্রথম ভালোবাসা আজও লোকসংস্কৃতি। ছাত্রাবস্থা থেকেই নানা ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি গ্রামের সাধারণ লোকসমাজ তথা লোকশিল্পীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। তাদের একান্ত আপনার জ্ঞান করে তাদের ভালোমন্দের জন্য নিরন্তর প্রয়াসী হয়েছেন। নিজের শিকড়ের সন্ধানে বাংলা মায়ের ঐতিহ্যময় রূপটিকে প্রাণপণে তুলে ধরতে চেয়েছেন গ্রামীণ উৎসবে মেলায় উদযাপনে।

তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব ১৯৯০ সালে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালন মেলা সমিতি’র প্রতিষ্ঠা। সমমনস্ক কিছু উদ্যোগী মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই সংগঠনটি তিনি গড়ে তুলেছিলেন। বিগত ৩৪ বছর ধরে অন্তহীন প্রয়াসে এই বিশাল মেলার আয়োজন করে চলেছেন। কার্যকরী সভাপতি কিংবা সভাপতি হিসেবে ১৮ বছর (১৯৯০ থেকে ২০০৮) ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় মেলাটিকে আজ দুই বাংলার মিলনক্ষেত্রে পরিণত করেছেন। লক্ষাধিক মানুষের যোগদানে এই মেলা সম্প্রীতির এক অনন্য বাতাবরণ সৃষ্টি করে চলেছে। লালন মেলা আর যতীন্দ্রনাথ রায় এখন একটাই নাম। কবি বিজয় সরকার লোককবি কিংবা কবিয়াল রূপে এপার বাংলায় যেমন জনপ্রিয়, বাংলাদেশেও ততোধিক শ্রদ্ধেয়। বিজয় সরকারের কৃতিত্ব প্রচারে কিংবা জন্মোৎসব পালনে মাস্টারমশায়ের উৎসাহের অন্ত নেই। ২০১০ সাল থেকে বহুবার তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশে কিংবা কেউটিয়ার বিজয় মেলায় গিয়েছি। তাঁর উদ্যোগে অসংখ্য গুণী মানুষকে সম্মিলিত হতে দেখেছি। এত কম কথা বলেন, এত আস্তে নীচু স্বরে কথা বলেন- অথচ এত উঁচু দরের মানুষ তিনি; এত কাজ

করে চলেন শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্য কিম্বা লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে। তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা। আজকের এই নিজের ঢাক নিজে পেটানোর যুগে নিরুচ্চার এই মানুষটিকে অন্তর থেকে সম্মান জানাই।

লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেই ইতিহাসে এই গ্রন্থটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে বিবেচিত হবে। আরও অনেক বছর পথ চলুন দাদা। আরও অনেক কাজ করুন। আরও অনেক যত্নে সংগঠিত করুন লালন বিজয়মেলা। অনেক শুভকামনা আপনার জন্য হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে– 'ভেঙেছ দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময় তোমারই হোক জয়'।

কাজল অধিকারী: মাস্টার মশাই

১৯৮০ সাল থেকে প্রতিবছরই ৭ই ফাল্গুন কেউটিয়াতে বাবার জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাবা বলতে লোককবি বিজয় সরকারের কথা বলছি। প্রথম কোন সালে প্রথম দেখেছি ঠিক মনে পড়ে না। তবে যখন থেকে দেখেছি, এক ভদ্রলোককে দেখতাম খদ্দরের পাঞ্জাবি সাথে ধুতি ও কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ নিয়ে প্রতিবার তিনি আসতেন। এবং সন্ধ্যা হতে না হতেই ফিরে যেতেন। আসলে তখনকার সময়ে কেউটিয়া একটি দুর্গম এলাকা বললে ভুল হত না। প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে কাঁকিনাড়া রেলস্টেশন থেকে রিক্সায় একমাত্র ভরসা ছিল। ফেরার সময় একটু রাত হলে আবার সেটাও মিলত না। সুতরাং অত্যাগ্রহী না হলে এ মুখো কেউ হতে চাইত না। অনুষ্ঠানে কিছু গুণগ্রাহী ভক্তবৃন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গুরু বিজয় সরকারের উপস্থিতির প্রাবল্যে কবি বিজয় সরকার চাপা পড়ে যেত। তবুও তিনি আসতেন। শীর্ণ দেহে ধীর পায়ে অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে দেখতেন আবার নিঃশব্দে চলে যেতেন। আমিও যে চিনতাম তখন এমনটা নয়। তিনি নিজেও নিজের প্রচারমুখী করে তোলেননি কোনোদিন। পরে জেনেছি ইনি যতীন রায়। বহিরগাছি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। মানুষটি ইতিহাসের শিক্ষক। কিন্তু লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগবশত ঝোলা কাঁধে বেরিয়ে পড়েন এদিক সেদিক। সে গাড়াপোতার অস্টক মেলায় হোক বা মুড়াগাছার পুতুলনাচ। সবকিছুতেই তাঁর আগ্রহ। কবিগানও তাঁর আগ্রহের বিষয়। বিশেষ করে বিজয় সরকারের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধায় তাকে টেনে নিয়ে আসত কেউটিয়ায়। পরিচয়ের পর ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে যেমন, তাঁর কর্মকাণ্ডের নানা দিকও তেমনই উন্মোচিত হতে শুরু করেছে। জন্মগ্রহণ করেছিলেন অবিভক্ত ভারতের যশোর জেলার মাগুরা মহকুমায়। দেশভাগের পর তাদের পরিবার নদিয়ার বহিরগাছিতে বসতি স্থাপনা করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করার পর শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। বহিরগাছি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেন। সাফল্যের সাথে কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব পালনের সাথে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। নিরলস অকৃতদার এই মানুষটি তাঁর বিশাল অবদানের জন্য দুই বাংলার সংস্কৃতি সচেতন ও বিদ্যোৎসাহী মানুষদের কাছে শ্রদ্ধাভাজন 'মাস্টারমশাই'। রানাঘাট থেকে গেদে লাইনের যে কোনো মানুষের কাছে 'মাস্টার মশাই' একজন বৈকালিক

বিগ্রহ। তাঁর সবচেয়ে বড়ো সাফল্য নদিয়ার ভীমপুর আসাননগরের লালন মেলা। এই মেলাটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তিনি। এহেন ব্যক্তিত্ব কেউটিয়ায় বাবার জন্মোৎসবে নীরবে আসতেন আবার নীরবে চলে যেতেন। জন্মোৎসব উদযাপন কমিটিতে যারা ছিলেন। তাঁরা বেশিরভাগই নিরক্ষর অথবা অর্ধশিক্ষিত। গ্রামীণ মেহনতী মানুষ। মাস্টার মশাইকে যারা চিনতেন তাঁরা ছাড়া কেউ তাকে নিয়ে আগ্রহী ছিলেন না। তবে সবচেয়ে তাঁরা কথা বেশি শুনতাম আমার জামাইবাবু প্রয়াত সুশীল বিশ্বাসের মুখে। এর আগে যারা এসেছেন তাদের মধ্যে ডক্টর তুষার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর রতন নন্দী অন্যতম। এসেছেন ক্ষীরোদবিহারী কবিরাজ ও ডক্টর মহেন্দ্রনাথ বৈরাগী প্রমুখেরা। কিন্তু সাংগঠনিক দক্ষতায় মাস্টারমশাইয়ের বিকল্প কেউ নয়। ১৯৯৪ সাল থেকে আরও একজনের পদচারণা শুরু হয়। তিনি শুভেন্দু মাইতি। এমনই করে কিছু সাংস্কৃতিক সচেতন মানুষ আসতেন আমাদের উৎসবে তবে পারস্পরিক যোগসূত্রহীন ভাবে।

এদের নিয়ে সাংগঠনিকভাবে কিছু করার চিন্তায় যারা ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম কেউটিয়া নিবাসী শ্রী নিতাইপদ সরকার ও ত্রিবেণীর প্রয়াত যতীন্দ্রনাথ মৃধা। জন্মোৎসব কেউটিয়াতে শুরু হয় ১৯৮০ সালে মূলত নিমাইচন্দ্র বিশ্বাস সুকুমার বিশ্বাস বিপুল বিশ্বাস ও আরও কয়েকজনের উদ্যোগে। ক্রমশ কিছু ভক্তবৃন্দের যোগদানের ফলে অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটল। অনুষ্ঠানের কলেবর বৃদ্ধি পেল বটে কিন্তু তা সীমাবদ্ধ হয়ে উঠল এক বিশেষ সম্প্রদায়ের অংশবিশেষের মধ্যে। পরিচালন কর্তৃপক্ষ তাদের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টার ত্রুটি করেনি, তবে বেশিদূর এগোতে পারেনি শিক্ষার অভাব ও যোগ্যতাহীনতার জন্য। সেটা বোধহয় ২০০১ সাল হবে। নদিয়ার আসাননগরে প্রদীপ বিশ্বাসের উদ্যোগে বসে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজয় মেলা। তিনদিন ধরে চলেছিল। এরই মধ্যে সময় করে বেশ কয়েকজন মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ২০০২ সালে বিজয় সরকারের জন্মশতবর্ষ পালন করা হবে। নিতাই বাবু ও শুভেন্দু মাইতির উপস্থিতিতে কিছু নাম প্রস্তাব আকারে রাখা হল। এবং ঠিক হল পরবর্তী সভা ব্যারাকপুরে বসবে। ব্যারাকপুরে চার নম্বর প্লাটফর্মের পাশে একটি বাড়িতে সভা বসল। ভাড়াবাড়ি না নিজের বাড়ি বলতে পারব না, তবে গৃহস্থের নাম তুহিন রায় ছিল। উপস্থিত সদস্যরা হলেন সর্বশ্রী যতীন্দ্রনাথ রায় নিতাইপদ সরকার প্রদীপ বিশ্বাস কৃষ্ণচন্দ্র দে বিনোদবিহারী দাস শুভেন্দু মাইতি ও আমি। ডক্টর পবিত্র সরকারকে সভাপতি ও যতীন বাবুকে কার্যকরী সভাপতি রেখে জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটি তৈরি হল। সেই থেকে 'মাস্টারমশাই' বিজয় সরকারের সামগ্রিক মূল্যায়নে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে চলেছেন আর আমারও সুযোগ হয়েছে তাকে কাছে থেকে জানার। জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানের সভাপতি ডক্টর পবিত্র সরকার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি কোনো মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে পারবেন না সময়াভাবে। ফলে মাস্টারমশায়ের উপর পুরো দায়িত্ব পড়ে। প্রথমে চলে গেলেন বাংলাদেশে। বাংলাদেশের প্রতিনিধি যারা আসবেন তাদের আসাটা সুনিশ্চিত করতে। দেখেছি কীভাবে পরম উৎসাহে ছোটাছুটি করেছেন অনুষ্ঠানটিকে সফল করে তুলতে। সাথে শুভেন্দু বাবুও ছিলেন। কিন্তু আরও একজনের নাম করতে ইচ্ছা করছে তিনি যতীন্দ্রনাথ মৃধা। তুই যতীন বাবু নিয়মিতভাবে প্রায় দু মাস ধরে ব্যারাকপুরে সুকান্ত সদনে অস্থায়ী অফিসে উপস্থিত থাকতেন। তবে পর্দার পিছনে যে মানুষটি না থাকলে শতবর্ষের অনুষ্ঠান করা যেত কি না বলা

কঠিন, তাঁর নাম অমল বাওয়ালি। ২০০৪ সাল থেকে কেউটিয়াতে স্মারক সমিতির উদ্যোগে যে জন্মোৎসব পালিত হয়ে আসছে তার সাথেও তাঁর নাম যুক্ত হয়ে আছে। ২০১০ সালে তাঁর নেতৃত্বে আমরা বাংলাদেশে যাই রূপগঞ্জের জামান ভাইয়ের আমন্ত্রণে। ডুমদিতে অনুষ্ঠান। থাকার জায়গা নড়াইলে। সাথে ডক্টর শক্তিনাথ ঝাঁ। ডক্টর রতন নদী ডক্টর কাকলীধারা মন্ডল ডক্টর সুরঞ্জন মিদ্দে ও ডক্টর নন্দদুলাল মহন্ত। ডুমদিতে গাড়ি করে নিয়ে গেল। ফেরার আগেই তুমুল বৃষ্টি। কাঁচা এটেল মাটির রাস্তা। গাড়ি অচল। জুতো হাতে করে পায়ে কাদামাটির বোঝা নিয়ে ৫-৬ কিলোমিটার দূরে। নড়াইলের গেস্ট হাউসে পোঁছাতে অনেক রাত হয়ে গেল। কিন্তু মাস্টারমশাই এর কোনো ক্লান্তি নেই। সেখান থেকে আমরা সদলে কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনার রূপান্তর গোষ্ঠীর আমন্ত্রণে সেসব জায়গায় গিয়েছি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগ আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতি' সেমিনারে যোগদানের সময় ঘটল এক বিপত্তি। আমাদের দলে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন তেমনই ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক, স্কুল শিক্ষকও ছিলেন। এ সেমিনার বিজয় সরকার সংক্রান্ত ছিল না। যারা মঞ্চে আলো করলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপত্তি তুলল যে তারা স্কুল শিক্ষকের সাথে একসাথে বসবেন না। প্রসঙ্গটি খুব বেশি দূর গড়াল না মাস্টারমশাইয়ের জন্য। মাস্টার মশাই এর অনুরোধে তারা নিরস্ত হলেন। তখন দেখেছিলাম সাহিত্য সংস্কৃতির জগতের মানুষ মাস্টার মশাইকে কতটা শ্রদ্ধা করেন। তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সীমাহীন। তাকে অশ্রদ্ধা করার মতো লোক বিরল।

দীর্ঘদিন ধরে বাসনা ছিল বাংলা একাডেমিতে বিজয় সরকারকে নিয়ে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করার। রাজ্যে পালাবদলের পর মহাশ্বেতা দেবী একাডেমির কর্ণধার হলেন। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। দিদি বলে ডাকতেন তাকে। একদিন সকালে আমি মাস্টারমশায়ের সাথে চলে গেলাম রাজডাঙ্গার মহাশ্বেতা দেবীর বাড়িতে। পথে ভিআইপি বাজার থেকে সঙ্গে এলেন আমাদের সুহৃদ অমল দাশগুপ্ত। মহাশ্বেতা দেবীর কাছে প্রসঙ্গ তুলতেই- প্রথম প্রশ্ন, বিজয় সরকার কে? তাকে বুঝিয়ে স্বমতে আনতে মাস্টারমশায়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। যেভাবে হোক মহাশ্বেতা দেবীকে রাজি করিয়ে মাস্টার মশাইকে নিয়ে চলে গেলাম বাংলা একাডেমির ভবনে। দিনক্ষণ ঠিক করে অনুষ্ঠানের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। মহাশ্বেতা দেবীর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন ডঃ শক্তিনাথ ঝাঁ, ডক্টর কাকলীধারা মন্ডল রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর অরুণ বসু, বাংলাদেশ হাইকমিশনের ডক্টর মোহাম্মদ ওমর ফারুক। মাস্টারমশাই নিজে সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত করতে একাডেমি সচিব উৎপল ঝাঁ সক্রিয় ছিলেন। সভাপতির ভাষণে মহাশ্বেতা দেবী বলে ফেলেছিলেন যে বাংলা একাডেমি বিজয় সরকারের জীবনী গ্রন্থ বের করবে। দীর্ঘ চার বছর ধরে তৎকালীন সচিব শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আমরা যোগাযোগ রাখার পর ২০১৬ সালে মাস্টার মশাইকে চিঠি দিয়ে তিনি জানালেন যে বই ছাপা হবে। ২০১৮ সালে ডক্টর নন্দী রচিত বইটি প্রকাশিত হয়। ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে মাস্টারমশাই -এর নেতৃত্বে আমি নড়াইলে যাই। নড়াইলে সর্বদলীয় সভা বসে। ঢাকা থেকে এসেছিলেন ডক্টর শামসুজ্জামান খান। নড়াইলের আওয়ামী লিগ। বিএন ওয়ারকার্স পার্টির

প্রতিনিধিরা এবং আমাদের তরফে মাস্টার মশাইকে নিয়ে প্রবল উৎসাহে ডক্টর খানকে ধরা হয় 'একুশে পদকে'র জন্য। 'একুশে পদকে'র পিছনে যে দুজন মানুষের অবদান ভোলা যাবে না। তাঁর হলেন ডক্টর খান ও কামাল লোহানি। ভারতে ফিরে আসতেই চুন্নু ভাই বললেন- ভারতে যেখানে যত অনুষ্ঠান হয়েছে তার লিফলেট পাঠাতে। আমার কাছে মূল কপি কিছু সংগৃহীত ছিল। সেগুলির ফটোকপি নিয়ে চলে গেলাম বহিরগাছি মাস্টারমশাইয়ের কাছে। তিনি একজন গেজেটেড অফিসারকে নিয়ে চলে এলেন বহিরগাছি এক নম্বর প্লাটফর্মের দক্ষিণ দিকে একটা মিষ্টির দোকানে। সবগুলি ফটোকপি প্রত্যয়িত করে দিলেন। তখন ইমেইল হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জার ছিল না। একমাত্র ভরসা ফ্যাক্স মেশিন। যাই হোক ২০১৩ সালে ঘোষণা হলো 'একুশে পদক' প্রাপ্তির। একুশে ফেব্রুয়ারি ওসমান হলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তুলে দেবেন পদক। কিন্তু বিপত্তি অন্যখানে। একই বছরের জানুয়ারি মাসে কলকাতা বইমেলায় বক্তৃতা করতে এসেছিলেন ডঃ শামসুজ্জামান খান। দুর্ভাগ্যক্রমে ওই সময়ে আমার জ্বর আর মাস্টারমশাইও অসুস্থ। ফলে কেউই যেতে পারিনি। খান সাহেব খুবই বিরূপ হয়ে পড়েছিলেন আমাদের ওপর। বাংলাদেশ গিয়ে পরিচিত মহলে একথা ব্যক্তও করেছিলেন। জানতে পেরে মুস্তাফিজ ভাই ফোনে জানালেন, খান সাহেব না কি আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট। সুস্থ হতেই মাস্টারমশাইকে নিয়ে বাংলাদেশ যাওয়ার উদ্যোগ নিলাম। কলেজ স্ট্রিট থেকে কাশ্মীর শাল মিউজিয়াম থেকে একটি শাল নিয়েছিলাম। যার অর্ধেক দাম মাস্টারমশাই দিয়েছিলেন। ঢাকা গিয়ে শাহবাগ চত্বরে মাস্টারমশাই বড়ো একটা ফুলের বোকে নিলেন। আমি নিলাম মিষ্টি। দুরুদুরু বুকে একাডেমিতে গিয়ে পৌঁছালাম। বেয়ারা খবর দিতে ঘরে রেখে পাঠালেন। মুখখানা গম্ভীর। প্রথমে কোনো উপহার নিতে চাইছিলেন না। কিন্তু তিনি মাস্টারমশাইকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন। ফলে বেশি সময় রাগ করে থাকতে পারলেন না। উপহার গ্রহণ করলেন। আমরাও হাপ ছেড়ে বাঁচলাম।

২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বিজয় সরকারের আলোচনা সভা। বক্তা ডক্টর শামসুজ্জামান খান। দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনা চলেছিল হঠাৎ ডঃ খানের কলকাতায় অন্য একটা অনুষ্ঠানে যোগদানে এলেন। ফোনে জানালেন ওই সময় যদি আমরা অনুষ্ঠানটি করি তাহলে আমাদের যাতায়াত থাকাখাওয়া খরচটা বেঁচে যাবে। এই সুবিধাটা হাতছাড়া করতে চাইলাম না। মাস্টারমশাইকে ফোন করতেই জানালাম তিনি চেন্নাইতে ভাই এর চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন। এদিকে মাস্টারমশাই ছাড়া অনুষ্ঠান করাও মুশকিল। মাস্টারমশাইয়ের ফেরার তারিখ অক্টোবরের দুই কি তিন! দুদিন বাদে ফোন এল। উনি সেপ্টেম্বরে ২৭ তারিখ কলকাতা ফিরছেন পুরনো টিকিট বাতিল করে। আমাদের অনুষ্ঠান ২৮ সেপ্টেম্বর। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। যখনই সমস্যা তৈরি হয়েছে, মাস্টারমশাই মুশকিল আসান হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন। আজ বিজয় সরকারের গান বিভিন্ন সারস্বত প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও পড়াশোনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী প্রজন্মের মানুষ জানতেই পারবে না, এমন একজন মানুষের কথা যার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই জায়গায় পৌঁছানো গেছে। গান্ধীজির ৭৫ তম জন্মবার্ষিকীতে আলবার্ট আইনস্টাইন এক নিবন্ধে লিখেছিলেন- রক্তে মাংসে গড়া এমন একজন মানুষ এই পৃথিবীতে হাঁটাচলা করেছিলেন এমন কথা হয়ত আমাদের ভাবী বংশধরেরা বিশ্বাসই করতে চাইবে না। একই

কথাটা মাস্টারমশাইয়ের ক্ষেত্রেও বলতে চাইছি। মানুষের কল্যাণে আজীবন কাজ করে যাওয়া মানুষটির পরিসর গান্ধীজির তুলনায় হয়ত পরিমিত। কিন্তু চরিত্রগতভাবে তুল্যমূল্য।

কার্তিকচন্দ্র বিশ্বাস:যতীন্দ্রনাথ রায়কে আমি যেমন দেখেছি

১৯৯০ সালে কোনো এক ঘটনাচক্রে বহিরগাছি হাইস্কুলে প্রথম পরিচয় ঘটে। তিনি তখন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করে আছেন। প্রধান শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও গুটিকয়েক কথা বলার মধ্য দিয়ে সেদিন বুঝেছিলাম তাঁর গাম্ভীর্য ও সরলতা। মনের মধ্যে নেই কো্নো দাম্ভিকতা। সেই থেকেই এখনও পর্যন্ত নদী প্রবাহের মতো বয়ে চলেছে কথোপকথন। শ্রী রায়ের সংস্পর্শে আসার পর থেকে মনের মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চয় হতে থাকে। তাঁর জীবন ও দর্শন সম্পর্কে যতই জেনেছি ততই যেন অজানার ভাগ বেশি মনে হয়। যা থেকে মন এবং মস্তিষ্কের বিকাশ সাধন হতে থাকে। শ্রী রায়ের সুবাদে কখনও কেউটিয়ার বিজয় মেলায়, কখনও কদমখালি লালনমেলা সহ নানান অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখেছি বা শুনেছি, তিনি একজন উদার মানবিকতার ব্যক্তিত্ব। তাঁর সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় মোস্তাফা জামান আব্বাসি কবি শামসুর রহমান সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ডক্টর আবুল হাসান চৌধুরি প্রমুখ ব্যক্তির পরিচয় হয়েছে। তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান হল পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের মধ্যে সংস্কৃতির সেতুবন্ধন রচনা করা। তিনি প্রকৃতই লালন গবেষক। লালন দর্শনের ওপর তাঁর অগাধ জ্ঞান ভান্ডার সঞ্চিত। তিনি ভীমপুর কদমখালিতে রাজ্য লালনমেলাযর দীর্ঘদিনের সভাপতি ছিলেন।

তাঁর ব্যক্তিত্ব বা জীবনদর্শন যতটুকু দেখেছি তাতে আপ্লুত হয়ে আমাদের সংস্থা 'ময়ূরহাট পল্লি উন্নয়ন সমিতি'র বাৎসরিক ক্রীড়া ও লোকসংস্কৃতি উৎসব -২০১৯ (২য় বর্ষ) অনুষ্ঠানের ক্ষুদ্র প্রয়াসে কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে লোকসংস্কৃতিবিদ, শ্রী সুবোধকুমার মোহন্তকে কবি এবং ডক্টর বিরাট বৈরাগ্যকে মতুয়া গবেষক হিসেবে সম্মানিত করতে পেরে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করি। শ্রীরায় মহাশয় ব্যক্তিজীবনে সংসারে আবদ্ধ না হয়েও বৃহৎ সংসারে নিজেকে উৎসর্গ করে আসছেন নীরবে নিভৃতে। প্রত্যেকের সঙ্গে সম মনোভাবাপন্ন মতবিনিময়ের মাধ্যমে আনন্দ অনুভব করে আসছেন। সর্বোপরি শ্রীরায় মহাশয়ের সুদীর্ঘ আয়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

ড. কুঞ্জবন বিশ্বাস: সমাজে যতীন্দ্রনাথ রায়ের অবদান

হ্যাঁ, প্রণম্য যতীন্দ্রনাথ রায় একজন বিরল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। একজন দক্ষ সংগঠকও বটে। বিশেষত লোকসংস্কৃতির আঙিনায় এপার বাংলা এবং ওপার বাংলায় তাঁর সমধিক খ্যাতির কথা সকলেরই জানা। গোটা জীবনটাই তিনি লোকসংস্কৃতির কাজে ব্যয় করেছেন। পেশাগতভাবে তিনি বহিরগাছি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পেশাগত জীবনের বাইরে অকৃতদার এই মানুষটি সমাজের জন্য দ্বিধাহীন প্রয়াসে ব্যয় করেছেন। তাই সকলের কাছে একদিকে তিনি যেমন শ্রদ্ধা সম্মানের তেমনই সকলের অতি কাছের ও ভালোবাসার মানুষও বটে।

শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সাথে আমার প্রায় ২৫ বছরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তখন আমি বগুলা

হাইস্কুলের সহ-শিক্ষক। বহিরগাছি হাই স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা বগুলা হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে আসত। সেই সুবাদে প্রথম আলাপ হয়। তখন তিনি আসাননগর কদমখালির মেলার সঙ্গে যুক্ত তা জানতে পাই। আমি লালনের ওপর পড়াশুনায় খুব আগ্রহী ছিলাম। এই বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হয়। তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালনমেলা কমিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯৯০ সালে এই মেলার অভিযাত্রা শুরু হয়। এই মেলা উপলক্ষে একটা স্মরণিকা প্রকাশ করা হয় প্রত্যেক বছর। যেহেতু আমি গবেষণামূলক পড়াশুনা ও লেখালেখি করি, এ কথা জেনে তিনি আমাকে লালনের ওপর লেখা তৈরি করতে বলেন। তখন তিনি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বেশ কয়েক বছর পরে ঘনিষ্ঠতার পর এবং মেলায় অংশগ্রহণের পর একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। ২০০৫ সাল। প্রথম লেখা ছাপা হয় ‘অচিন পাখি’ পত্রিকায়। তখন থেকে ধারাবাহিকভাবে এখনও পর্যন্ত (করোনার দু'বছর বাদ দিয়ে)। প্রত্যেক বছর আমার লেখা প্রকাশিত হয়। কথাগুলো উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, লালনচর্চা পড়াশোনা গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ ইত্যাদির জন্য আমি যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁর উৎসাহ সহযোগিতা ছাড়া লালনের ওপর দুটি গ্রন্থ এবং বাউলের ওপর দুটি গ্রন্থ রচনা সম্ভব হত না।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালনমেলা কমিটিতে তাঁর অনবদ্য ভূমিকা ছিল। তিনি কখনও কমিটিতে কার্যকরী সভাপতি, সভাপতি, ‘অচিন পাখি’ স্মরণিকার সম্পাদক ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেছেন। এপার বাংলা ওপার বাংলার বাউলগবেষক, লালনগবেষক, পন্ডিত বিদগ্ধ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে লালনমঞ্চের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। বিশেষত অন্নদাশঙ্কর রায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আবুল আহসান চৌধুরি প্রমুখ ও লেখকদের মেলার মঞ্চে এনে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ রায়ের অতীব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এ ছাড়া ওপার বাংলার বাউল শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল আত্মীয়তার মতো। তিনি বহুবার প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের লোককবি বিজয় সরকার ও লালন বাউল বিষয়ক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েছেন এবং সেখানে গিয়ে দুই বাংলার লোকসংস্কৃতিক সেতু রচনা করেছেন। সেই সুবাদে কদমখালির লালন মেলায় বাংলাদেশের বহু বাউল শিল্পী আসেন এবং লালন গান পরিবেশন করেন। ভুললে চলবে না, এর কৃতিত্ব যতীন্দ্রনাথ রায়কে দিতেই হবে।

আজ পর্যন্ত মেলার বয়স প্রায় ৩৩ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে মেলা কমিটিতে নানা মতবিরোধ, সাংগঠনিক উত্থানপতন ঘটেছে। এ সবের মনের কথা যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় আমার সঙ্গে শেয়ার করতেন কিন্তু কখনও হতাশ হতেন না। ঠিকভাবে মেলাটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য যা কিছু করনীয় তা তিনি করতেন। তবে আশার কথা কমিটি তাঁর প্রতি যথাযথ মূল্যায়ন করেছে। তাকে মেলা কমিটি সংবর্ধিত করেছে। এতে আমরা খুশি।

লোকসংস্কৃতির ব্যক্তিত্ব হিসেবে যতীন্দ্রনাথ রায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। তিনি লোককবি বিজয় সরকার স্মারক সমিতির একজন কর্ণধার হিসেবে এপার বাংলা এবং ওপার বাংলা উভয় ক্ষেত্রেই লোককবির বাণী দর্শন প্রচার করেছেন। বহু মঞ্চে বিজয় সরকারের ওপর স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। ২০০২ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত লোককবি বিজয় সরকার স্মারক সমিতির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিজয় সরকারের পুত্র কাজল অধিকারীর সঙ্গে যতীন

বাবুর সম্পর্ক অতি আত্মীয়তার মতো। কাজল বাবুর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার কেউটিয়ায়। সেখানে বিজয় সরকারের একটি মন্দির আছে। আমি যতীন বাবুর সঙ্গে কেউটিয়ায় বিজয় সরকারের অনুষ্ঠানে গেছি। যতীন বাবুর উদ্যোগে বিজয় সরকারের জন্মশতবর্ষের উদযাপন পালন করা হয় ব্যারাকপুরে। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ভাষাবিদ পবিত্র সরকার মহাশয়। বাংলা ভাষার দীনতা দূরীকরণে ও বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যতীন্দ্রনাথ রায়ের ভূমিকার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। এপার বাংলায় 'ভাষাশহিদ স্মারক সমিতি'র বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার যে কার্যকলাপ তাতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এই সমিতির তিনি রাজ্য সহ-সভাপতি ছিলেন। সভাপতি ছিলেন সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আমি নিজেও যতীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে সহযোগী ছিলাম। একবার অশোকনগরে 'ভাষাশহিদ স্মারক সমিতি'র তিন দিনের একটি কর্মশালা হয়। ওই কর্মশালায় তিনি আমাকে সঙ্গে নেন এবং আমি কর্মশালায় পুরো সময়টা উপস্থিত ছিলাম। ওই কর্মশালা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে রানাঘাটে এসে একটা মহকুমা স্তরের কমিটি তৈরি করা হয়। এই কমিটির কার্যকরী সভাপতি ছিলাম আমি। এই কমিটির উদ্যোগে রানাঘাট পৌরসভার প্রাঙ্গণে বিরাট আকারে সম্মেলন করা হয়। এই সম্মেলনে রাজ্য স্তরের এবং উত্তরবঙ্গের কয়েকজন ভাষাশহিদ স্মারক সমিতির সাংগঠনিক নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। এই সভা সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন মাননীয় যতীন্দ্রনাথ রায়।

বাংলা বাঙালির সংস্কৃতির প্রতি। যতীন্দ্রনাথ রায়ের আগ্রহ উদ্যোগ ছিল যথেষ্ট। এর জন্য বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন হত। কল্যাণীতে বহুবার হয়েছে। এখনও হয়। যতীন্দ্রনাথ রায় এই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন। কখনও বা নদিয়া জেলারও সভাপতি ছিলেন। লোকসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দীর্ঘদিন 'শঙ্খচিল' পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বহু পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। জানা যায় আকাশবাণী কলকাতায় বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনায় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

কৃষ্ণপদ বিশ্বাস: শ্রী রায় মহাশয়ের নিরলস প্রচেষ্টা আজও বর্তমান

মাননীয়, শ্রী যতীন্দ্র নাথ রায় মহা শয়কে নিয়ে আপনি লিখছেন জেনে যার পর নাই অভিভুত হলাম। আমার আত্মপ্রত্যয়ী ভাবনা, আপনার কলমে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে আমার পরম শ্রদ্ধেও অতিব কাছের মানুষ বাংলার লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই প্রান পুরুষ। পরবর্তী প্রজন্মের গবেষকদের শিকড়ের যন্ধানী কলমের রসদ যোগাবে আপনার এই — "বাংলার লোক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী—যতীন্দ্র নাথ রায়"— নামক গ্রন্থটি। যার জীবন চরিতে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে লোকায়ত ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রান সঞ্চারের দায়বদ্ধতা। এ বিষয়ে দুই বাংলার অটুট মেলবন্ধনে শ্রী রায় মহাশয়ের নিরলস প্রচেষ্টা আজও বর্তমান। বর্ধিষ্ণু বহিরগাছি অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে সামাজিক চেতনা বোধই উৎসর্গীকৃত জীবন ধারাকে বয়ে নিয়ে চলছে অব্যাহত গতিতে। আমি এই বিশিষ্ঠ আদর্শ শিক্ষাবিদের দীর্ঘ সুস্থ জীবন প্রার্থনা করি।

ক্ষিতীশচন্দ্র বর (সরকার): লোকবৃত্তের আলোর দিশারী

আঞ্চলিক বৃত্তের পরিধির মধ্যে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচয় ছিল শ্রদ্ধেয় সম্মানীয়। ও সুপরিচিত গ্রামীণ এস সি যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের। পেশায় শিক্ষক বহিরগাছি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক। স্বল্পভাষী দীর্ঘদেহী অত্যন্ত হ্রাস ভারী। আপন ব্যক্তিত্বের বলয়ের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। দ্বিজাতি তত্ত্বে বিভাজিত বৃহৎ ভঙ্গের খন্ডিত ভঙ্গের পশ্চিমবঙ্গে আগত ছিন্নমূলের শিকড় ছড়িয়ে পড়ল। স্বাধীন মানবজমিনে। শুরু হলো একটা মিশ্র সংস্কৃতি। তবুও ছিন্নমূল জনজাতির বনভূমিতে। ওপার বাংলার লোকসংঘ সংস্কৃতি লালিত ও পালিত হতে হয়ে বেঁচে রইলো। যেমন লৌকিক দেবদেবী। যেমন হ্যাচরা পূজা। বাস্তু পূজা। অষ্টক গান। ফুলো গাদ। গাজন চরক বালাকি জাগের গান। রামায়ণ হরির লুট ভাটিয়ালি কীর্তন। গীতযাত্রা পৌষপার্বণ ইত্যাদি। এসব লোকায়ত সংস্কৃতির পরিবেশের মধ্যেই। শ্রদ্ধেয় যতীন বাবুর একটা সম্ভব ভাবে পরিচিতি ছিল। তখন রেডিয়ো দৈনিক খবরের কাগজ চিঠিপত্র ইত্যাদি থেকেই মানুষ খাদ্য মানুষ। ছিন্নমূলের জনস্রোতের ধারাই ওপার বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ লোকসংস্কৃতি একটি। লোকমান্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কবিগান। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে পা রাখলেন। বেজে উঠল ঢোল কাশি দোতারা। ছিন্নমূল জনজাতি। এক বুক বেদনা নিয়ে বসলেন কোভিদ খোলায়। কাব্য মঞ্চ ডাক। সখী সংবাদ। টপপাত হওয়া গানে মাতিয়ে তুললেন। নকুল দত্ত। রাজেন্দ্রনাথ সরকার। সন্ধ্যা সরকার। বিজয় সরকার। নিশিকান্ত সরকার। অনাদি জ্ঞান সরকার। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। প্রাণী বাস সরকার। সুরেন সরকার। অমূল্যরতন সরকার প্রমুখ চারণ কবিগন। অতঃপর রসিকলাল সরকার এসে। সুর ছন্দ শাস্ত্র কথাই। গল্প রসে ভরিয়ে দিলেন বাংলার দশ হিসী। সেই সুর। কানের ভিতর দেয়া মরমে পশিলা। তিনি অবসরপ্রাপ্ত পূজ্যপাদক শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ রায়। একান্নবর্তী পরিবারের উচ্চ শিক্ষিত সন্তান। অন্নবস্ত্র বাসস্থান প্রতিপত্তি। সামাজিক মর্যাদা ঈশ্বরের অজেয় কিছুই ছিল না। বিশেষ্যটি উঠে গিয়ে। রায়বাড়ি রায়বের ছেলে। যে প্রশ্নটি বহুবার করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি। কারণ তিনি শিক্ষক।

খৈবর রহমান খান: আমার প্রথম দর্শন যতীন্দ্রনাথ রায়

আমার প্রথম দর্শন যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সঙ্গে প্রায় ৩০/৩১ বৎসর পূর্বে লালনতীর্থ কদমখালি লালনমেলায়। দেখার পর শান্তভাষী মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা পূর্বপর রয়েই গেছে। প্রধান শিক্ষক হয়েও তিনি লালনের ধারাকে ধরে এপার বাংলা ওপার বাংলার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং নিষ্ঠার সহিত পালন করে সফলতা এনেছেন। এছাড়াও লোকসংস্কৃতিচর্চা, লালন ও বিজয় গবেষক ও একনিষ্ঠ সমাজসেবক হিসেবে নিঃস্বার্থভাবে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সারা জীবন দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর গুণের বর্ণনা দেওয়ার ভাষা আমার নেই। সুস্থ ও মঙ্গলময় জীবন ঐকান্তিকভাবে কামনা করি।

গণেশচন্দ্র মন্ডল:লোকসংস্কৃতি গবেষক ও লোকায়ত সাহিত্যকার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় ও অষ্টক গান।

অষ্টক গান দুই বাংলার এক অতি জনপ্রিয় লোকায়ত সংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গ। এই অষ্টক গানের প্রোগ্রাম দূরদর্শনে প্রসারিত করার বিষয়ে আমি যখন ভাবনা চিন্তা করছিলাম তখন সেই ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে কলকাতা দূরদর্শনের অফিসে বসে আমার সাথে পরিচয় হয় সৌম্যকান্তি দীর্ঘাঙ্গী ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত, কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা বিশিষ্ট এক প্রধান শিক্ষকের যিনি তখন নদিয়া জেলার বহিরগাছি গ্রামের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলে নিজেকে পরিচয় দেন আমার কাছে।

সুদীর্ঘ সময় ধরে আলোচনার মাধ্যমে সেদিন যতীনবাবুর যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম, সেই পরিচয়ের ফলশ্রুতি হিসেবে ওই সালের মার্চ এপ্রিলে শেষ পর্যন্ত দূরদর্শন কলকাতার জন্য অষ্টক গানের ওপর এক বিশেষ প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পেরেছিলাম শেষ পর্যন্ত। উনি ছিলেন ওই প্রোগ্রামের স্ক্রিপ্ট রাইটার ও ধারাভাষ্যকার। সেই থেকে আজ পর্যন্ত যতীন বাবুর সাথে সুদীর্ঘ মেলামেশার সূত্রে ওঁর যে লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যপ্রেমের যে পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে এককথায় আমি বিমোহিত ও মুগ্ধ।

শুধু অষ্টক গান নয়, লালনগীতি লোককবি বিজয় সরকারের কবিগান প্রভৃতি বিষয়ে ওঁর গভীর জ্ঞান ও সুচিন্তিত মতামত লেখনী আমাদের এই সংস্কৃতিকে এক উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে বলে আমি মনে করি। উনি বলেছেন- ‘লোকসংস্কৃতির উৎস গ্রাম ও গ্রামীণ পটভূমি। ওই প্রেক্ষাপটে অষ্টক গানের উৎস সন্ধানে তাৎপর্য আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি ও পরিবেশের প্রভাবের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরী’। অষ্টকগান, কবিগান প্রভৃতি আমাদের সমাজের একটি জনগোষ্ঠীর তথা মানব সভ্যতার ও সংস্কৃতির সঠিক অগ্রগতির হাতিয়ার। অষ্টকগান একসময় বাংলাদেশের যশোর ফরিদপুর খুলনা পাবনা প্রভৃতি জেলার এবং আমাদের দেশের নদিয়া উত্তর ২৪ পরগনার তথাকথিত নিম্ন সমাজ যেমন নমঃশূদ্র কপালী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল। আজও তার কিছু কিছু আমরা দেখতে পাই আমরা এই এই দুই জেলার কিছু অংশে।

বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ সাহিত্যগবেষক ও সমালোচক ডক্টর আনোয়ারুল করিম উল্লেখ করেছেন লোকসঙ্গীতের দুটি বিশেষ ধারা–

(ক) লোকধর্ম বা লৌকিক আধ্যাত্বচেতনা পুষ্ট সাধন সঙ্গীত

(খ) লোকজীবন নির্ভর সাধারণ সংগীত হিসাবে।

তিনি এর শ্রেণিবিন্যাস করেছেন আঞ্চলিক কাহিনিভিত্তিক ভক্তিমূলক প্রার্থনাসংগীত হিসেবে। কিন্তু যতীনবাবু সেখানে কিছুটা দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন– ‘আমার মনে হয় অষ্টকগান কবিগান প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির এক বিশেষ অঙ্গকে এভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা বা ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্টে ভাগ করা সমীচিন হবে না’। উনি অষ্টক গান প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে বলেছেন– অষ্টকগানে ভক্তি প্রার্থনা ও আঞ্চলিক কাহিনি সবকিছু মিশে থাকে।

আমাদের সমাজের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে ওঁর এই গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাই আমি ওঁর সাথে

বিভিন্ন অষ্টকগান প্রোগ্রামের আলোচনা সভায় একসাথে উপস্থিত থাকার সুবাদে। যেমন নদিয়া জেলার গাড়াপোতা গ্রামের অষ্টকমেলায় অষ্টকগানের প্রতিযোগিতা আমি দূরদর্শনে প্রচারিত করতে পেরেছিলাম ওঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতা পরামর্শ ও উপদেশের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে যা জাতীয় চ্যানেল দুরদর্শন দিল্লি থেকেও প্রসারিত হয়েছিল তাঁর উৎকর্ষতার গুণে।

অষ্টকগান কবিগান নিয়ে লালনগীতি প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির প্রতি ওঁর যে ভালোবাসা ও মমত্ববোধ, সেই সাথে নানা লেখনীর মাধ্যমে ওঁর যে মহান অবদার তার সঠিক মূল্যায়ন হওয়া বিশেষ জরুরী কর্তব্য বলে আমি মনে করি। তাই এই অশীতিপর নবযুবকবৃন্দের প্রতি বিশেষ সম্মাননা জানানোর প্রয়োজন। আমি ওঁর সুস্বাস্থ্য ও সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি। যাতে উনি আরও নানাভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে উনি সুসমৃদ্ধ করে যেতে পারেন ওঁর এই গবেষণালব্ধ লেখনীর মাধ্যমে।

গৌতম অধিকারী: যতীনবাবুর সঙ্গে সহকর্মী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের হাটে-মাঠে ঘুরেছি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় বহিরগাছি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বহুদিন। আমার ছাত্রাবস্থায় তাঁকে মাষ্টারমশাই হিসেবে জানতাম ও শ্রদ্ধা করতাম, সেটা দূর থেকে এবং খানিকটা ছাত্রসুলভ মানসিকতা থেকেই। ১৯৯০ সালে আসাননগর-ভীমপুরের কদমখালিতে যখন মহাত্মা লালন ফকিরের তিরোভাব শতবর্ষ উপলক্ষে লালন মেলার প্রবর্তন হয়, তখন মূলত লালন মেলার মূল পরিকল্পনাকারী মাণিক সরকারের উদ্যোগে আমি তার সঙ্গে যুক্ত হই। সেখানে আমাদের আর একজন শিক্ষক সুশান্ত হালদার ছিলেন। আমি ছিলাম সম্ভবত মহাত্মা লালন তিরোভাব শতবর্ষ উদযাপন সমিতির সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। সেই সমিতির অন্যতম সহসভাপতি ছিলেন যতীন্দ্রনাথ রায়। এই লালন মেলার মধ্য দিয়েই তৈরি হয় বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি সংসদ। বাণীপুর লোকসংস্কৃতি মেলায় জনতা হলে প্রথম সম্মেলনে সভাপতি মাণিক সরকার, সাধারণ সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ রায় ও আমি কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হই। এই সাংগঠনিক সূত্র ধরে যতীনবাবুর সঙ্গে সহকর্মী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের হাটে-মাঠে ঘুরেছি। তখন ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক শ্রদ্ধাকে অমলিন রেখে বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছে।

যতীনবাবু লোকসংস্কৃতি অঙ্গনের নিষ্ঠাবান সংগঠক, নেতৃত্বের ভূমিকাও ছিল। তাঁর ভূমিকা ও অবদানে লোকসংস্কৃতি চর্চা অনেক কিছু পেয়েছে। তাঁকে ঘিরে একটা অভিমান ও অভাব আমার ছিল আজও রয়েছে। একাধিকবার তাঁকেও বলেছি যে, টুকরো-টাকরা লেখা নয়, পূর্ণাঙ্গ কাজ করুন। সেটা করার সমূহ যোগ্যতা, দক্ষতা, ও অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি করলেন না-এই অভিমান রয়েই গেল আমার। তথাপি তিনি যতটুকু করেছেন, তার মুল্যও কম নয়। আপনাদের এই স্মারকগ্রন্থে যতীন্দ্রনাথের অবদান যথাযথ মূল্যায়নে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক, এটাই আশা করি।

গৌতম চট্টোপাধ্যায়: যতীনদা

যখন আমাদের পরিপার্শ্ব থেকে একে একে দৃষ্টান্ত হতে পারে এমন মানুষ-এর সংখ্যা বিরল

হয়ে যাচ্ছে, তখন উপভোগ করতে থাকি সেইসব ভালোমানুষদের সান্নিধ্য যাদের পর সাড়ে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অবিচল শ্রদ্ধার স্থানে রেখেছি। যতীনদা আমার কাছে সেই রকম মানুষ। ১৯৭৯সাল। তখন শ্রদ্ধেয় 'পান্নাবাবু' (পান্নালাল দাশগুপ্ত) বেঁচে- প্রিয় মামণির (নমিতা ভট্টাচার্য) কাছ থেকে যুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনি পান্নাবাবু জমিদার তনয় হওয়া সত্ত্বেও হেলায় বৈভব ছেড়ে এসে জনসেবার অঙ্গনে অথবা স্বাধীনতা-সংগ্রামী তথা বামপন্থী রাজনীতির সংস্রবে বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও কীভাবে পল্লী ও রবীন্দ্রনাথের অবাদর্শে গ্রামোন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। পান্নাবাবুর ভাবাদর্শের অনুসারী মামণি ও যতীনদা CADC/ উলের সোসাইটি (TSRD) / কম্পাস পত্রিকা নিয়ে উদ্বুদ্ধ এবং কর্মচঞ্চল। মামণির সুবাদে একে একে পরিচিত হই বাংলার অসামান্য মৌলিক নাট্যকার তথা থার্ড থিয়েটারের প্রবক্তা বাদল সরকারের সাথে, প্রখ্যাত নব্য ধারার চলচ্চিত্রকার বারীণ সাহার সাথে, গ্রামোন্নয়ন সংগঠক অজিত নারায়ণ বসু সহ অঞ্জলি বসু (মনি) শ্রীময়ী বাণী সরস্বতী প্রমুখের সাথে। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে, সুদূর কাছাড়ের কায়স্থগ্রাম ছেড়ে নমিতা ভট্টাচার্য পান্নাবাবুর ডাকে এই বাংলায় এসে রানাঘাটের উপকণ্ঠে বরণবেড়িয়ায় যতীননা ও পুষ্প বিশ্বাস প্রমুখের সাহচর্যে শ্রীমা মহিলা সমিতির কাজকর্ম শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালের সংগঠক রাসমণিদি, রমাদি, মিনুদি, রত্না-দের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। কম সময়ে পরিচিত হই সদা- শ্রদ্ধেয় মানুষ যতীনদা মানে শ্রী যতীন রায় এর সাথে এবং ক্রমশঃ তিনি আমার পরিবারের একজন অভিভাবক হয়ে ওঠেন।

ততদিনে মামণি ও অন্যান্যদের কষ্টে গড়া শ্রীমা মহিলা সমিতির কাজে কাঠবিড়ালীর ভূমিকায় নিজেকে দেখতে এক নীরব তৃপ্তি পেতাম। দেখেছি নীরবে কাজ করে যাওয়া কাকে বলে। যতীনদা তাঁর বহিরগাছি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা যথাযথ ভাবে পালন করার পরেও হাসিমুখে সময় বের করে নিয়ে কখনো তাঁর নিজগ্রামের সমস্যা দূরীকরণে ব্যস্ত, কখনো থিয়েটারের সংগঠকের ভূমিকায়, কখনো সাহিত্য-সংস্কৃতির আড্ডায়, কখনো লালন-চর্চায় ব্যাপৃত রেখেছেন নিজেকে।

'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো- এই রবীন্দ্রগানকে স্মরণ করেই কি পান্নাবাবু 'মীণমঙ্গল এর সূচনা করেছিলেন! ইছামতী নদীর অবহেলিত জলধারায় মাছের জোগান বাড়ানোর জন্য মীণমঙ্গল-এ যতীনদার ভূমিকা ছিল অনবদ্য। আবার ইছামতী বাঁচাও আন্দোলনেও তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। অনেক পরে আমরা যখন চূর্ণী বাঁচানোর আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে শ্রীময়ী মেধা পাটেকরকে রাণাঘাটের প্রচারসভায় নিয়ে আসি তখনো (এবং অদ্যাবধি) পাশে পেতে থাকি সেই যতীনদাকেই।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ নারায়ণ বসু যখন সুন্দরবনে রাঙাবেলিয়ার সুবিখ্যাত সংগঠক তুষার কাঞ্জিলাল প্রমুখের সাহচর্যে ধর্মগোলা-র পুনঃপ্রবর্তন করে তার সুফল পেলেন- সেই ঢেউ সর্বত্র আছড়ে পড়েছিল, যতীনদাও হলেন তার সহায়ক ব্যক্তি। নদিয়াতে আর কোথাও তৈরি হয়েছিল কি না মনে নেই, তবে বহিরগাছিতে যতীনদার বাড়ির উঠানের ধর্মগোলা দেখা হয়েছিল।

প্রকৃষ্ট গণনাট্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের জোয়ার এসেছিল থার্ড থিয়েটারের জনপ্রিয়তার হাত ধরে। শুধুমাত্র কলকাতার কার্জন পার্ক অথবা থিয়োসফিক্যাল সোসায়টি হলে অভিনয় নয়,

গ্রামে-শহরেও লাগল জোয়ার। নদিয়া জেলায় সূচনা করলেন যতীন রায়, নমিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ নীরব সংগঠক, আমরা তরুণ নাট্যকর্মীরা তাদের অভিভাবকত্বে নদিয়ার নানাস্থানে শুরু করলাম থার্ড থিয়েটারের অভিযান। বহিরগাছি, রাণাঘাট, দত্তপুলিয়া, কৃষ্ণনগর সহ বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হতে থাকল তৃতীয় প্রথার জনমুখী নাটক। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ও গ্রামবাসীদের উদ্বুদ্ধ করতে বহিরগাছি স্কুল প্রাঙ্গণে প্রধান শিক্ষক শ্রী যতীন রায়ের আমন্ত্রণে বাদল সরকার এসেছিলেন তাঁর দল শতাব্দীর নাটক নিয়ে। রাণাঘাটে আমরা একটি দল তৈরি করেছিলামঃ 'কেভ'-রাণাঘাট পৌরসভার একটি হলে অভিনীত হয়েছিল 'দূরের রবীন্দ্রনাথ'। পরপর কয়েক মাসের চতুর্থ রবিবারের দুপুরে রাণাঘাটে একটি স্কুলমাঠে অভিনীত হয়েছিল 'শতাব্দী' সহ কলকাতার কয়েকটি দলের তৃতীয় প্রথার নাটক। কলকাতার সিন্ধুভবনে অজস্র সন্ধ্যায় অভিনীত হয়েছিল বাদল সরকারের নিজের দল শতাব্দী এবং কাঁচড়াপাড়ার পথসেনা সহ কেভ এর যৌথ প্রযোজনায় 'একটি হত্যার নাট্যকথা'। প্রায় সমসময়ে কৃষ্ণনগরেও তৈরি হয়েছিল তীরন্দাজ- মূলতঃ গল্পকার শান্তি নাথ ও প্রখ্যাত কবি মজনু মোস্তফার সৌজন্যে।

এই নীরব কর্মযোগীরই উদ্দীপনায় ১৯৯০ সালে নদিয়ার ভীমপুর (আসাননগর) এ শুরু হয়েছিল এপার বাংলার প্রথম লালন মেলা। তাঁর অনুরোধক্রমে মুখ্য পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ-কবি অন্নদাশঙ্কর রায়। কার্যকরী সভাপতি ছিলেন শ্রী যতীন রায়। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি কার্তিকের মাসে মাঠের কাঁচাধানেরও মায়া করেননি গ্রামবাসী, কেটে মঞ্চ তৈরির জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন এমনই প্রাণের এই মেলা। অপার বাংলার সাধক-বাউলেরা এবং লোকগীতির শিল্পীরা ছুটে আসতেন এই মেলায়। আর বাংলার বিভিন্ন গ্রাম-শহর ছাড়াও আশেপাশের সমস্ত এলাকা থেকে মানুষজন পরপর তিন রাত রাতভর মূল লালনমঞ্চ ছাড়াও একাধিক মঞ্চের সঙ্গীতানুষ্ঠানে মাতোয়ারা থাকতেন।

লোককবি বিজয় সরকারের জন্মশতবর্ষের সময়ে ২০০২ সালে কাঁকিনাড়ার কাছে কেউটিয়াতে বিজয় সরকার স্মারক সমিতির কার্যকরী সভাপতি ছিলেন শ্রী যতীন রায় (সভাপতি ছিলেন শ্রী পবিত্র সরকার, কবিপুত্র শ্রী কাজল অধিকারী পিতার নামাঙ্কিত পদাধিকারী থাকতে চান নি)। সেই স্মরণানুষ্ঠানে তিনি এখনো যুক্ত।

এক পর্যায়ে ভীমপুরের লালন মেলা বন্ধ হয়ে গেলে অসামান্য লোকসংস্কৃতির সংগঠক শ্রী যতীন রায় চুপ করে বসে থাকতে পারেন নি. তিনি ২০১২-তে নিজগ্রাম বহিরগাছিতেই শুরু করেন বিজয়-লালন মেলা। সেই মেলা ফি-বছর অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

প্রবাসে থাকার দরুণ ১৯৭৮ সালের বন্যার ভয়াবহতা বুঝতে পারিনি। কিন্তু ২০০০ সালে সারা বাংলা জুড়ে ভয়ানক প্লাবনের সময়ে যতীনদাকে দেখেছি আমাদের ত্রাণকার্যে অভিভাবকের মতই পরামর্শ দিতে, নানান সহায়তা দিতে,এমনকি যেদিনই ট্রেন চলেছে সেইদিনই তিনি ছুটে এসেছেন রানাঘাটে আমাদের কাছে। অসুস্থ শরীর নিয়েও কী যে উদ্দীপনায় বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি!

দীর্ঘদেহী, চাবুকের মত ছিপছিপে, ধুতি-পাঞ্জাবী (শীতে সোয়েটার-চাদর) পরিহিত সৌম্যদর্শন অথচ চারিত্রিক দার্ঢ্যে দৃপ্ত এই মানুষটির মুখের হাসি যে কোনো মানুষের কাছেই

দৃষ্টান্ত স্বরুপ। রানাঘাট-গেদে লাইনের নিতান্তই এক অকিঞ্চিৎকর জনপদ হাট-বহিরগাছি, সেই কয়লার এঞ্জিনে টানা কু-ঝিকঝিক রেলগাড়ীর সময় থেকে নেহাতই হল্ট। স্টেশন থেকে গেছিল এবং রেললাইন অরক্ষিত থাকার সুবাদে প্রায়শঃই দুর্ঘটনা ঘটত। একবার ট্রেনের তলায় চাপা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হলে এলাকার জনগণ মেনে নিতে পারেন নি এবং তারা তাদের "মাস্টারমশাই যতীনদার উপস্থিতিতে রেল রোকো পর্যন্ত করে ফেলে। জনবিরোধী প্রশাসনের পুতুল রেলপুলিশ নির্বিবাদী গ্রাম্য জনগণকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং যতীন রায় সহ আরো কিছু নেতৃস্থানীয়ের বিরুদ্ধে মামলা করে। দীর্ঘদিন সেই মামলা চলার পরে নিষ্পত্তি হয় এবং তাঁরা সসম্মানে অসত্য অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান।

যতীনদার গুণমুগ্ধ ছড়িয়ে আছেন পূর্ব-পশ্চিম জোড়া অপার বাংলায়। লালন-চর্চার শ্রীমুখ হিসেবে তাঁকে যেতে হয়েছে বাংলাদেশের সারস্বত সমাজে। ঢাকায় বাংলা একাডেমিতে তাঁকে সম্বর্জিত করা হয়েছে। আত্মপ্রচার বিমুখ এই মানুষটি নীরবে থাকতে চাইলেও তন্নিষ্ঠ গবেষক / সংগঠকবৃন্দ তাঁকে খুঁজে নিতে ব্যর্থ হননি। 'শঙ্খচিল' নামে একটি পত্রিকা তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে প্রকাশ করে আসছেন।

এমন একজন ধীমান ব্যক্তির নানা বিভঙ্গের কাজের পরিচিতি লেখা আমার মত অভাজনের পক্ষে যথেষ্টই ক্লেশকর, তবু চেষ্টা করলাম মাত্র। যতীনদা আরো আরো বহু বছর আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রশ্নাদিতে সাড়া দিন, অভিভাবক হয়ে থাকুন।

জীবন রায়: শ্রী যতীন রায়ের জীবন ও কর্ম

শ্রী যতীন রায়ের জীবন ও কর্ম, চিন্তা-চেতনার বর্ণনা করতে গিয়ে যে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, তা হলো যতীন বাবু একজন জ্ঞানতাপস, শিক্ষা অনুরাগী, লোক-সংস্কৃতি সংগঠক ও শিক্ষাবিদ। তিনি মনে প্রাণে একজন বাঙাল ও বাঙালী। গৃহ-সন্ন্যাসী এবং ভোগবাদ বিরোধী মানুষ। জন্ম অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার হাট গোপালপুরের কাছে রাধাকান্তপুর গ্রামে। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বহিরগাছি নামে যে গ্রামে বসবাস করেন তার থেকে বড়জোড় ৫০ মাইল দুরে। এখানেও ঐ একই ভাষা, একই আবাহওয়া, একই জীবন যাপন সংস্কৃতি, কিন্তু দেশ এখন আলাদা। দেশভাগের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তিনি কখনো মেনে নিতে পারেননি, তাই সে ক্ষত এখনো দগদগে তাঁর হৃদয়ে। তাঁর কাছে দেশ মানে শুধু মাটি নয়। দেশভাগের যন্ত্রণা তাঁর জীবনের কিছু উলটপালট করে দেয়। দেশভাগই তাঁর চিন্তা-চেতনায় আনে নতুন মোড়। সেখান থেকেই শুরু হয় নতুন বিকল্প পথের সন্ধান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই তিনি বুঝেছিলেন বাজার অর্থনীতি, বিলেতি একমূখী গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা শহরমুখী শিক্ষায় দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তি হবে না। সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন, দেশজ শিক্ষা ও স্বনির্ভর গ্রামীণ সমবায় সংগঠনের মধ্যেই কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মুক্তি আসতে পারে। দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত উদবাস্তু শরণার্থী মানুষেরও পুনর্বাসন হতে পারে। এজন্য তিনি শহুরে মেকি জীবনের প্রলোভনে পা না দিয়ে গ্রামের স্কুলের শিক্ষকতা ব্রতকেই বেছে নেন পেশা হিসেবে। সে লক্ষ্য থেকেই তাঁর অম্লান দত্ত, পান্নালাল

দাসগুপ্ত, গৌর কিশোর ঘোষ, শ্যামলী খাস্তগির সাথে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে, পরে টেগোর সোসাইটি, পরে ঊষা গ্রামসহ বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ের সাথে যুক্ত হন। এরপর তিনি নিজ গ্রামে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। পাঠাগার ও সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন করেন। গ্রাম সংগঠন কাজ করতে গিয়েই তিনি গ্রামীণ জীবন ও লোক সংস্কৃতির সাথে সক্রিয় ভাবে জড়িয়ে পড়েন। যতীন বাবু যে পল্লী অঞ্চলে সারা জীবন শিক্ষকতা ও গ্রামীণ সংগঠন করেছেন সেখানকার অধিকাংশ মানুষই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। ফলে তিনি বার বার ফিরে যান পূর্ববঙ্গের মাটির টানে, প্রাণের টানে। তিনি তাঁর স্বভূমি থেকে উৎপাটিত হলেও উৎস্য থেকে নিজেকে সংযোগ ছিন্ন করেননি। তার প্রতিষ্ঠিত "পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য লালন মেলা" তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমি যতীন বাবুকে প্রায় চল্লিশ বছর যাবত আমার বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে এখনো দেখছি তিনি তাঁর জীবন আদর্শ থেকে এক বিন্দু বিচ্যুত হননি। তিনি অতি বিনয়ী, সজ্জন, সদালাপী, কর্মবীর, সহজ সাধারণ জীবন যাপন করেন যা এখনকার সময়ে দুর্লভ।

তাঁর পড়াশুনা ও পাণ্ডিত্য যে কতটা গভীর সেটা বুঝতে হলে বেশ কিছুটা মেধা ও মনন থাকা দরকার। তিনি যেমন ধ্রুপদী সাহিত্য ও সঙ্গীতের বিদগ্ধ পাঠক শ্রোতা, একই সাথে লোক সংস্কৃতির সংগ্রাহক, সংগঠক এবং গবেষক। শিল্প, নাটক, সিনেমা চিত্রকলার প্রতিও যতীন বাবুর রয়েছে সুগভীর অনুরাগ। তাঁর সাথে আলোচনায় সবসময় বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিষয় উঠে আসে। চারিদিকে যখন ভোগবাদী সভ্যতা ও মানুষের সীমাহীন লোভ সবকিছু গ্রাস করছে, প্রকৃতি দূষণসহ নদী ভরাট চলছে, তখনও তিনি এবয়সেও নদী বাঁচাও পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন যুক্ত থাকছেন। তাঁর মত মানুষ এখনকার দিনে অতি বিরল। আমি তাঁর শতায়ু কামনা করি।

তপন বাগচী: যতীন্দ্রনাথ রায়: এক স্নিগ্ধ কালপুরুষ

যতীন্দ্রনাথ রায়কে প্রথম দেখার দিন থেকেই ভাল লেগেছে। তাঁর আচরণ ও কথা বলার ঢং শুরুতেই যে কেনো মানুষের সমীহ আদায় করে নিতে সক্ষম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সাম্মানিক স্নাতকোত্তর হয়েও তিনি গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নির্দিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেও তিনি হয়ে উঠেছিলেন অঞ্চলের শিক্ষক। শিক্ষক শব্দটি উচ্চারণ করলে যে সৌম্য চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যতীন্দ্রনাথ রায় তারই প্রতিরূপ। কেবল বিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকলেও তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধার ঘাটতি হতো না। কিন্তু তিনি যেন শিক্ষক হয়েও শিক্ষকের অধিক সামাজিক দায়পূরণের এক সিগ্ধ কালপুরুষ।

শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চায় তিনি আত্মনিবেদিত। যতীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার সূত্র হচ্ছেন বিজয় সরকার। পশ্চিমবঙ্গে বিজয়চর্চার ক্ষেত্রে বিজয়পুত্র কাজল অধিকারীর পরে যে নামটি সামনে আসবে তিনিই যতীন্দ্রনাথ রায়। প্রতিবছর কেউটিয়ায় যে বিজয়-জন্মোৎসব হয়ম তাঁর একজন কেন্দ্রীয় আয়োজক তিনি। বাংলাদশে থেকে গবেষক ও শিল্পীদের আমন্ত্রণ

করে নিয়ে যান। তিনি হয়ে ওঠেন সর্বমিলনের সেতুবন্ধ। বাংলাদেশের নড়াইলের ডুমদিয়ায় বিজয় সরকারের বাড়িতে যে বিজয়মেলায়, সেখানেও তিনি সভ্যাগত অতিথি। কাজল অধিকারী হয়তো পিতৃতর্পণ করার দায় আছে, যতীন্দ্রনাথ রায় আসেন কোন দায় পূরণে? তিনি আসেন কবিগান তথা বাংলার লোকসংগীতকে ভালবেসে। কাজল অধিকারীর তো বিজয়ের রক্তের উত্তরাধিকার, কিন্তু যতীন্দ্রনাথ রায় বহন করছেন আদর্শের উত্তরাধিকার। বিজয় সরকারের সংগীত সংরক্ষণ ও আদর্শ প্রচারে যতীন্দ্রনাথ রায় এক অক্লান্ত যোদ্ধা।

কেবল বিজয় সরকারকে নিয়ে তাঁর কাজের সীমারেখা টানা যাবে না। তিনি ১৯৯০ সালে নদিয়ায় 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালন মেলা কমিটি' প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখেন। এই কমিটির তিনি সভাপতি ও কার্যকরী সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে একে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার লালনকে নিয়ে যা করতে পারেনি, যতীন্দ্রনাথ রায় এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তা করে দেখালেন। তিনি 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি সংসদ'-এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবেই তৃণমূল পর্যযায়ে কাজ করে চলছেন। আমি মনে করি, লালন সাঁই, বিজয় সরকার ও সামগ্রিক লোকসংস্কৃতি নিয়ে তাঁর যে সাংগঠনিক কাজ, তার জন্য তিনি কেবল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নয়, সর্বভারতীয় পর্যায়ে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তিনি এসবের তোয়াক্কা না করেই নিরলস শ্রমে ও মেধায় লোকসংস্কৃতির সেবক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। সম্প্রদায়-সম্প্রীতিরক্ষায় তাঁর এই সংস্কৃতিযাত্রা, একথা সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে করি। তিনি সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে দুই দেশেই সমান পরিচিত।

লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেন। বিভিন্ন মেলা ও উৎসব উপলক্ষে তিনি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস নির্মাণে এই সব প্রকশনা হয়ে উঠবে মূল্যবান দলিল।

নীরবে তিনি এরকম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলছেন। তাঁকে সম্মান জানাতে পেলে আমি আনন্দিত। তিনি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে একটি লিটলম্যাগাজিনও প্রকাশ করেন। এরকম গুণী মানুষ আমাদের চারপাশে খুব কমই আছেন।

যতীন্দ্রনাথ রায়কে নিয়ে আমার একটি তাৎক্ষণিক ছড়ার্ঘ্য নিবেদন করতে চাই--- যতীন্দ্রনাথ রায়কে চিনি লালন-বিজয়চর্চায় বিষয়-লাভের খাত দেখি না তাঁর জীবনের কড়চায়। নেই তো কোনো লোভের জমিন দাগ-খতিয়ান-পর্চায়। একটি জীবন উড়িয়ে দিলেন দেশের কাজের খরচায়। আমার দু'হাত তাঁর জীবনের সুস্থ থাকার বর চায়।

যতীন্দ্রনাথ রায়কে আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁর সংস্কৃতিহিতৈষণাকে আমি যাপন করি। তাঁর মতো গুণীজনের সান্নিধ্যধন্য আমি গর্ব বোধ করি। কালপুরুষের মতো তিনি জেগে আছেন সংস্কৃতির জনপদে।

তরুণ রায়: আমাদের গ্রামের বৃহৎ পরিবারের পক্ষে শ্রদ্ধা

জ্যাঠামশায়কে বাড়িতে একরকম এবং স্কুলে আমাদের বিদ্যালয়ের পরিবেশে ভিন্ন মানুষ হিসাবে মনে হয়েছে, স্কুলে ভিতরে বাইরে ছোটাছুটি নেই ,সারা স্কুল যেন নিস্তব্ধ ,নিয়ম শৃঙ্খলার

পরিবেশ সবার প্রশংসা অর্জন করে। আরো পরবর্তীতে দেখেছি সকলেই প্রশংসা করেছেনন যেভাবে তিনি দিনরাত্রি স্কুল নিয়ে পরিশ্রম করেন। গরীব,অসহায় ছাত্রছাত্রীর পাশে দাঁড়ান ,সাহায্য করেন তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সব সময়েই সমাজ সেবামূলক কাজে ব্যস্ত থাকতেন সেই সঙ্গে বহু মানুষের উপস্থিতি স্কুলে এবং বাড়িতে যার ফলে সকলকে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা যোগাতেন। অসংখ্য বই এবং বই যেন নিত্যসঙ্গী এবং গভীর ভাবে পড়ায় মগ্ন থাকার দৃশ্য আমাদের অবাক করে অন্যরকম পরিবেশ তৈরী করতো। বাড়িতে বইয়ের লাইব্রেরি।। বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,চলচ্চিত্র প্রদর্শনী আয়োজনের করে সুস্থ পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। রাস্তাঘাট উন্নয়ন সিএডিপির বহু কাজই আমাদের বাড়িতে এবং এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অনেক সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি জ্যাঠামশায়ের সঙ্গী হয়েছি,অনুষ্ঠান উপভোগ করেছি এবং সম্বর্ধনায় প্রাপ্ত ফলক,মমেন্টো উত্তরীয় সব নিয়ে আসার দায়িত্ব বহন করেছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে, Ezcc তে জ্যাঠামশায়ের জীবনকৃতি সম্বর্ধনায়,বিজয় সরকারের অনুষ্ঠানে, মোহিত রায় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সঙ্গী হয়েছি। ভাষা শহিদ স্মারক সমিতির অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি। বাড়িতে বহু বিখ্যাত মানুষের উপস্থিতি উল্লেখ করার মতো। বহিরগাছি এলাকার শিক্ষা ,সংস্কৃতি, সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম কারিগর যতীন্দ্রনাথ রায়। বহু বিখ্যাত মানুষের উপস্থিতি আমাদের বাড়িতে এবং এলাকার ইতিহাসের অন্যতম উপাদান। বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্ত, মহাশ্বেতা দেবী,বাদল সরকারের মতো বিখ্যাত মানুষের উপস্থিতি স্মরণীয় ইতিহাস। আমাদের গ্রামের বৃহৎ পরিবারের পক্ষে শ্রদ্ধা জানাই।

দীনবন্ধু সরকার: পিতৃতুল্য মানুষ যতীন্দ্রনাথ রায়

যতীন্দ্রনাথ রায়ের সাথে আমার যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি। তখন থেকেই উনি আমাদের স্কুলে আসতেন প্রধান শিক্ষকের আহ্বানে। সামাজিক সংস্কার মূলক কাজে তিনি সবার আগে এগিয়ে থাকতেন। লোকসংস্কৃতি প্রসারের তিনি একজন একজন সংগঠক ছিলেন। তাঁর মতো এরকম ব্যক্তিত্ব আর দুটি দেখা যায় না। তিনি লোকসংস্কৃতি আত্মস্থ করেছেন, বা গান করেছেন, হাতে-কলমে দেখেছেন এরকম ব্যাপারটা নয়; তিনি লোকসংস্কৃতি চর্চাতে ছিলেন, এই জগতের মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। বিভিন্ন এলাকাতে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ একজন সংগঠক হিসেবে করে গেছেন এবং করে চলেছেন।

দুই বাংলায় তাঁর গভীর প্রভাব রয়েছে। যে মানুষেরা এই ক্ষেত্রে সম্পর্ক রাখেন যতীন বাবু তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি লোকসাহিত্য বা ধ্রুপদী সাহিত্য বা আধুনিক ধারনার সাথে তিনি সম্পৃক্ত ও ওতোপ্রতভাবে যুক্ত। তাঁর মতো এমন যোগাযোগ আর কারো আছে বলে আমার মনে হয় না। অনেক ব্যাপারেই আমার জীবনে তাঁর প্রভাব পড়েছে। তিনি একজন মৃদুভাষী মানুষ। এবং বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে এগিয়েছেন। ঘাত প্রতিঘাত অন্যায় অবিচার তাঁর বিরুদ্ধে কম হয়নি। তথাপি সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শত্রুকেও বন্ধু করেছেন তিনি। তাদের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করার যে গুণ দেখেছি , তা অস্বীকার করতে পারি না। মামজোয়ানে

আমরা শ্যামাচরণ শর্ম সরকারের দ্বিশত বর্ষ উদযাপন করেছিলাম। তিনি তাঁর সভাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ছাত্রদরদী শিক্ষক। স্কুলে যখন ঢুকতেন পুরো স্কুল শান্ত ও চুপচাপ হয়ে যেত। ৩০ বছর আগেও গার্জিয়ানকে বুঝিয়ে মেয়েদের বিয়ে আটকে দিয়েছিলেন পড়াশোনার স্বার্থে। 'কম্পাস' পত্রিকার সম্পাদক পান্নালাল দাশগুপ্তের কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। কৃষিক্ষেত্রে কীভাবে উন্নতি করা যায়, এই ব্যাপারে তিনি অনেক ভাবনাচিন্তা করতেন। ঊষাগ্রাম ট্রাস্ট এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। কমলাকান্ত দাস চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ সমাজসেবীদের সংস্পর্শে তিনি ছিলেন। তিনি ছিলেন রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের একজন সদস্য। তাঁরই উদ্যোগে গেদে লাইনে ইলেকট্রিফিকেশন সম্ভব হয়েছে। এক কথায় তিনি সামাজিক নিরীহ মিষ্টভাষী মানুষ। একাধারে সমাজদরদী ছাত্রদরদী সমাজ সংস্কারক ছিলেন। যে মানুষটি হারিয়ে গেলে মনে হবে পিতৃতুল্য মানুষকে হারালাম। সে ব্যথা আমাদের অনেক দিন থাকবে।

দেবদুলাল কুণ্ডু: দুই বাংলাকে সম্প্রীতির সূত্রে বেঁধেছেন তিনি

নদিয়ার সাহিত্যচর্চা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছেন যতীন্দ্রনাথ রায়। এমন কি দুই বাংলাকে সম্প্রীতির সূত্রে বেঁধেছেন তিনি। লালনকে নিয়েও তাঁর অনেক কাজ আছে। এই মানুষটার মূল্যায়ণ হওয়া দরকার। তাই বন্ধুবর সুজিতবাবুর এই প্রয়াসকে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ জানাই। এই সম্পাদনার কাজটি কঠিন হলেও আমার আমার বিশ্বাস তিনি সফল হবেন।

দেবাশিস বিশ্বাস(মুরারি): কিছু কথার আড়ালে যতীনবাবু

এপার ওপার করেন যিনি তিনি সাক্ষাৎ নাবিক। নাবিকের ধর্ম এপারের যাত্রী ও মালামাল ওপারে নেওয়া এবং ওপারের যাত্রী ও মালামাল এপারে নিয়ে আসা। তদ্রুপ যে সকল ব্যক্তিত্ব এক দেশের সহিত অন্য দেশের সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটান, শুধু মেলবন্ধনই করেন না মেলবন্ধনের সামগ্রীকে গবেষণালব্ধ বিষয় বানিয়ে দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য তাকে সৃষ্টিশীলতায় জীবন্ত রূপ দেন। সেই অর্থে যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সপ্তসিন্ধু দশদিগন্তের নাবিকের মতো এপার বঙ্গ ও ওপার বঙ্গের মধ্যে লোকসাহিত্যের নানান ধারার যে মেলবন্ধন নিরন্তর করে চলেছেন সে অর্থে তিনি একজন লোকসংস্কৃতির নাবিক। মহাকবি মধুসূদন যেমন প্রাচ্যের রাজকুমারীর বরমাল্য পাশ্চাত্যের রাজকুমারের গলায় পরিয়ে দিয়ে ছিলেন; যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় তদ্রুপ দুই বঙ্গের উদীয়মান যুবক যুবতীদের মনে লোকসংস্কৃতির ফুলমালা নিরন্তর পরাচ্ছেন।

বর্তমান যুগকে ডিজিটাল যুগ বলা হয়। বিদ্রোহীকবি কাজি নজরুলের সেই ভাবনাই যেন আজ অতি বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে,-"বিশ্বটাকে দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে"। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মানুষ সবাই গায়ক নায়ক; এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ। কে কী করছে না করছে কারও দেখার অবকাশ নেই। সে ক্ষেত্রে পরিশিলিত সাহিত্যের চর্চার অবকাশ নেই মানুষের। সেখানে লোকসাহিত্যের কথা ভাবাই যায় না। লোকসাহিত্য আজ বড়ো অবাঞ্ছিত, বড়ো ব্রাত্য, বড়ো বেশি অবহেলিত। এইরূপ সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যতীন্দ্রনাথ

রায় মহাশয় নিরন্তর সাধনায় রত। লোকসাহিত্যের একদম মূল শিকড় থেকে ধরে ধরে,তিনি টান দিয়েই চলেছেন। অষ্টক বালাকী বোলান শ্লোক,আউল বাউল জারি সারি ভাটিয়ালি পল্লিগীতি লোকগীতি লালনগীতি বিজয়গীতি হ্যাঁচড়া ভিটেকুমারী ধূয়োকবি বোলবোলে মানিকপীর গাজী বিয়ের গান;প্রভৃতি লোকগান নিয়ে এখনও সমান ভাবে তিনি কাজ করে চলেছেন।

নদিয়ার ভীমপুর আসাননগরের রাজ্য লালনমেলার নাম কে না জানে; কে না চেনে? একদম মেলার শুরু থেকে আজ অবধি যতীন বাবু মেলার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করে আছেন। বলতে গেলে লালনমেলার বর্তমান যে শ্রীবৃদ্ধি তার বেশিরভাগটাই যতীনবাবুর মস্তিষ্কপ্রসূত। আমি তখন খুবই ছোটো। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বাউল মনটা বাউলের সান্নিধ্য যেতে চাই। সেই সূত্রে লালনমেলায় ছুটে গেলাম। বন্ধুবর অনুপ কুমার ঘোষ মহাশয়ের (গীতিকার) কল্যাণে যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সাথে আমার পরিচয়। পরনে শ্বেতশুভ্র ধুতি পাঞ্জাবির উপর শাল কাঁধে,সুন্দর কান্তি দীর্ঘাঙ্গী মানুষটাকে দেখেই আমার ভালো লাগল;আমি তাঁকে কাকা সম্বোধনে প্রণাম করলাম। আস্তে আস্তে লালনমেলার সকল গুণীজনদের সাথে আমার পরিচয় হল। দেখলাম অত বড়ো লালনমেলা কমিটির সকল সদস্য,যতীন বাবুর কথা একবাক্যে স্বীকার করে নেন।

লালন মেলায় লালনচর্চার যে ঐতিহ্য তিনি খুলে দিয়েছেন আপামর বাঙালি জনসমাজের কাছে তা সত্যই এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। লালনচর্চার মধ্যে দিয়ে মানুষ জাতপাত ভুলে প্রকৃত সহজ মানুষের সন্ধান করে। সাঁই বা অচিন পাখি এই মানুষের দেহের মধ্যেই বাস করেন। এই সাধনায় আজ ভীমপুর আসাননগর কদমখালি রাজ্য লালনমেলার মধ্য দিয়ে যতীনবাবু তুলে ধরেছেন। স্বপনবাবুর লেখা লালনের সাঁইজী গ্রন্থে,একটা সুন্দর ছন্দ বদ্ধ কথা দেখতে পাই;

"আই কে যাবি গৌর প্রেমের হাটে,
ধাক্কায় যেন যাসনে চটে ফোটে,
প্রেম যমুনার তুফান ভারী,
ধাক্কা লাগে ব্রহ্মপুরী
ধর্মগুণে কর্ম তরী কারও কারও ভেসে ওঠে"

এই অসাধারণ উক্তি যেমন স্বপন বাবুকে অমর করেছে তদ্রূপ যতীনবাবু স্বপনবাবুদের মতো মনীষীদের সাথে সঙ্গ দিয়ে "দেহের মাঝে বাগান আছে,

সেই বাগানে ফুল ফুটেছে;-এই যে অসাধারণ দেহতত্ত্বের সন্ধান সহ লালনমেলাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন;তা এক কথায় অনবদ্য। শুধু লালনমেলায় নয়, যতীনবাবু তাঁর নিজ গ্রামে বিজয় এবং লালন মেলাও করে থাকেন। সেখানেও তাঁর সেই একই ভাবমূর্তি।

"সহজ মানুষ ভজ না রে মন দিব্য জ্ঞানে"।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যতীনবাবুর এই সাধনা একদিন তাঁকে অমর করবেই এবং তিনি হবেন আমাদের বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির আইকন। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিনম্র চিত্তে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করি। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে যতীনবাবু অমর থেকে অমর হোক।

নিতাইচন্দ্র বিশ্বাসঃ স্বয়ং এক আলোকবর্তিকা

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায় সম্পর্কে মূল্যায়ন করার মতো ধৃষ্টতা বা দুঃসাহস ও জ্ঞান-গরিমা সত্যি আমার নেই। তবুও আপনার অনুরোধে শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায় সম্পর্কে বলার এই যে, উঁনি যেন স্বয়ং এক আলোকবর্তিকা—জ্যোতির্ময় প্রভা! অপরিমেয় উঁনার জ্ঞানের গভীরতা। শিক্ষাজগতের দিকপাল পণ্ডিত বলতে যা বোঝায়,উঁনি সত্যি তাই। সাহিত্য-কলা-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের ও লোকশিল্প,সমাজ-সংস্কৃতি,মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধের এক জীবন্ত কিংবদন্তী হলেন শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায়। আর আচার-আচরণে ও মানবিক গুণে উঁনি হলেন সভ্যতা ও ভব্যতার প্রতিমূর্তি—যেন এক সহনশীল ও স্নেহ-প্রবণ প্রকৃতি,যেখানে এসে এক হয়ে গেছে ছাত্র-শিক্ষক ও স্নেহশীল পিতার ভাবমূর্তি। শুভকামনা।

নিতাইপদ সরকার: মাস্টারমশাইকে যেমন দেখেছি

শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই যতীন্দ্রনাথ রায়। নদিয়া জেলার বহিরগাছি গ্রামে বাস। মধ্যবিত্ত সচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কিছুর অভাব ছিল না। কিন্তু যেখানে বাড়ি ছিল সেখান থেকে স্কুল কলেজে যেতে গেলে চার পাঁচ কিলোমিটার দূরে আড়ংঘাটা রেলস্টেশনের মাধ্যমেই যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই স্টেশনে পৌঁছাতে গেলে যে চার পাঁচ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হত সেটা হয় অত্যন্ত কর্দমাক্ত মেঠোপথ অথবা রেললাইন ধরে যেতে হত। যাতায়াতের এই নরকযন্ত্রণা ভোগ করে স্কুল কলেজ পেরিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সগৌরবে ইতিহাসে এমএ পাস করেন। ইতিমধ্যে কয়েকটা গ্রামের মানুষের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল বহিরগাছি হাইস্কুল। সেই স্কুলেই প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হন মাস্টারমশাই। এই যাতায়াতের সমস্যা সমাধানের জন্য মাস্টারমশায়ের নেতৃত্বে বহিরগাছিতে রেলস্টেশন করার এক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের সুবাদে বহিরগাছি রেলস্টেশন স্থাপিত হয়। সেই থেকে কয়েকটি গ্রামের যাতায়াতের ব্যবস্থা সুগম হয়। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথেও তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন। যেমন আড়ংঘাটার নিতাইপদ সরকার ও মাস্টারমশাই এই দুজনের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে পাঁচবেড়িয়া হাইস্কুল। এই স্কুলেই মাস্টারমশায়ের সমসাথী নিতাইপদ সরকারই প্রধান শিক্ষকের পদটি অলংকৃত করেন। এই বহুগুণ সম্পন্ন মানুষটিকে দীর্ঘদিন যাবৎ চিনি বা দেখে আসছি। ধুতি ও খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে কাঁধে একটা সাইড ব্যাগ ঝুলিয়ে যে কোনো সভাসমিতি বা কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নির্দ্বিধায় উপস্থিত হয়ে যান। এই আধুনিক যুগে ব্যতিক্রমী পোশাকে মানুষটির কাঁধে ঝোলানো ঝোলায় লুকানো আছে সংস্কৃতির মূল শেকড়। যার ফলে আসাননগর ভীমপুরে গুটিকয়েক লালনপাগলদের নিয়ে শুরু করেছিলেন লালনমেলা। সেই লালনমেলা ক্রমে বিস্তার হতে হতে আজ আন্তর্জাতিক মেলা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এরকম অসংখ্য মেলা আছে যার অধিকাংশের সাথে এই মাস্টারমশায়ের যোগ আছে। এই যেমনটা লোককবি বিজয় সরকার মহাশয়ের জন্মোৎসব দীর্ঘদিন যাবৎ যারা করে আসছিলেন তাঁরা কবির কাব্যগীতির বিশ্লেষণ বা তার দর্শনটা ঠিকমতো তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। তখন কবি

পুত্র কাজল অধিকারী জহুরীর জহর চেনার মতো মাস্টারমশাই যতীন্দ্রনাথ রায়কে সভাপতির আসনে বসিয়ে সত্যিকারের কিছু বিজয় অনুরাগীদের সঙ্গে নিয়ে মেলার মাধ্যমে এপার ওপার দুই বাংলার বিশিষ্টজনদের মিলন ঘটান ও কবি সাহিত্যিক ও গবেষকদের আনাগোনা হতে থাকে। বর্তমানে এই মেলা আন্তর্জাতিক মেলার রূপ নিয়েছে। কবিপুত্র মাস্টারমশাইকে সঙ্গে নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে লোককবি বিজয় সরকারের কবিত্ব সত্তার আলোচনায় মহাশ্বেতা দেবীকে সন্তুষ্ট করে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমিতে কবি বিজয় সরকারের নামাঙ্কিত অনুষ্ঠান করার আবেদন রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী সেই আবেদনে সায় দেন। সেই অনুষ্ঠানে এপার ওপার দুই বাংলার বিদগ্ধ জনেদের আলোচনায় মহাশ্বেতা দেবী আপ্লুত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি থেকে লোককবি বিজয় সরকারের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি রচনা করেন ডঃ রতন নন্দী।

জীবনে বহু মানব দেউলে দীপ জ্বেলেছেন তিনি। কিন্তু এই উদাসমনা মানুষটি নিজ দেউলে দীপ জ্বালাতে ভুলেছিলেন। জানলাম, এক বিশিষ্ট গবেষক ভদ্রলোক ডক্টর সুজিতকুমার বিশ্বাস সেই না জ্বালা দীপ জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। শুভকামনা জানাই ডক্টর বিশ্বাসকে। সেই সাথে ডক্টর বিশ্বাসকে বলতে চাই এই না জ্বালা দ্বীপ জ্বালিয়ে আপনি যেমন ধন্য হবেন, আমরাও তেমনই ধন্য হব।

নিরঞ্জন অধিকারী: শুভৈষণা

শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায় কেবল বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি সংগঠকই নন। তিনি সমাজ সংস্কৃতি শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে আত্মনিবেদিত। তিনি খ্যাতিমান কবিয়াল বিজয় সরকারের প্রতি বছরের জন্মোৎসবেও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

এ সবকে ছাপিয়ে ওঠে যতীনদার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। তিনি আমার আত্মীয় হয়ে উঠেছেন। বাংলাদেশে এসে তিনি আমার সঙ্গে যদি দেখা নাও করতে পারেন, তবু দুরালাপনীতে শুভেচ্ছা জানান। তাঁর উদ্যোগে আমি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নানা অনুষ্ঠানে যোগদানের সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

প্রাবন্ধিক গবেষক পত্রিকার সম্পাদক লোকসংস্কৃতিবিদ মানবদরদী যতীনদার জয়রথ এগিয়ে চলুক। জয়তু যতীনদা। জয়তু মানবতা।

নিশিকান্ত বিশ্বাস: তাঁর জীবন শরতের শিউলির মতো সুন্দর আর সার্থক

বুদ্ধিমত্তা জ্ঞানদীপ্ত প্রতিভায় যাকে আমরা সমাজ উন্নয়নের মোড়কে আবদ্ধ করে রেখেছি, যার কীর্তিকথা যতটুকু জেনেছি, দেখেছি তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ধারাবাহিকতা, চলা বলার ছন্দ, রচনা সাহিত্য দর্শন সামাজিক ক্রিয়াকর্ম যেমন কৃষিকাজের উন্নতির জন্য যিনি যাদের সহায়তার হাত বাড়িয়েছিলেন একদিন শ্রদ্ধেয় পান্নালাল দাশগুপ্তের এলাকার সাধারণ মানুষেরও সর্বত্যাগী জ্ঞানদীপ্ত বয়বৃদ্ধ তাপস শ্রদ্ধেয় চন্দ্রকান্ত বসু মহাশয়ের (বোস মশাই) ঐকান্তিক নিরলস সাধনা ও ধারাবাহিক চিন্তা চেতনায় গ্রামে গ্রামে 'ধর্ম গোলা' স্থাপন ব্যবস্থাপনা, তাঁতশিল্প

সৃষ্টির সাথে সাথে কতিপয় লোকের কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা দানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোটাকে মজবুত করা, পাশাপাশি পুতুল নাচের পিছিয়ে পড়া নাট্যকাহিনীকে এগিয়ে আনবার যিনি প্রচেষ্টা করেছিলেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখেছি যার সম্পাদনায় গবেষণামূলক 'শঙ্খচিল' যুগোপযোগী সাহিত্য পত্রিকা, ভাবাদর্শ ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তনে আজও সমাদৃত, শ্রীশ্রী ঠাকুর হরিচাঁদ গুরুচাঁদ প্রবর্তিত মতুয়া ধর্মের চিন্তা চেতনাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য 'জয় হরিবল' ধ্বনির মাহাত্ম্যকে দিকে দিকে তুলে ধরা, শ্রীচৈতন্যদেবের সহজ সরল মহানামের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় যাকে দেখেছি, রেলযাত্রীদের যাতায়াতের কথা ভেবে রেলস্টেশন যেমন বহিরগাছি শান্তিনগর ময়ূরহাট তারকনগর প্রভৃতি হল্ট রেলস্টেশনের জন্য একদিন যার নিরলস চেষ্টা করতে যাকে দেখেছি, বাউলের সেই একতারা স্পর্শ করেছে মানব মনের গহীন তলদেশ, তারও পৃষ্ঠপোষকতায় জীবনের বহু মূল্যবান সময় ব্যয় করে নদিয়া জেলার ভীমপুর আসাননগরের লালন মেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য যিনি আধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী মরমী কবি তাঁর প্রতিভা বলে 'পোষা পাখি উড়ে গেল সজনী, একদিন ভাবি নাই মনে-------। এই চারণ কবি বিজয় সরকার, যিনি এপার বাংলা ওপার বাংলার কবিগানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তারও খ্যাতি ও মহিমান্বিত গৌরব বিজড়িত মুহূর্ত গুলি দ্বারা যিনি মুহুর্মুহ আলোড়িত হয়েছেন,

এছাড়াও লালন ও সুবল মেলারও যিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, এপার বাংলা ওপার বাংলায় সাহিত্য দর্শন বাউল মতুয়া লোকসংস্কৃতি ও মানবসম্পদ প্রভৃতির উন্নয়নে যিনি সেতু নির্মাণ করেছেন বা আদর্শ স্থাপন করেছেন, অপরদিকে অন্নদাশঙ্কর রায় অম্লান দত্ত পান্নালাল দাশগুপ্ত প্রভৃতি মনীষীদের সান্নিধ্য লাভ যিনি করেছেন, তিনি আর কেউ নন; তিনি আমাদের সকলের প্রিয় সকলেরই পরিচিত একটি নাম যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়, প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক বহিরগাছি হাইস্কুল। তাঁর জীবন শরতের শিউলির মতো সুন্দর আর সার্থক হোক কামনা করি।

নীতীশ বিশ্বাস: যতীন্দ্র নাথ রায়ঃ অনন্য এক লোক সংস্কৃতির সেবক ও উজ্জ্বল শিক্ষক

শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ রায়, আমার চোখে একজন আদর্শ শিক্ষক আর লোকসংস্কৃতির যথার্থ অনুরাগী এক অনন্য সাধারণ দক্ষ সংগঠক। আমি সামান্য একজন সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে এ কথাটা বুঝি যে গ্রামীণ শিল্প ও শিল্পীদের সমাজের সামনে তুলে আনার কাজ কতো কঠিন। এ যেনো অতল-খনি গহ্বর থেকে সোনা-হীরে তুলে আনার মতো কঠিন কাজ। এই ভাবে তিনি সংস্কৃতির মহান সমাজ- বিজ্ঞানীর ভূমিকা সারা জীবন ধরে করে চলেছেন। যা তাকে করে তুলেছে আমাদের উদার সংস্কৃতির এক নিবেদিত সেনাপতি।

আমার চোখে তিনি উজ্জ্বল ভাবে উঠে আসেন আমাদের লোকসংস্কৃতির এক প্রতীকী পতাকা লোক কবি রত্ন বিজয় সরকারের জন্ম দিনের নানা উদযাপনে। দুই বাংলা তথা আন্তর্জাতিক ভাবেবিশালাকারের এ সাংস্কৃতিক মহোৎসবের আয়োজনের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে আছে তার নিপূন দক্ষতা। এই নিবেদনে বিজয় সরকারের সুপুত্র কাজল দার বিশেষ ভূমিকা থাকলেও যতীন দাও ছিলেন সে সমিতির সভাপতি। এ প্রসঙ্গে কাজল অধিকারী নিজেই বলেছেন, "বিজয় জন্মোৎসবেও দীর্ঘদিন যুক্ত এবং ভূমিকা পালন করেছেন এবং বিশেষ করে জন্মশতবার্ষিকী

উদ্যাপনে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং বাংলাদেশে গিয়ে.. মহসিন হোসাইন, খোন্দকার রিয়াজুল হক, নিরঞ্জন অধিকারী, কুরকীর্তন দাস, মীনা বড়ুয়া এঁদেরকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত করার ক্ষেত্রে এবং কার্যকরী সভাপতি হিসাবে গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে ফিরদৌসি রহমান, নাসিদ কামাল, নাদিরা বেগম, রওশান আলি, সইফুল ইসলাম ও আসাম ও ত্রিপুরার শিল্পীদের এবং মাননীয় মন্ত্রী অনিল সরকার ও সুভাষ চক্রবর্তী সকলের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়।

আমরা বিজয় সরকারের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানকে বৃহদার করতে তৎকালীণ ক্রীড়া ও পরিবহণ মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় সুভাষ চক্রবর্তীর সহায়তার জন্য তার বাড়িতে যেদিন যাই সেদিনও নেতা হিসেবে ছিলেন কাজল দা ও যতীন দা। শধু তাই নয় সারা দেশে লালনচর্চা থেকে লোকসংস্কৃতি, মাতৃভাষাচর্চা-- সর্বত্র তার শিক্ষক সুলভ দায়িত্ব পালনের ক্ষত্রে তিনি আমাদের অনেকের চোখেই হয়ে উঠেছেন অনন্য এক মানবিক সংস্কৃতি চর্চার সেনাপতি।

বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি সংগঠক নদিয়ার বহিরগাছির যতীন্দ্রনাথ রায়ের পিতা কুরলাল রায়, মাতা তুলিরাণী রায়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স ও এম. এ. পাশ করেন। তবে ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। নদিয়া জেলার ভীমপুর আসাননগরে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালন মেলা সমিতি। শ্রীরায় ছিলেন প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। মেলার সম্প্রসারণে ও উন্নয়নে সভাপতি হিসাবে ১৯৯০ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছেন এবং মেলার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে - সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবতার বাণী পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জীবিকার ক্ষেত্রে তিনি ১৯৫৬ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত বহিরগাছি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু এই দীর্ঘ কাল শিক্ষকতায় অর্জিত অগণিত গুণমুগ্ধ ছাত্রদের পাশাপাশি সংস্কৃতির ক্ষত্রেও তার অজস্র অনুরাগী ও অনুগামীরা ছড়িয়ে আছেন দুই বাংলার বিচিত্র প্রাঙ্গণে।

আমাদের কয়েকটি কাজ তিনি খুব লক্ষ করে দেখেছেন এবং আমাকে তার গুণ মুগ্ধদের মধ্য গ্রহণ করে নিয়েছেন; সে গুলি হল;

১। ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিজয় সরকার জন্মশতবর্ষ পালনের বিশাল আয়োজনে কবি মন্ত্রী অনিল সরকার ও সুভাষ চক্রবর্তীর সহযোগী হিসেবে সাধ্যমতো কাজ করার সময়।

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আম্বেদকর শত বর্ষ পালনের মতো অনন্য সাধারণ কাজ করার জন্য। যারও মধ্যে সারা দেশে বিশেষ করে ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব প্রথম এই আয়োজন তিনি খুবই প্রশংসা করেছিলেন।

৩। ১৯০৯ সালে ২০০৯ সালে আয়োজিত গঙ্গা-গোমতী-বরাক-ব্রহ্মপুত্র মাতৃভাষা ও মৈত্রী উৎসব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে। উপচে-পড়া শ্রোতাদের উপস্থিতিতে ধন্য ও অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় আসামের বিহু, ত্রিপুরার হজাগিরি, মনিপুরী মার্শাল আর্ট, বাংলার বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, লালন, বিজয় ও মতুয়া সঙ্গীত, হাজন রাজার গান থেকে পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ। ব্যক্তি প্রতিভার নিবেদন হিসেবে ছিল, নৃত্যে

অধ্যাপিকা অমিতা দত্ত, সাধনা রিয়াং, মোম গাঙ্গুলি, মন্দিরা ভট্টাচার্য। সংগীতে রাজা হাসান, জিনা রাজকমারী গোস্বামী, তাপসী রায়চৌধুরী, পুষ্পিতা চক্রবর্তী, শিখা মান্ডী, কামাল নাসের, তুলিকা ও গঙ্গাধর মন্ডল, প্রানেশ সোম, সঙ্গীতা রায়, সনাতন হাজরা, রীতা সাহা, উত্তম সাহা, পারভিন সুলতানা, নিলীমা বিশ্বাস, রত্না বসু, আবৃত্তিতে রোকেয়া রায় এবং প্রবীন চংপ্রেণ- শিল্পী সদাগর দেব বর্মণ। সেদিন সম্প্রীতি-আলোচনা-চক্রে অংশ নেন পশ্চিমবঙ্গের প্রগতি-সংস্কৃতির অন্যতম মুখ্য পৃষ্ঠপোষক মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী ও রমলা চক্রবর্তী, উপাচার্য সুরঞ্জন দাস (ক,বি), অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য, (উপাচার্য, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক করুণাসিন্ধু দাস, (উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক বাসুদেব বর্মন, আয়োজক সমিতির সভাপতি শ্রী নীতীশ বিশ্বাস, সম্পাদক সাহিত্যিক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর ও মুখ্য-সংগঠক কবি-মন্ত্রী অনিল সরকার। আমাদের অনেকেরই জীবনের সে এক বিরল অভিজ্ঞতা। এই শিল্পী সংযোগ আর মহান আয়োজনের পেছনে ছিলেন কাজল দা যতীন দার মতো সাংস্কৃতিক নানা মহাংররিদয় মানুষের অকৃত্তিম সংযোগ।

৪। তার মানবিক ও উদার দৃষ্টি ভঙ্গির সমর্থন আমি পেয়েছিলাম দলিত সাহিত্য চর্চায় এক উদার দৃষ্টির সিদ্ধান্তকে। যেখানে কেবল “নিম্ন বর্ণে জন্মালেই দলিত সাহিত্যিক হবে ‘র মতো তত্ত্বের যান্ত্রিক সমর্থন ছিল না।

৫। ভারতের মতো দেশে মাতৃভাষার অধিকারের পক্ষে ভাষা গণতন্ত্র বিষয়টি আমরা যে তুলেছি তার প্রতি ছিল তার স্নেহের আশীর্বাদ। তিনি এর পেছনে সারা দেশের বাঙালি উদ্বাস্তুদের মাতৃভাষা হরণ করে নেবার বিষয় টি তার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে গভীর ভাবে বুঝেছিলেন।

আমি সারা দেশে আমার অনেক শিক্ষক ও অগ্রজের স্নেহ ও আশীর্বাদ পেয়েছি কিন্তু তিনি যত গভীর ভাবে এইসব কাজের নিহিত সত্য হৃদয়াঙ্গম করেছেন, তা বিরল। আর এ জন্য তার আন্তরিক প্রশ্রয় দিয়েছেন ,তা অনন্যসাধারণ। একটু অন্তরালে থেকেই এভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর হৃদয়ের উদারতা। মহান শিক্ষকের মতো সামান্য কাজের মধ্যে সম্ভাব্য অসাধারণত্ব আবিস্কারের ক্ষমতা তাঁর আছে। আমি আমার এই মহান অগ্রজের প্রতি জানাই আমার আনত শ্রদ্ধা।

নীলাদ্রিশেখর সরকার: যতীনবাবু শতায়ু হোন

প্রায় এক দশক আগের কথা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোর বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে হাজির হতে বনগাঁ ইমিগ্রেশন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে। আমার পিছনে এক প্রৌঢ়। ছিপছিপে গড়ন। একহাতে ছোটো লাগেজ কাঁধে একটা ঝোলা। আদ্যপান্ত এক সাহিত্যের ফেরিওয়ালা। দুজনের ইমিগ্রেশন কাজ শেষ হলে পরিচয় পর্ব। আমার নিবাস বেথুয়াডহরি জানতেই - তুমি নীলাদ্রি! ততক্ষণে জেনে গেছি তিনি ‘শঙ্খচিল’ পত্রিকার সম্পাদক তথা ভীমপুর লালনমেলা কমিটির অন্যতম সভাপতি মাননীয় যতীন্দ্রনাথ রায়, দুই বঙ্গের সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি আন্দোলনের সকলের পরিচিত মুখ যতীনবাবু।

এই কথার অবতারণা এ কারণে, বিশিষ্ট সাহিত্য গবেষক ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস আমাকে যতীনবাবু সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'চার কথা লিখতে বলেছেন। সম্প্রতি কলকাতা বইমেলায়

প্রকাশিত হবে তাঁরই সম্পাদনায় "বাংলার লোকঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী যতীন্দ্রনাথ রায়" শীর্ষক যতীন বাবুকে নিয়ে আলোচ্য গ্রন্থখানি।

যতীনবাবুর সাথে যতবার দেখা হয়েছে ততোধিক বাক্যালাপ টেলিফোন বা মোবাইলে। মূলত শঙ্খচিলের লেখা আর লালনমেলার আমন্ত্রণ, আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক ফোকলোর সম্মেলনে তিনদিন তাঁকে কাছ থেকে দেখে যা মনে হয়েছে- একজন নির্ভেজাল, সৎ, পরোপকারী মানুষ। যে কোনো সংগঠনের পাশে দাঁড়াতে তিনি এক পায়ে রাজি। আমন্ত্রিত হয়ে বসে, খেয়ে, সেশন করে চলে আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি যে অনেকের চেয়ে ভিন্ন, তাই সংগঠকদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে করে গেলেন সাংগঠনিক ক্রিয়াকর্ম।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ভীমপুর আসাননগরে যে পশ্চিমবঙ্গ লালনমেলা কমিটি গঠন হয় তিনি ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। পরবর্তীতে সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে এই লালন মেলাকে জেলা থেকে রাজ্য এমনকি বহির্বঙ্গ ও বিদেশেও ছড়িয়ে দিয়েছেন, পেয়েছেন মেলার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। টেলিযোগে কথোপকথনের সময় তাঁর মুখনিঃসৃত একটি বাক্য আজ ভীষণ মনে পড়ছে- "যদি বর্ডারে যাতায়াতের কোনো অসুবিধা না থাকতো তাহলে আমাদের মেলায় বাংলাদেশ থেকেই শুধু কয়েক লক্ষ লালন ভক্তের আগমন হত"। তাঁর সাথে আলোচনা হত মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকা ‘অচিনপাখি’ নিয়েও। হয়ত যতীনবাবুদের লোকসংস্কৃতি চর্চার হাত ধরেই নদিয়া তথা বিভিন্ন জেলায় পরবর্তীতে অনেক লোকসংস্কৃতি চর্চা ও লোকসংস্কৃতি মেলা শুরু হয়েছে।

প্রায় ৯০ এর ঘরে পৌঁছেও শুধুমাত্র লালন নয়, গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক মূল চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারে তিনি আজও একই ভূমিকায়। বিভিন্ন কবিয়াল সংগঠনের সাথে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। লোকসংস্কৃতির সমস্ত উপকরণ, উপাদানকে সংরক্ষণ করা নিয়ে তাঁর চিন্তার শেষ নেই।

আর মাত্র একটি দশক অতিক্রম করলেই তিনি শতায়ু লাভ করবেন। আমরা যারা তাঁর অনুজ সাহিত্যসেবক, তারা সবাই সেই পথেই চেয়ে থাকব। যতীনবাবু আবার শ্রদ্ধা জানুন, ভালো থাকুন, শতায়ু হোন।

নূরে আলম ফকির : আমি তাকে কাকু বলে ডাকি

ভীমপুর কদমখালি লালনতীর্থ লালন মেলায় অনেকদিন যাবত আমার যাওয়া আসা। একজন ফকির শিল্পী হিসাবে প্রথম যে মানুষটির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। যতীন্দ্রনাথ রায় (মাস্টার মশাই)। তিনি পশ্চিমবঙ্গ লালন মেলার সেক্রেটারি ছিলেন তখন। সংসারের মোহ মায়া ত্যাগ করে আধ্যাত্ম চেতনায় নিজেকে বিলীন করেছেন। আমি দেখেছি জীবনের বেশিরভাগ সময় বাউল ফকিরদের মাঝে কাটিয়েছেন। বিভিন্ন আখড়া আশ্রমে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। এমনকি, আমার গোড়ভাঙ্গা গ্রামে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে ভাব বিনিময় হয়েছে। আমি নাকি তাঁর স্নেহধন্য নূর ফকির। তাঁর সাথে আমার আজও ফোনে কথা হয়। আমি তাকে কাকু বলে ডাকি।

পরিমল রায়: আমি বহুদিন যতীন্দ্রনাথ রায়ের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলাম

যতীন্দ্রনাথ রায় বহিরগাছি অঞ্চলের সবচেয়ে আলোকিত বহুমুখী প্রতিভার প্রচার বিমুখ একটি নাম। বহিরগাছি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন এলাকার উন্নয়নে স্বনামধন্য পান্নালাল দাশগুপ্তের ভাবশিষ্য হিসাবে সিএডিপি ধর্মগোলা, খাল সংস্কার, নদী সংস্কার এসব তাঁর অবদান। ভোগবাদী সভ্যতার বিপরীতে এক বিকল্প সভ্যতার সন্ধান পান্নালাল দাশগুপ্তই দিয়েছিলেন। জীবনভর তিনি সেই পথেরই পথিক হয়ে রইলেন। তিনি বহু পরিশ্রমে আজকের বহিরগাছি রেল স্টেশনের এই রূপ দান করেছেন। সাহিত্য সংস্কৃতির তিনিই পুরোধা। নাটকে বাদল সরকারকে বহিরগাছিতে একাধিক বার তিনি এনেছেন। সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী বহিরগাছিতে আসলেন, থাকলেন, উপন্যাস লিখলেন। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন গুণীজনের সান্নিধ্যে সমৃদ্ধ ছিল। গৌরকিশোর ঘোষ সমরেশ মজুমদার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সুধীর চক্রবর্তী কাজী সব্যসাচী এদের নিবিড় সান্নিধ্য তিনি পেয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবী তাকে নিজের ভাই হিসেবে স্নেহ করতেন। আমি একবার বালিগঞ্জে মহাশ্বেতা দেবীর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দুপুরের খাবার খেয়েছিলাম মনে পড়ে।

লোকসংস্কৃতি গবেষক বাংলাদেশের আবুল আহসান চৌধুরি শক্তিনাথ ঝাঁ এরা যতীন্দ্রনাথ রায়ের খুবই গুণমুগ্ধ। বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে বহুবার তিনি বাংলাদেশ সফর করেছেন। সে দেশের বিখ্যাত কবি শামসুর রহমানের বাড়িতে গিয়েছেন তিনি। বিখ্যাত লোককবি বিজয় সরকারের সঙ্গে তাঁর ছিল খুব ভালো সম্পর্ক। তাঁর সুযোগ্য পুত্র কাজল অধিকারীর সঙ্গে মিলিতভাবে যতীন্দ্রনাথ রায় অনেক কাজ করে চলেছেন।

আমি বহুদিন যতীন্দ্রনাথ রায়ের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলাম। তাকে খুব কাছ থেকে দেখবার বোঝার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ব্যক্তিগত পরিসরে আমি তাঁর ভাইপো। তাকে প্রণাম জানাই। দীর্ঘজীবন কামনা করি।

পলাশকান্তি বিশ্বাস: বহিরগাছির যতীন্দ্রনাথ, লোকসংস্কৃতির যতীন্দ্রনাথ

আমজনতার মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ হলে, আমরা তার পারঙ্গমতা, দক্ষতা ও কর্মে মুগ্ধ হই। বিশেষদের মধ্যেও কেউ সবিশেষ হন, তার হ্যালোজেনদীপ্তিতে বিশেষদের দীপজ্যোতি ম্লানতর লাগে, আমরা তাকে নিয়ে গর্ব করি। তাদেরও ছাপিয়ে গেলে সেই অতিবিশেষের জ্যোতিকে আর নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা দিয়ে বন্দি করা যায় না, তিনি দেশ এবং কখনও কখনও কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে তারকার মতো ভাস্বর হয়ে ওঠেন। সেই নক্ষত্রজ্যোতিতে আমরাই দীপ্ত ও উদ্দীপিত হই। আমাদের চলনে যাপনে অনুভবে তার ছাপ রয়ে যায় বহুদিন, বহুকাল। স্থানিক ইতিহাস পেরিয়ে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসচর্চার পাত্র হয়ে ওঠেন তাঁদের মতো ক্ষণজন্মা কিছু মানুষ। তেমনই একজন মানুষ হলেন যতীন্দ্রনাথ রায়। ভূতপূর্ব প্রধানশিক্ষক, মাস্টারমশাই, পল্লীসংগঠক, লোকসংস্কৃতি ও লোকসঙ্গীত-গবেষক ও অসাধারণ বাগ্মী। লালন শাহ-আব্বাসউদ্দিন-বিজয় সরকার এই মহান ত্রয়ীর গানের প্রচার ও প্রসারের জন্য দুই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন মঞ্চ ও সংগঠন স্থাপন করে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতের আপামর মানুষ ও

কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে যোগাযোগ, সমন্বয় ও সম্প্রীতি বাড়ানোর স্বার্থে ৪০-৫০ বছর ধরে বিরতিহীন কাজ করে চলেছেন।

নদিয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার একটি গ্রামের নাম বহিরগাছি। কিন্তু ওই নাম বললে শুধু ওই গ্রামটি নয়, এমনকি ওই নামের স্কুল, বাজার, রেলস্টেশন বা পঞ্চায়েতও নয়, বোঝায় ওই নামের রেলস্টেশনটি ঘিরে বহিরগাছি, বেলেপাড়া, মাঠনারায়ণপুর, হেমাইতপুর, হাটুভাঙা, বিশ্বনাথপুর, প্রতাপগড়, কামডাঙা, কুলগাছিসহ সন্নিহিত আরও বড়ো অঞ্চলটিকেই। এত বড়ো একটি জনপদে নিশ্চিতভাবে বহু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, উকিল, রাজনীতিক, প্রশাসক, খেলোয়াড়, শিল্পী- নানা বর্ণের নানা উচ্চতার নানা গুণের বহুতর মানুষের বসবাস। সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্য অনেক বিশেষ, সবিশেষকে ছাড়িয়ে শালপ্রাংশুর মতো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠেছেন যতীন্দ্রনাথ রায় তাঁর অনন্যসাধারণ গুণ মেধা অধ্যবসায় কর্ম ও নেতৃত্বদানের মধ্য দিয়ে। বহিরগাছির যা কিছু উল্লেখযোগ্য ভালোর ও মহত্ব আজ আমরা দেখি তার প্রায় সবকিছুর পিছনে রয়েছে তাঁর অবদান। মানবচর্চার প্রায় সকল ক্ষেত্রে তাঁর অনায়াস বিচরণ, আগ্রহ ও অংশগ্রহণ অবাক করার মতো। সভ্য মানবসমাজের বাহ্যিক ও আত্মিক যা যা প্রয়োজন তা করায়ত্ব করতে নিজে যেমন আজীবন প্রয়াস পেয়েছেন, তেমনি নিজের এলাকার মানুষ ও বৃহত্তর সমাজের স্বার্থে সে সবের বিকাশ ও প্রসারে উদ্যোগগ্রহণ ও সুযোগ্য নেতৃত্বদানে তৎপর থেকেছেন ধারাবাহিকভাবে।

একটা কথা প্রথমদিকে বলে নেওয়া ভালো যে, বহিরগাছি ও যতীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে ১৯৪৭ এর সেই কুখ্যাত মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়-সৃষ্টিকারী দেশবিভাগ ও তৎপরবর্তীকালে তজ্জনিত অপরিমেয় ক্ষতি ও অবর্ণনীয় দুর্দশার কবলে পড়া অসহায়, ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা, প্রতিরূপ পরিবেশ ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্য জীবনসংগ্রামের কথা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রতিবেশের স্থানীয় মানুষের সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিরোধিতা উজিয়ে আস্থা, বিশ্বাস ও সহযোগিতা অর্জন করে বিরাটসংখ্যক মানুষের পক্ষে নতুন বসতি নির্মাণের জন্য সাংঘর্ষিক সাহস, ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা ও সাংগঠনিক উদ্যোগের কথাও। কোনও অঞ্চলের উন্নতি ও বিকাশের পিছনে কেবলমাত্র একজনের অবদানই যে থাকে না, সে কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু কারও কারও অবদান যে অন্য সবার কর্ম ও কৃতিত্বকে অনেকখানি ছাপিয়ে অনায়াস-লক্ষণীয় হয়ে ওঠে সেটা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ হয়। বহুজনের উন্নতি সাধনে জনসংযোগ, জনতার আস্থা অর্জন, জনদাবি ও আন্দোলন যাতে বিশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রণহীন না হয়ে সে বিষয়ে সজাগ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বদানের ঝুঁকি, আপাত ব্যর্থতা ও পরাজয়ের কথাগুলিও এ ক্ষেত্রে স্মরণে রাখা জরুরি।

যতীন্দ্রনাথ যখন এই গ্রামের সঙ্গে পরিচিত হন তখন তিনি একটি কিশোর। জীবন ও জড়ের প্রতি তখন সবে চোখ খুলছে। জীবনের হিসাবখাতার পাতা তখনও উন্মোচিত হয়নি তাঁর কাছে। বসন্তের আমবাগানে শাখায় শাখায় তখনও মঞ্জরী আসেনি, নবীন পাতাগুলি সবে গাঢ় হয়ে উঠছে। আশ্চর্যজনকভাবে এই গ্রামটিও তখন তাই। কিংবা আরও তরুণ!

১৯৪৭ সালের সেই অবর্ণনীয় দুর্দশা ও অগ্রণীয় ক্ষতির দেশভাগের অব্যবহিত পরে পূর্ববঙ্গের

যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার ভরপুর বসতির প্রাণচঞ্চল সমৃদ্ধ একটি গ্রাম থেকে ঠাকুরদাদার হাত ধরে জন্মস্থান ছেড়ে চিরকালের জন্যে চলে আসা বিস্মিত বিমূঢ় একটি কিশোর পা রেখেছিল পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার ছোট্ট গ্রাম এই বহিরগাছিতে। গ্রাম শুধু নামেই। ঘাস-জঙ্গল-উলুবনের ছড়াছড়ি। মূলত মসলিম সম্প্রদায়ের কিছু মানুষের বাস। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু পুরনো মাটির বাড়ি ও জমিদারপাড়া বলে অংশে দুটো তিনটে ছোটো বড়ো পাকাবাড়ি। একটু দূরে দূরে বিত্তিপাড়া, ডাকাতেপোতা, বেগুনপোতা, হিন্দুপাড়া, জমিদারপাড়া নামে কয়েকটি অবিন্যস্ত পাড়া। পুরোটা মিলেই বহিরগাছি মৌজা তথা গ্রাম। আশে পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটি নতুন ঘরের ইতিউতি। বেড়ার ঘর, খড় বা টিনের ছাউনি, কারও বা টালির চাল। ক্রমশ বাড়তে থাকে এই নতুন ঘরের সংখ্যা আর কমতে থাকে মাটির বাড়ি। তখন বন্যার ঢেউয়ের মতো মানুষ আসছে দলে দলে। দেশত্যাগ করে আসা পূব বাংলার আশ্রয়সন্ধানী মানুষ। কেউ ওপারের সম্পত্তি বেচে দিয়ে, কেউ বিনিময়ের সুযোগ নিয়ে, কেউ নেহাত দলের সঙ্গে আসা সম্বলহীন। দুয়েকটা পুটুলি, ব্যাগ বা বস্তা হাতে কাঁধে-ঘাড়ে-মাথায়, শিশুটিকে, কিশোরীটিকে হাতে-কোলে-কাঁথে নিয়ে উদ্বিগ্ন, দিগভ্রান্ত, নিরন্ন, শিকড়হারানো উদ্বাস্তু সব মানুষ। সাতপুরুষ চৌদ্দপুরুষের ঘরবাড়ি ছেড়ে হঠাত-ঘোষিত ভূখণ্ডকে আপনার দেশ বলে বেরিয়ে পড়া হাজারে হাজারে মানুষ। যশোর, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, কোথা থেকে না আসছে তারা? চেনাসূত্রে, তস্য তস্য যোগাযোগসূত্রে কিংবা শুধু শোনা কথাঃ ওই অমুক গ্রামে আমাদের এলাকার মানুষ আছে, শুধু এই কথায় ভর করে চলে আসছে। জলকাদা জঙ্গল সাফ করে প্রথমে তো মাথা গোঁজার ঠাঁই চাই, তারপর অন্য ব্যবস্থা! মানুষ নামে প্রাণিদের চলমান ঝাঁক যেন! দেখছে কিশোর ছেলেটি। ছোটবেলায় পুব বাংলায় যেমন দেখত পাখিদের ঝাঁক, মাছেদের ঝাঁক, এখন দেখছে মানুষের ঝাঁক। ঠাকুরদার সঙ্গে এসে উঠেছিল বহিরগাছির বাড়িতে। ঠাকুরদা যুগল রায় ছাড়া সেখানে তখন আছেন ঠাকুমা, পিসিমা ও কাকার পরিবার। মা-বাবা তখনও পূর্ব পাকিস্তানে। ভারত, ইন্ডিয়া, হিন্দুস্থান করতে করতে, ইংরেজ, তুমি ভারত ছাড়ো' স্লোগান মুখ থেকে শেষ হতে না হতেই কীভাবে যেন চিরপরিচিত ভারত দেশটা অচেনা পূর্ব-পাকিস্তান হয়ে উঠল! সে দেশ নাকি আর হিন্দুদের কাছে নিরাপদ নয়। হিন্দুদের নাকি ভারত বলে আরেকটি দেশ আছে, সেখানে চলে যেতে হবে। সেখানে গেলেই সব নিরাপদ! সেখানে বিপদ নেই, খাদ্য বাসস্থানের অভাব নেই, খেতভরা ধান, নদীভরা মাছ! কৃষ্ণ, রাম, চৈতন্য, গান্ধি, সুভাষের দেশ! বেদ- পুরাণ-উপনিষদের দেশ! আয়তনে বিশাল, মহত্বে বিরাট! আশ্রয় নিয়ে নাকি তারা ডাকছে! মা-বাবা, আজন্ম চেনা বাড়ি, পথ, মাঠ খেত, বাজার, স্কুল, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে এসে এমনিতেই তাঁর মন কেঁদে উঠত, তার উপর এই সব-হারানো দুর্গত মানুষের অসহায় অবস্থা দেখে তাঁর মন আরও কাতর হয়ে উঠল। অভাব-অনটন তো তিনি এর আগে কোনোদিন দেখেন নি! এ সময় তাঁর মনে হতে থাকে পৃথিবীতে অভাব-অনটন, দুর্দশা আর অসহায়তা ছাড়া মানুষের আর কিছু নেই।

পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আড়ংঘাটা হাইস্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন পাশ করে রাণাঘাট কলেজে ভর্তি হন। সে সময় যে দুয়েকটি ঘরের ছেলেরা পড়তে যাবার সুযোগ পেয়েছিল

তাদের সবাইকে আড়ংঘাটাতেই যেতে হত। এমনকি সাপ্তাহিক বাজার করতেও। এমনি করে সময় যেতে থাকে। কয়েক বছর যেতে আশেপাশের গ্রামগুলি একেকটা অবয়ব পেতে থাকে। বহিরগাছি, প্রতাপগড়, বিশ্বনাথপুর, হেমাইতপুর...। চোখের সামনে গড়ে ও বেড়ে উঠতে দেখেছেন এই সব গ্রাম- তার পাড়া ও কলোনিগুলিকে।

৫৮ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করতেই কাকা বললেন, ওকে কলকাতায় ভর্তি করে দাও, ওখানে থেকেই পড়াশুনো করুক, এখানে থেকে উচ্চশিক্ষা ভালো হবে না। সবাই তাতে সায় দেওয়াতে ভর্তি হলেন তিনি কলকাতার বিখ্যাত স্কটিশ চার্চ কলেজে। ভীরু, বিস্মিত ও আগ্রাসী চোখে সেই কলকাতাকে দেখা। রবীন্দ্রনাথের কলকাতা, বিদ্যাসাগরের কলকাতা, বিবেকানন্দ-সুভাষ-নজরুলের কলকাতা, আকাশবাণীর কলকাতা। বিস্ময়ের শেষ নেই, আগ্রহ চেপে রাখা মুশকিল! উৎসাহী দর্শকের আগ্রহ নিয়ে কলকাতার বিখ্যাত সব অধ্যাপকদের ভাষণ শুনছেন, তাদের কায়দা সহবত শিখছেন, কলকাতা ও বিভিন্ন জেলা থেকে আসা বিভিন্ন ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে, বন্ধুত্ব হচ্ছে আর আনন্দ যাচ্ছে সীমা ছাড়িয়ে। কলকাতায় তখন বিখ্যাত সব কবি সাহিত্যিকদের মজলিস। জীবনানন্দ দাশ সবে গত হয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, দীনেশ দাসরা তখনও স্বমহিমায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেনদেরও রমরমা। উঠে আসছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়রা। কলকাতার হাওয়ায় তখন টোকা দিলে বুঝি কবিতা ঝরে পড়ে, হাততালি দিনেই বেজে ওঠে গান। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক তখনও ফুরিয়ে যাননি, আছেন শিবরাম চক্রবর্তী, মুজতবা আলি, সমরেশ বসুরা। গজেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীরাও উজ্জ্বল। বিখ্যাত পূর্বসূরীদের কাঁধের পাশ দিয়ে, ঘাড়ের পাশ দিয়ে উকি দিচ্ছেন প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধায়, শীর্ষেন্দু, সন্দীপন, সুনীল, শঙ্কররা। কে জানত, এই সব বিখ্যাতদের অনেকেই তাঁর অতি-পরিচিতের পরিধিতে চলে আসবেন, হয়ে উঠবেন কাছের মানুষ। যেন এক ঘোরের মধ্য দিয়ে চলছে বন্ধুদের সঙ্গে রাতে বা ছুটির দিনে দেশ বিদেশের বিখ্যাত সব সিনেমা দেখা, বিখ্যাত শিল্পীদের গান শোনা, বিখ্যাত সব নাট্যপরিচালক ও অভিনেতাদের নাটক ও অভিনয় দেখা। বিমল রায়, দেবকী বসু, সত্যজিত রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল তপন সিনহা, অগ্রদূত, যাত্রিক এঁদের পাশাপাশি কুরোসাওয়া, ফেলিনি, ডি-সিকা, বার্তোলুচি, ক্রুফো, আইজেনস্টাইন, ডেভিড লীন আরও কত সব নাম করা ও নাম না জানা পরিচালকের সব দুনিয়া কাঁপানো সিনেমা! নাটকে তখন একদিকে যেমন চলছে অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ি, বিধায়ক ভট্টাচার্য অন্যদিকে বিজন ভটাচার্য, শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্তদের পরিচালনা ও অভিনয়। রূপালী পর্দার গন্ধর্বলোক থেকে মাটির পৃথিবীর মঞ্চে এসে সরযূবালা, ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, অনুপকুমারদের মতো চলচ্চিত্রশিল্পীদের অভিনয়। চলছে দেবনারায়ণ গুপ্ত, মন্মথ রায়ের নাটক, পাশাপাশি বিখ্যাত কথাকারদের গল্পের নাট্যরূপে সাড়াজাগানো সব নাটক। গানে কলকাতা ও বোম্বে কাঁপাচ্ছেন শচীন কর্তা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে। আছেন নির্মলেন্দু চোধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, আছেন সন্ধ্যা মুখার্জি, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়,

উৎপলা সেন, আরতি মুখোপাধ্যায়রা। কম্পোজার পুঙ্কজ মল্লিক, সুধীরলাল চক্রবর্তী, রবীন চ্যাটার্জি, নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত, অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনল চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর মজুমদার, সর্বোপরি সলিল চৌধুরী। রবীন্দ্রসঙ্গীতে পঙ্কজ মল্লিক, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সাগর সেন, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ঘ্য সেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, সুমিত্রা সেন, নীলিমা সেন, ঋতু গুহরা। কাকে ছেড়ে কার নাম করি? সকলেই স্বনামধন্য। কলকাতার বিভিন্ন হলে তাঁদের লাইভ অনুষ্ঠান। শীতকাল জুড়ে বসত উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের আসর ডোভার লেন, মহাজাতি সদন, রবীন্দ্রসদন, বিভিন্ন সিনেমা হল ছাড়াও উত্তর কলকাতার অনেক বিখ্যাত বনেদি ও সঙ্গীতপ্রিয় পরিবারের বৈঠকখানায়। আলাউদ্দিন খাঁ, রবিশঙ্কর, আলি আকবর খাঁ, বড়ে গোলাম, বিলায়েত খাঁ, আমির খাঁ, কেরামতুল্লা খাঁ, কিষেন মহারাজ, আল্লারাখা, ভীমসেন যোশী, যশরাজ, পান্নালাল ঘোষ, বিসমিল্লা খাঁ, ভিজি যোগ, হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া, শিবকুমার শর্মা, তারাপদ চক্রবর্তী, চিন্ময় লাহিড়ি, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, দিগগজ সব কণ্ঠশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পীরা তখন ও সারা ভারত শুধু নয়, সারা পৃথিবীকে সম্মোহিত করছেন তাঁদের কলা-পারঙ্গমতায়। নবীন যুবক যতীন্দ্রনাথ তখন কখনো দল বেঁধে কখনো একা সেই অমিয় আকণ্ঠ পান করেছেন। এর পরের তিন বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র থাকাকালীন সময়েও সেই সুধাপান থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেননি তিনি।

কলকাতাবাসের এই সময়ের অর্জন যতীন্দ্রনাথের সারাজীবনের পাথেয় ও দিকনির্দেশক জ্ঞানশলাকা হয়ে ওঠে। তৈরি হয় দেখার চোখ, শোনার কান, বিশ্বমানবের আনন্দ ও দুঃখ অনুভব করার হৃদয়। একজন কসমোপলিটান মানুষের নাগরিক মন নিয়ে বিদ্যার্জন শেষে ফিরে আসেন নিজের গ্রাম বহিরগাছিতে। প্রধানশিক্ষক হিসেবে যোগ দেন বহিরগাছি হাইস্কুলে। বিদ্যালয় ও আশেপাশের সকল গ্রামকে স্বাধীন ও আধুনিক ভারতের চলার পথের সহযাত্রী করে তুলতে শুরু হয় তাঁর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা। ভারতীয় সংবিধান তাঁর জনগণকে যে সুবিধা ও অধিকার দেবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার সুবিধা দারিদ্রগ্রস্ত, অশিক্ষিতি, অসচেতন, ছিন্নমূল মানুষের কাছে কীভাবে সুলভ ও উপলব্ধ করা যায় সে বিষয়ে চলে অনুসন্ধান, লেখালেখি ও তদবির। এলাকার সচেতন লোকদের সংগঠিত করে সরকারি সুবিধা আদায়ের জন্য বিডিও, এসডিও, ডিএমদের নিকট চলে তাঁর পত্র-চালাচালি। উদবাস্তু মানুষেরা বনজঙ্গল সাফ করে যে জমিকে চাষের উপযুক্ত করার চেষ্টা করেছে, সেখানে শুধু বৃষ্টির জলের অপেক্ষায় বসে থাকলে সেখানে যথোপযুক্ত চাষ সফল হবে না, চাই সেচের জল। টিউবয়েল, শ্যালো মেশিন, ডিপ-টিউবয়েল দরকার। কীভাবে করা যায়, লোকজনদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে মহকুমা ও জেলা আধিকারিকদের অফিসে যোগাযোগ করে সে সব সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করলেন। এভাবেই অনেক মিটিং, ট্রেন অবরোধ, চিঠি চালাচালি, হত্যা, নিবেদন-- দীর্ঘ লড়াই ও প্রতীক্ষার পর গড়ে উঠল বহিরগাছি হল্টস্টেশন।

যে বিদ্যালয়ের তিনি প্রধানশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হলেন তাঁর নির্মাণকল্পে সম্পন্ন পরিবারের কাছে জমি অনুদানের অনুরোধ নিয়ে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠর সঙ্গে ছাত্রাবস্থাতে তিনিও গিয়েছেন। এইভাবেই অনেকের সঙ্গে মিলে গ্রামে গ্রামে সভা, আলোচনা, ভিক্ষা, অনুদান, চাঁদা

সংগ্রহ করে, বিদ্যালয়ের নির্মাণের জন্য রসদ যোগাড়ের যাত্রায় সামিল হয়েছেন। দরিদ্র মানুষেরা এটুকু বুঝেছিল, একবেলা খাও, আধপেটা খাও এলাকায় স্কুল দরকার। না হলে সব পরিবার থেকে ছেলেমেয়েরা আড়ংঘাটায় গিয়ে পড়াশুনা করে উঠতে পারবে না। সকলে তাদের সামর্থানুযায়ী এই বিদ্যালয় গঠনে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। অনেকে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করেছেন। বহিরগাছিতে প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয় গঠনের কালে পরিবারের অন্য বড়দের সঙ্গে কিশোর থেকে যুবক হতে চলা যতীন্দ্রনাথেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

এভাবেই গ্রাম ও এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে সিএডিপির (Comprehensive Area Development Programme)- কাজকর্মে জড়িয়ে পড়া। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা ও দেশ গঠনের স্বপ্ন ও আদর্শ নিয়ে যাঁরা রাজনীতিতে এসেছিলেন দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করার সদিচ্ছা ও আগ্রহ তখনও অনেকের মনে জাগরুক। পান্নালাল দাশগুপ্ত তাঁদের একজন। পান্নাবাবু অবশ্য অনেকদিন আগে থেকেই গান্ধীবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামসেবার কাজে নেমে পড়েছিলেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিশ্বাসী বিপ্লবী পান্নালাল দীর্ঘদিনের কারাবাস থেকে মুক্ত হন ১৯৬২তে। কলকাতার বিভিন্ন স্থানে তখন তাঁকে নিয়ে হইচই, আলোচনা সভা, সম্বর্ধনাসভা। এক ঐতিহাসিক সেমিনার আয়োজিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু বিশিষ্ট মানুষের আগমন ঘটে সেখানে। সৌভাগ্যবশত সেখানেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে যায় যতীন্দ্রনাথের। ১৯৬৪তে পান্নাবাবু 'কম্পাস' নামে একটা পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন মূলত দেশগঠনমূলক কাজের কথা প্রকাশ ও প্রচার করার জন্য।

জেলবাসে থাকাকালীন সময়ে তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সম্বন্ধে আগ্রহী হন। গান্ধীলিখিত ও গান্ধীবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন বই পড়ে সে বিষয়ে জেলে বসেই একটি বই লিখেছিলেন। 'গান্ধী-গবেষণা নাম দিয়ে সেই লেখা ধারাবাহিকভাবে ‘কম্পাস’ পত্রিকায় বেরোতে থাকল। সাড়া পড়ে গেল পাঠক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতি-পণ্ডিতমহলে। এলাকা উন্নয়নের পাশাপাশি সামগ্রিক উন্নয়নের নানারকম রূপরেখা আঁকা হতে থাকল কম্পাস পত্রিকায়। যতীন্দ্রনাথও যোগ দিলেন কম্পাসে। পান্নাবাবুর সঙ্গে তখন গৌরকিশোর ঘোষ, অম্লান দত্ত, আরতি সেন, বাদল সরকারসহ আরও বিদগ্ধ ও কৃতী মানুষ জড়িয়ে পড়েছেন। ফরিদপুরের গান্ধী বলে পরিচিত 'চন্দনাথ বসু' তখন এ দেশে এসে বাস করা শুরু করেছেন বহিরগাছির কাছের মফস্বল বগুলায়। বগুলা তখনও শহর হয়ে ওঠেনি। যতীনবাবু উদ্যোগী হয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন পান্নাবাবুকে। তাঁরা বহিরগাছি ও তার আশপাশের এলাকাকে তাঁদের অন্যতম কাজের জায়গা হিসেবে বেছে নিলেন। বহিরগাছির পূর্বপাশস্থিত কলমার বিল থেকে সেচের জন্য একটা খাল কাটার কাজে তাঁরা হাত লাগান।

খালের জন্য জমিদাতাদের সঙ্গে চন্দ্রনাথ বসুর ছবি সহ সে খবর প্রকাশিত হয় ‘কম্পাস’ পত্রিকায় ১৯৬৬ সালে।

পান্নাবাবু বহিরগাছিতে একাধিকবার এসেছেন, আড়ংঘাটা-দত্তফুলিয়া-বরনবেড়িয়া-হেলেঙ্গা-বহিরগাছির বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে সেখানকার লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে সমস্যা ও

চাহিদা বুঝতে ও তার থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এ কাজের সঙ্গে যুক্ত সরকারি আধকারিকেরাও যতীনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রেখে চলতেন। যতীনবাবুদের বাড়িতেই খোলা হয়েছিল আঞ্চলিক কার্যালয়ের কেন্দ্র ও ধর্মগোলা। ১৯৭৩-৭৪ নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যোজনা পর্ষদ রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'সিএডিপি' (Comprehensive Area Development Programme) নামে একটি প্রকল্প ঘোষণা করে। এর আওতায় ছিল পশুপালন, মৎসপালন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, পর্যটন ইত্যাদি বিষয়ে মানুষকে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেওয়া, উৎপাদনে সহায়তা করা।

রাজ্য সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিবিখ্যাত লোককে এই প্রকল্পে যুক্ত করার পরিকল্পনা করে। সেই অনুযায়ী বিখ্যাত বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্তের 'টেগোর সোসাইটি'-কে এই সার্বিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পশুপালন, মৎসপালন, তাঁতবস্ত্র উৎপাদনে বহিরগাছি এলাকার লোকজনও অংশগ্রহণ করেছিল। কৃষি ও সেচের উন্নয়নেও সিএডিপির ভূমিকা দেশগঠনের সেই প্রাথমিক যুগে ছিল উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে সরকার আইনবলে সিএডিপিকে কর্পোরেশন করে নিজের আয়ত্বে নেয়, নামকরণ হয় সিএডিসি (CADC-- The WEST BENGAL COMPREHENSIVE AREA DEVELOPMENT CORPORATION)।

যতীন্দ্রনাথ অসাধরণ বাগ্মী সে কথা যারা তাঁর কথা শুনেছেন তারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। সাহিত্যবোদ্ধা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি বহুজনবিদিত। বাড়িতে সাহিত্য সঙ্গীতের বইয়ের বিশাল সম্ভার। সম্ভ্রমের কথা, সে সব বইয়ের একটা বড় অংশ স্বয়ং লেখকের দ্বারা সৌজন্য ও প্রণামী কপি হিসেবে তাঁকে প্রদত্ত। অধিকাংশ লেখকই বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক। লেখক হিসেবে হয়ত নিজেকে সেভাবে প্রস্তুত করননি, যথাসময়ে বই লেখাতে ও প্রকাশ করাতে মনোনিবেশ করেননি, নইলে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার যা বহর তাতে অনেকগুলি বই প্রকাশ হতে পারত। নিজেকে প্রকাশে তাঁর অনীহা, কাজে কর্মেই তাঁর মন বেশি। এতদসত্ত্বেও কম্পাস পত্রিকায় লিখেছেন বহুদিন। শঙ্খচিল পত্রিকা সম্পাদন করে আসছেন বহু বছর ধরে। নব্বই বছর জীবনের প্রায় সত্তর বছর ধরে করে চলেছেন সেই কাজ লোকে যাকে বলে ঘরের খেয়ে বুনো মোষ তাড়ানো।

বহিরগাছিতে সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদি বিনোদনের ক্ষেত্রে তিনি বিরাট পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। যাত্রাপালা, অষ্টক, রামায়ণ, কৃষ্ণযাত্রা, কীর্তন, কবিগান, হরিলীলা-কীর্তন বা মতুয়াসঙ্গীত এই সমস্ত গ্রামীণ আনন্দানুষ্ঠানকে গুরুত্ব দিয়েও এ সবের পাশাপাশি তিনি নাগরিক জীবনে প্রচলিত সঙ্গীত ও নাটককে গ্রামীণ জীবনে আনার চেষ্টা করলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি এলাকার ছেলেমেয়েদের স্বার্থে রাণাঘাট থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষক আনার ব্যবস্থা করলেন। স্থানীয় শিক্ষক-অভিনেতাকে দিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে রবীন্দ্রনাট্য পরিবেশনার ব্যবস্থা করলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনিল মাস্টার ছিলেন এ বিষয়ে তাঁর সহযোগী। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষকদের যাঁর যে বিষয়ে পারঙ্গমতা সে বিষয়ে টিফিন-পিরিয়ডে বা অফ-পিরিয়ডে কিংবা ছুটির পরে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষণের ব্যবস্থা

করলেন। কবিতা আবৃত্তি, অভিনয়, নাচ, ইত্যাদি বিষয়ে বিখ্যাতদের বাইরে থেকে এনে অনুষ্ঠান করিয়ে শ্রোতা ও দর্শকদের মনমেজাজ ও রুচি গঠনের জরুরি কাজটি করে যেতে থাকলেন। কলকাতা থেকে নাটক, থিয়েটারের দল এনে অনুষ্ঠান করিয়েছেন। ছাত্রজীবনে কলকাতায় থেকে যে নাগরিক সংস্কৃতির দর্শন ও স্বাদ তিনি নিতে পেরেছিলেন, বিদ্যালয়ের বৃহত্তম পদটির উত্তম সুযোগ গ্রহণ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও যোগাযোগে বড় বড় শিল্পী ও দলের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকাবাসীকে সেই স্বাদ দেওয়ার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। বিদ্যালয়ে যেমন গুরুত্ব দিয়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলজয়ন্তী ঘটা করে পালন করা হত, অন্যান্য বিখ্যাত মনীষীর জন্মদিনও উৎসাহ সহকারে পালিত হত। রাজ্যের সব বিদ্যালয়েই তা হয়ে থাকে, কিন্তু বহিরগাছিতে যতীনবাবু প্রধানশিক্ষক থাকাকালীন ওই সব অনুষ্ঠানের যে মাত্রাগত ও গুণগত ঔৎকর্ষ ও উচ্চতা ছিল পরবর্তীকালে তার চূড়ান্ত অবনমন ঘটেছিল। সে সময় বিশেষদিনের ছুটি বা অনুষ্ঠান সম্পর্কে আগেই ক্লাসে ক্লাসে নোটিশ পাঠিয়ে সবাইকে অবহিত করা হত এবং অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আহবান ও নির্দেশ থাকত। অনুষ্ঠান বা বিশেষ উপলক্ষের দিন সমবেত শিক্ষক ও ছাত্রদের সামনে অন্যদের নাতিদীর্ঘ বক্তব্যের পর থাকত তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গি ও বাগ্মিতাময় হৃদয়গ্রাহী ভাষণ। বোধ করি, সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রী সকলেই সেই বক্তৃতা শোনার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় থাকতেন। একটা ঘটনার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করব। ১৯৮০ সাল। মাস দিন ঋণ মনেই নেই।

এটুকু মনে আছে, সেদিন ছিল 'মার্শাল টিটো' বলে একজন মানুষের মৃত্যুদিন। আগেরদিন হয়তো প্রয়াত হয়েছেন, অথবা ঐদিন সকালে। সম্ভবত ঐদিন স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। বলার কথা যেটা, হেড মাস্টারমশাই অন্য শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ কোন বক্তব্য রাখবেন কিনা। অন্য শিক্ষকরা তাঁকেই বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করলেন। মাস্টারমশাই মার্শাল টিটোকে নিয়ে অনেক কথাই বললেন। দুটি বিষয় শুধু মনে আছে, রুশনেতা স্তালিনের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বা মতপার্থক্য ও সোভিয়েত আধিপত্যকে অস্বীকার এবং জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার কথা। ক্লাস নাইনের ছাত্র হিসেবে অনেক কিছু না বোঝার মধ্যেও এটুকুই শুধু ধরতে পেরিছিলাম। কিন্তু জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনটা কী, তা বোঝার মতো শিক্ষা ও জ্ঞান তখন আমার ছিলনা। ঐ দিন পরে খবরের কাগজে টিটো সম্বন্ধে পড়তে গিয়ে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন কথাটির উল্লেখ বারবার দেখে ও পড়ে কিছুটা অনুধাবন করি, আর আমাদের প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের জ্ঞানের গভীরতা ও সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণী পাঠ সম্পর্কে মনে গভীর সমীহভাব জাগে।

টেলিভিশন আসার আগে যখন রেডিওই ছিল দূর-বিনোদনের একমাত্র পথ যা ঘরে বসেই ভোগ করা যায়। আর ছিল হলে গিয়ে সিনেমা দেখা। মানুষের মনে তখন আকাশবাণীর ভূমিকা অপরিসীম। খবর, গান, কথিকা, কৃষিকথার আসর, খেলার ধারাবিবরণী। আকাশবাণী তাদের সম্প্রচারে কলকাতা ক ও খয়ের পাশাপাশি অনেক পরের দিকে 'যুববাণী' বলে একটি কেন্দ্রের সূচনা করে। যুববাণীর শুরুর সময় থেকেই যতীনবাবু ছিলেন কেন্দ্রটির সঙ্গে জড়িত। এমনিতেই আকাশবাণীর অনেক অনুষ্ঠানের পরিচালক ও প্রযোজকের সঙ্গে আগে থেকেই আলাপ ছিল,

যুববাণীর সম্প্রচারের সময়ে যেন হয়ে উঠলেন তাঁদের ঘরের লোক। অনেক কথিকায় তাঁকে সে সময় অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। তাঁর সাক্ষাৎকারও সম্প্রচারিত হয়েছে এই কেন্দ্র থেকে। অনুষ্ঠান না থাকলেও সেখানে তাঁর যাতায়াত ছিল ও বিশেষ গুণিজনদের সঙ্গে নানা বিষয়ে তাঁর কথাবার্তা হত। প্রণবেশ সেন, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, জগন্নাথ বসু, উর্মিমালা বসু এঁদের সঙ্গ ও সাহচর্য পেতে তাঁকে প্রায়ই কলকাতা যেতে হত। এরকম ঘটনা পরের দিকে টেলিভিশনকেন্দ্রকে ঘিরেও ঘটতে থাকে। প্রথমদিকে টেলিভিশন সম্প্রচার আকাশবাণীভবন থেকেই হত, পরে তা গলফগ্রীনে চলে যায়। সেখানেও পরিচিত লোকের অভাব ছিল না। অনেক অধিকর্তা ও প্রযোজক ছিলেন চেনা। আকাশবাণীতে জড়িত অনেকেরই আংশিক সময়ের কাজ ও দায়িত্ব থাকত দূরদর্শনে অংশগ্রহণের। অন্যতম অধিকর্তা পঙ্কজ সাহাও ছিলেন পরিচিতদের মধ্যে।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'দেশ' পত্রিকার অবদান ও প্রভাব অপরিসীম। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি যে আনন্দবাজার পরিবারের দ্বারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত, রাগে হোক, গর্বে হোক অনেকেই তা স্বীকার করেন। এই পত্রিকার অন্যতম প্রধান সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ যিনি রূপদর্শী ও গৌড়ানন্দ নামেও লিখতেন তাঁর সঙ্গে যতীনবাবুর ছিল আত্মিক সম্পর্ক। পূর্ববঙ্গে দুজনেই একই এলাকার মানুষ। যতীনবাবুর সঙ্গে দেখা হলেই গৌরবাবু দেশের (মাগুরা-শৈলকুপা-ঝিনেদা-কামারখালি-সন্নিহিত অঞ্চল) কথা জিগ্যেস করতেন, আর নিজে যা জানতেন সেটাও অবগত করতেন। দেশ নিয়ে দুজনেরই টান ছিল আকুল। গৌরবাবু শুধু সাংবাদিক নন, বিখ্যাত গল্পকার ও ঔপন্যাসিকও। মুক্ত ও গণতান্ত্রিক চেতনার জন্যে বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর ট্রিলজি উপন্যাস প্রেম নেই, জল পড়ে পাতা নড়ে, প্রতিবেশি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, নতুন ধারার দিশারি। পাঠক ও সমালোচকদের কাছে সমাদৃত হয়। মুসলমান সমাজকে এত বিশদে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এর আগে দুই বাংলায় আর কেউ তুলে ধরেননি। এই গৌরবাবুর সূত্রেই আনন্দবাজারের অন্দরমহলের দ্বার খুলে যায় যতীন্দ্রনাথের কাছে। ১৯৮০ সালের দিকে গৌরকিশোর ঘোষ আনন্দবাজার ছেড়ে আজকালে যোগ দেন। সেখানেও যতীনবাবুর অবারিত দ্বার ছিল, কিন্তু সেখানে তাঁর আসর তেমন জমেনি। আনন্দবাজারে পরিচিতজনের সংখ্যা ছিল অনেক এবং অনেকেই যতীনবাবুকে পছন্দ করতেন। গৌরকিশোর ঘোষের পাশেই বসতেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গেও যতীনবাবুর আলাপ হয়েছিল। পরবর্তীকালে ঘনিষ্ঠতার বৃত্তে আসেন এক ও অদ্বিতীয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুনীল বলতেন, ওই মাস্টারমশাই এলেন, ওনার সামনে তো আবার সব কথা বলা যাবে না, কারণ উনি মাস্টারমশাই।

আলাপ ছিল সাগরময় ঘোষের সঙ্গেও। পরিচয় ঘটেছিল সমরেশ বসু, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়সহ আরও অনেকের সঙ্গে। আর সমরেশ মজুমদার তো ছিলেন তাঁর সহপাঠী, একবছরের জুনিয়র। পরের দিকে জয় গোস্বামী যখন আনন্দবাজারে কাজ নেন তখন আবার অনেক নূতন কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ জমে। সুনীলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আমৃত্যু ছিল। সুনীলের 'ভাষা-চেতনা-সমিতি'র বৈঠকে যতীনবাবু নিয়মিত যেতেন। রাজ্যে বাংলাভাষা সর্বস্তরে

গুরুত্বসহকারে ব্যবহারের জন্য সুনীলের দাবি, আন্দোলন ও নেতৃত্বদান ছিল আন্তরিক। যতীনবাবুও ছিলেন সে আন্দোলনের শরিক।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে একটি স্তম্ভ হলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁর মতো প্রবাদপ্রতিম মানুষেরও অভি কাছের মানুষ ছিলেন যতীনবাবু। মাস্টারমশাইয়ের কাছে অন্নদাশঙ্করের প্রসঙ্গ তুললে কথা যেন আর শেষ হতে চায় না। তাঁকে নিয়ে যতীনবাবুর অজস্র স্মৃতি। বাংলা একাডেমির প্রধান থাকার সময়ে ওখানে যতীনবাবু প্রায়ই যেতেন। ওখানকার কর্মচারী, সচিব সবার কাছে পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কদমখালিতে লালনমেলার জন্য সংগঠন প্রস্তুত ও মেলার আয়োজন করলে অন্নদাবাবু খুব খুশি হয়েছিলেন। কারণ লালন-কর্মভূমি কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙা তখন ছিল অবিভক্ত নদিয়া জেলার অংশ আর তার মেজিস্ট্রেট ও জেলাশাসক হিসেবে তিরিশের দশকে কাজ করেছিলেন অন্নদাশঙ্কর। লালনের আশ্রম-এলাকাও ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্রের অধীন। তিনিও মজেছিলেন লালনে। লালনের উপর তাঁর একটি বই আছে, 'লালন ফকির ও তাঁর গান' যা লালন-গবেষকদের কাছে প্রামাণ্য ও আকরগ্রন্থ। উভয় বাংলার ভদ্রজনসমাজে লালনকে পরিচিত ও জনপ্রিয় করার পিছনে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও যাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে, অন্নদাশঙ্করও তাঁদের একজন। অন্নদাশঙ্করের কাছে যতীনবাবু ছিলেন সন্তানপ্রতিম। দীর্ঘজীবী অন্নদাশঙ্করের শেষজীবনে রোগশয্যায় যখন অন্যদের তাঁর কাছে যাওয়ার অধিকার ছিল না, তখন অতি ঘনিষ্ঠদের যে কজন কাছে যেতে পারতেন তাঁদের একজন ছিলেন যতীনবাবু। তাঁর শেষতম দিনেও যতীনবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বিয়োগ ছিল বনস্থলীতে মহীরুহের পতনের মতো।

বিজয় সরকারকে নিয়েও যতীনবাবুর অনেক স্মৃতি। বেঁচে থাকতে অনেকবার তাঁর গান সরাসরি শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। আলাপেও ছিলেন মৃদ্ধ। অত্যন্ত স্নেহ করতেন কবিয়ালমশাই এই গুণী ও সংস্কৃতিবান স্কুলশিক্ষকটিকে। দুই বাংলায় জাতিধর্মনির্বিশেষে এই কবিয়ালের জনপ্রিয়তার কোনো তুলনা নেই। প্রথমদিকে এই জনপ্রিয়তা মূলত যশোর-খুলনা-ফরিদপুরে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীতে তা সীমানার গণ্ডী পেরিয়ে যায়। বাংলার লোকসঙ্গীত এখন সুদূরের ইওরোপ-আমেরিকাতেও চর্চার বিষয়, আর বাংলা লোকসঙ্গীত থাকলে বিজয় সরকারের গানও যে সেখানে থাকবে, এখন তা আর কারও অজানা নয়। সরকারমশায়ের মৃত্যুর পর তাঁর গান ও স্মৃতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হলে মাস্টারমশাই সেখানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। গঠিত হয় লোককবি বিজয় সরকার স্মারক সমিতি'। ২০০২ সালে কবির জন্মশতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয়, উভয় বঙ্গে সাড়ম্বরে পালিত হবে এই শতবার্ষিকী। তিনি যোগাযোগ করেন বাংলাদেশের বিজয়-অনুরাগী গবেষক ডঃ মোমেন চৌধুরি, খোন্দকার রিয়াজুল হক, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, শিল্পী মীনা বড়ুয়া ও কৃষ্ণকীর্তন দাস ও আরও অনেকের সঙ্গে, যাতে ওদেশেও শতবর্ষপালন যথাসময়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় যাপিত হতে পারে। জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন-কমিটির সভাপতি হন ডঃ পবিত্র সরকার, কার্যকরী সভাপতি হন যতীন্দ্রনাথ রায়। দুই বাংলার বিভিন্ন গবেষক শিল্পী, সাংবাদিক ও বিরাট জনতার উপস্থিতিতে ঘটা করে তিনটি বড়ো অনুষ্ঠান হয় যথাক্রমে

কেউটিয়া, সল্টলেক স্টেডিয়াম ও নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। বাংলাদেশেও কবির জন্মস্থান ডুমদি, কাছের শহর নড়াইল ছাড়াও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিদ্যালয়ে শ্রদ্ধাসহকারে সেমিনার হয়। সর্বত্র যতীনবাবু, কাজলবাবুকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং উভয়েই প্রতিটি সভায় তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। মূলত যতীন্দ্রনাথের উদ্যোগেই মহাশ্বেতা দেবীর সভাপতিত্বে কলকাতার বাংলা একাডেমিতে একটি ঐতিহাসিক সেমিনার হয় যেখানে বক্তব্য রাখেন গবেষক ড. শক্তিনাথ ঝাঁ, সঙ্গীতজ্ঞ অধ্যাপক ড. অরুণ বসু, ও গবেষক ড. কাকলিধারা মণ্ডল। এমনই করে কবিপুত্রকে সঙ্গে করে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মঞ্চে ও সভায় বিজয় সরকারের গান এবং তাঁর গানের গুণ, বৈশিষ্ট্য ও সমাজজীবনে তার প্রভাব নিয়ে অসংখ্য বক্তৃতা করেছেন ও আলোচনাসভা পরিচালনা করেছেন। তাঁর গানের বই প্রকাশের ব্যাপারেও যতীনবাবুর ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। এখন পশ্চিমবঙ্গে নানা জায়গায় সাংগীতিক মঞ্চ গঠন ও সেই সব মঞ্চে বিজয় সরকারের গান স্বতঃস্ফূর্তভাবে গীত ও আলোচিত হওয়ার পিছনে যতীনবাবুর লাগাতার ও নিরলস প্রয়াস যে অন্যতম কার্যকরী কারণ এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বহিরগাছিতেও তাঁরই উদ্যোগে ও নেতৃত্বে লালন-বিজয়-সঙ্গীতমেলা বেশ কয়েক বছর ধরে উৎসাহের সঙ্গে সাড়ম্বরে সঙ্ঘটিত হয়ে আসছে।

নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর-মাজদিয়া বাসরুটে আসাননগর-ভীমপুর এলাকার কদমখালিতে কয়েক দশক ধরে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাওয়া 'লালনমেলা' হয়ে আসছে। কদমখালির নামই হয়ে গেছে 'লালনতীর্থ'। এই মেলা প্রবর্তনের অন্যতম কারিগর যতীন্দ্রনাথ রায়। জয়দেব-কেন্দুলি, শান্তিনিকেতন, ছেউড়িয়া (বাংলাদেশ)-র পাশাপাশি কদমখালির লালনমেলা দুই বাংলার বাউলদের কাছে এখন প্রকৃতই তীর্থক্ষেত্র। এমন কোন বড়ো বাউলশিল্পী নেই যিনি এখানে গান পরিবেশন করেননি বা করতে আগ্রহী নন। দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান সাংবাদিক গবেষক লেখক কবি সাহিত্যিক এক সময় যতীনবাবুর আমন্ত্রণে এই মেলা দেখতে ছুটে এসেছেন। এসেছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ, প্রণবেশ সেন সহ কলকাতা ও বাংলাদেশের বহু কীর্তিমান, খ্যাতিমান মানুষ। নব্বই ছুঁয়ে ফেলা যতীনবাবু এখন বয়সের ভারে ক্লান্ত। বেশি শ্রম ও সময় কোনো বিষয়েই তিনি এখন বেশি একটা দিতে পারেন না। তথাপি কদমখালির মেলাকমিটি এখনও প্রতিবছর তাঁকে দায়িত্ব নিয়ে তাদের সঙ্গে থাকতে বলেন। যেতে না পারলেও তাঁকে তারা সাম্মানিক সভাপতির স্থায়ী পদে বরণ করেছেন।

এরকম আরও অনেক অনুষ্ঠান ও কীর্তির কথা মনে আসে। সব প্রসঙ্গ উত্থাপন ও বিস্তারে রচনাটি অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়ে পড়ার ভয়। কয়েকটি প্রসঙ্গ শুধু ছুঁয়ে যাওয়াই উচিত হবে। বহিরগাছির এখন যেখানে পঞ্চায়েতের অফিসঘর, সেখানে পঞ্চায়েতভবনের জন্য জমি নির্বাচন ও সংগ্রহের নেপথ্যে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কের জন্য স্থান ও বাড়ি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল। দীর্ঘকাল ধরে গাড়াপোতায় প্রতি বছর অষ্টকগানের মেলা ও প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে। এ সংগঠনটির শুরু থেকেই তিনি এর সঙ্গে জড়িত। প্রতিবার তাঁর কাছে বর্তমান কমিটির অনুরোধ আসে তাঁদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য। আড়ংঘাটায় অনুষ্ঠিত হয় সুবলমেলা। বিখ্যাত বাউলসাধক ও গায়ক সুবল দাসের আশ্রম-এলাকা সলুয়াতে

প্রতিবছর হয় বাউলফকিরদের গানের অনুষ্ঠান ও মিলনমেলা। এ মেলাটির নেপথ্যেও যতীনবাবু। রঘুনাথপুরে চূর্ণী নদীর ধারে মনোরম পরিবেশে ২০১৪ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে রঘুনাথপুর লালনমেলা। সেখানেও লেগে আছে যতীনবাবুর করস্পর্শ। আছে গোষ্ঠমেলা। বিখ্যাত লোকগীতি ও বাউলগানের গায়ক গোষ্ঠগোপাল দাসের স্মরণে বগুলাতে অনুষ্ঠিত হয় গোষ্ঠমেলা। বর্তমানের অন্যতম জনপ্রিয় গায়ক সত্যরঞ্জন মণ্ডল আছেন এই উদ্যোগের মূলে। শ্রী মণ্ডলের অনুরোধে এখানেও তিনি জড়িত আছেন প্রথম থেকেই।

লোকশিল্পীদের প্রতিভার বিকাশ, লোকগানের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি জীবনের বহু মূল্যবান সময় নিয়োজিত করেছেন। খ্যাত, অখ্যাত, সাধারণ, অনন্য, দূর-দুরন্তের নানা শিল্পী, গবেষক, কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের চেষ্টা, তাদের নিয়ে অনুষ্ঠান ও আন্দোলন সংগঠন করা, বিভিন্ন মেলা ও মঞ্চে তাদের সুযোগ করে দেওয়া, দুস্থ শিল্পী ও কর্মীদের বেশি বেশি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগদানের মাধ্যমে কিছু আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা--- এরকম অলাভজনক ও শ্রমসাধ্য বিস্তৃত কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন দীর্ঘকাল ধরে।

বহিরগাছিতে একটি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রয়াস ছিল তাঁর বহুদিনের। নিজে বিদ্যালয়ের দায়িত্বে থাকাকালীন পুরনো পাশ করা ছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষিকার দায়িত্ব দিয়ে বেশ কিছুকাল অস্থায়ী বালিকা বিদ্যালয় চালিয়েছিলেন। কিন্তু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না মেলায় ছাত্রীদের সেই স্বেচ্ছাসেবা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অনেক পরে হলেও শেষপর্যন্ত যে সেটা চালু করা গেছে, এটা তাঁকে পরম স্বস্তি দেয়।

বহিরগাছিতে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র খোলাতেও কার্যকরী উদ্যোগ ছিল তাঁর। বিদ্যালয়, রেলস্টেশন স্থাপনের উদ্যোগের পাশাপাশি তিনি গ্রামবাসীর অনেকের সঙ্গে মিলে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন বহিরগাছিতে হাট ও বাজার পত্তনেও। পোস্ট-অফিস চালু করার জন্য ডাকবিভাগের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার চিঠিপত্র, আবেদন নিবেদন করেছেন, বড়োকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে বিরাট সংখ্যক মানুষের সমস্যার কথা উত্থাপন করে তদবির করেছেন। এখন যদিও পোস্ট-অফিসের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে, কিন্তু উপযোগিতা এখনও বহাল আছে। বহিরগাছির তাঁতসমিতি গঠনেও তাঁর ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। প্রথম দিকে কিছু সাফল্য পেলেও পরের দিকে অযত্ন, কাজে ঢিলেমি ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতির ফলস্বরূপ চুরির ঘটনায় কর্মকাণ্ডটি মুখ থুবড়ে পড়ে। একসময় বহিরগাছিতে সমিতি ছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগের তাঁতও ছিল। নানা কারণে সে সবের পাটও উঠে গেছে।

সাফল্যের পাশাপাশি ব্যর্থতাও আসে। অবিমিশ্র সফলতা কারও জীবনেই সম্ভব না। একসময় এলাকায় একটি ভালো গ্রন্থাগারের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। একাধিকবার আংশিক সাফল্য এলেও শেষ পরিণতিতে সেটা আলোর মুখ দেখতে পারেনি। মানুষের পাঠাভ্যাসের প্রতি অনীহাও অন্যতম কারণ হতে পারে। একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা ছিল তাঁর বহুদিনের। জনগণের দাবিও ছিল। নানা কারণে সেটিও ফলবতী হতে পারেনি। স্বাস্থ্যকেন্দ্র গঠনের চেষ্টাও নানাকারণে সফল হতে পারেনি। কাছাকাছি দুটি জায়গা আড়ংঘাটা ও বগুলাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালের অবিস্থিতি জানিয়ে কর্তৃপক্ষের হাত তুলে দেওয়াও অনেকটা দায়ী।

অবাক হয়ে ভাবতে হয়, ১৯৫৫-৫৬ সালের সেই ছাত্রজীবনের সময় থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত এই বিরাট সময়ের চালচিত্রে কলকাতা সংস্কৃতি-জগতের খ্যাতিমান প্রায় এমন কেউ নেই যার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ রায়ের পত্রালাপ বা যোগাযোগ ঘটেনি। বাংলাদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপকদের সঙ্গ আলাপ প্রায় আত্মীয়তার পর্যায়ে চলে গেছে। ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ থাকে তাঁদের সঙ্গে। বহু স্থান থেকে বহু অভ্যর্থনা ও সম্বর্ধনা পেয়েছেন। প্রশংসা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আশীর্বাদ, স্নেহ, প্রশ্রয় পেয়েছেন বহু সাধারণ ও দিগগজ মানুষের কাছ থেকে। রাতেরপর রাত জেগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও রূপায়নের চেষ্টায় কখনও কখনও অব্যবস্থা, বিরোধ, অশান্তির উপক্রম যে ঘটেনি, তা নয়। ঘটেছে, শেষপর্যন্ত সমাধানও বেরিয়ে এসেছে। যারা একসময় বিরূপ ছিল তাঁরা আবার সঙ্গ দিয়েছে। অনুষ্ঠান তো আনন্দদানের জন্যই। আনন্দলাভেই তার সার্থকতা। শ্রোতা, দর্শক, শিল্পী সকলেই আনন্দলাভ করছেন কি না এটাই আসল কথা। কাজে নেমে দেখেছেন, অনেকেই নানারকমভাবে সহযোগিতা করছেন। স্বেচ্ছায় শ্রম দিতে এগিয়ে এসেছেন বহু নবীন প্রবীণ চেনা ও অচেনা শত শত মানুষ। তা দেখে নিজেকে আশ্বস্ত করেছেন এই ভেবে যে, জীবনটা তাহলে নেহাত পণ্ডশ্রমে গেল না!

পল্লবকান্তি বিশ্বাস: তাঁর জীবনের আচরণের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে যায়

বহিরগাছি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলাম শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে। স্যার স্কুলে প্রবেশের সাথে সাথে হাজারও শিক্ষার্থীর গমগমে আওয়াজ নিমেষে হয়ে যেত একেবারে পিনড্রপ সাইলেন্স। গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাশাপাশি প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী স্যারকে করতেন যথেষ্ট সমীহ। সহশিক্ষকের অনুপস্থিতিতে তিনি ফাইভ থেকে টুয়েলভ যে কোনো ঘরে ক্লাস নিতে ঢুকে যেতেন। তখন যদি ভূগোল ক্লাস থাকত তিনি ভূগোল পড়াতে শুরু করে কখন যে ইতিহাসে ঢুকে দর্শন হয়ে ইংরেজি থেকে বাংলা সাহিত্য রূপকথার মত পড়িয়ে যেতেন আর আমরা অভিভূত হয়ে শুনতাম পঁয়তাল্লিশ মিনিট যেন পাঁচ মিনিটেই শেষ হয়ে যেত। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে ছিলেন ভীষনভাবে গ্রহণযোগ্য। এলাকায় তিনি এত জনপ্রিয় যে, হেন কোনো বাড়ি ও অনুষ্ঠান নেয় যেখানে তিনি আমন্ত্রিত হন না। হেড মাস্টার মশাইয়ের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, এলাকার সার্বিক উন্নয়নে ও উত্তরণে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। বহিরগাছি এলাকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক লোক সাহিত্য -সংস্কৃতির উন্নয়ন ও উত্তরণে কমরেড পান্নালাল দাসগুপ্তের আদর্শে অনুপ্রাণিত শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে বহিরগাছির ইতিহাসে লেখা থাকবে।

মনে পড়ে নব্বইয়ের দশকে কোন এক হাট বারের দিনে বহিরগাছি ষ্টেশন চত্বরে তথাকথিত নকশালদের গোলা-গুলিতে যখন হাটমুখী অসংখ্য লোক ভয়ে পিছন দিকে পালাচ্ছে, তখন একা সৎ-সাহসী যতীন্দ্রনাথ রায় বুক চিতিয়ে সামনের দিকে খালি হাতে নকশালদের মোকাবিলা করতে এগিয় চলেছেন। এলাকার চোর, ডাকাত, বদমাস, নামধারী নকশাল পর্যন্ত হেড মাস্টার যতীন্দ্রনাথ রায়কে যেমন ভয় পেত তেমনি সমীহও করত। মাথা উঁচু করে তাদের কথা বলার সাহস ছিল না।

সাহিত্য সংস্কৃতির আঙিনায় পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গে দুই বাংলাতে তার অগ্রজ, সমসাময়িক ও অনূজ বিখ্যাত গুণীজনদের সাথে ছিল/আছে তার গভীর ও আন্তরিক সম্পর্ক। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে যেমন ছিল আড্ডা, জয় গোস্বামীর সাথে চলে মঞ্চ শেয়ার, কবীর সুমনের পাশে বসে বক্তব্য রাখা। শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারেকে নিয়ে বাংলাদেশ ভ্রমণ। যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর বহিরগাছি আগমন ও অন্নদাশঙ্কর রায়ের কদমখালির বাউল মেলায় আগমন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী সাথে সপ্তাহন্তে ফোনালাপ। একটি প্রত্যান্ত গ্রামে বসবাস করে এইরকম অজস্র বিদগ্ধ ব্যাক্তিবর্গের সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারার পেছনে রয়েছে তার অসাধারণ মেধা, প্রচুর পড়াশোনা ও বহুমুখী জ্ঞান ও নিরলস পরিশ্রম।

একাধিক পত্র-পত্রিকার সম্পাদনার পাশাপাশি বহিরগাছি ও কদমখালিতে দুই বাংলার মহান শিল্পী সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক মানের সফল বাউল মেলার সংগঠক এছাড়া বেতার ও দূরদর্শনে লোক সাহিত্য চর্চা ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের কথক হিসেবে তিনি বিশেষ সুপরিচিত।
যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বহিরগাছি তথা দুই বাংলার গর্ব। আমি মাষ্টার মশায়ের দীর্ঘায়ূ ও সুস্হ সবল জীবন কামনা করি।

বাণী সরস্বতী: শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায়কে যেমন দেখেছি ও জেনেছি

শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায় - তাঁকে আমি চিনি যখন থেকে সত্তরের দশকে প্রয়াত সমাজ বিপ্লবী ও চিন্তানায়ক পান্নালাল দাশগুপ্ত রানাঘাট ২নং সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারের অন্তর্গত বরণবেড়িয়া গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে Comprehensive Area Development Project (CADP) শুরু করেন যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দশ হাজার একর চাষ জমি এলাকায় কৃষিভিত্তিক সামগ্রিক উন্নয়নের কাজ। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রায়ই দত্তপুলিয়ায় আলোচনা সভা হত। সেই সময় যতীনবাবু এই সভায় যোগ দিতেন। তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়। তিনি CADP-র কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। এরপর থেকে আমাদের যে কোনো অনুষ্ঠানে তাঁকে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানাতাম। তিনি সুবক্তা। আজও তাঁর যে কোনো বক্তৃতা যথেষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ হয়।

জন্ম ২ অক্টোবর, ১৯৩৯, যশোর, অধুনা বাংলাদেশে। মাতা তুলিরাণী রায়, পিতা কৃষ্ণলাল রায়। তাঁর বর্তমান নিবাস নদিয়ার বহিরগাছি গ্রামে। সেখান থেকে তাঁর বিদ্যালয় শিক্ষা হয় আড়ংঘাটা উপেন্দ্র মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ে। এরপর তিনি রানাঘাট ও স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে ইন্টার মিডিয়েট পাশ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনীস ও এম.এ. পাশ করেন। তিনি ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বহিরগাছি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর এই ৮৫ বছর বয়সেও ইচ্ছা একটি মেয়েদের বিদ্যালয় এবং একটি পার্ক তৈরি করা।

তিনি একজন লোকায়ত সংস্কৃতির সংগঠক ও লেখক। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন এবং এই বয়সেও পালন করে চলেছেন। নদিয়া জেলার ভীমপুর আসাননগরে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালন মেলা সমিতি। শ্রীরায় প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। মেলার সম্প্রসারণে ও উন্নয়নে কার্যকরী সভাপতি ও সভাপতি হিসাবে ১৯৯০ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছেন এবং মেলা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবতাবাদের বাণী পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। শ্রীমা মহিলা সমিতি থেকে প্রতিবছর ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ থাকত এবং আমরা ঐ মেলায় যোগদান করেছি।

বিখ্যাত বাউল প্রয়াত বিজয় সরকারের জন্মোৎসবেও দীর্ঘদিন যুক্ত এবং ভূমিকা পালন করেছেন এবং বিশেষ করে জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং বাংলাদেশে গিয়ে মহসিন হোসাইন, খোন্দকার রিয়াজুল হক, নিরঞ্জন অধিকারী, কৃষ্ণকীর্তন দাস, মীনা বড়ুয়া এঁদেরকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত করার ক্ষেত্রে এবং কার্যকরী সভাপতি হিসাবে গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে ফিরদৌসি রহমান, নাসিদ কামাল, নাদিরা বেগম, রওশান আলি, সইফুল ইসলাম ও আসাম ও ত্রিপুরার শিল্পীদের এবং মাননীয় মন্ত্রী অনিল সরকার ও সুভাষ চক্রবর্তী সকলের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়।

লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত বিষয়ে অবিরাম যোগাযোগ- সংহতিস্থাপন ও উভয়বঙ্গের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন এবং বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে লোকশিল্পীদের সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য কার্যকর ভূমিকা অতীতে ও বর্তমানেও পালন করে চলেছেন। শ্রী রায় প্রবন্ধ এবং গবেষণামূলক লেখাতেও সিদ্ধহস্ত। কম্পাস ও অন্যান্য পত্রপত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। লালন স্মারকগ্রন্থের দীর্ঘদিন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং শঙ্খচিল পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করে চলেছেন। উৎসবভূমি, বানীপুর লোক উৎসব স্মারক, যুব উৎসব স্মারক ও বাংলাদেশের ইস্পাত সাপ্তাহিক ও অন্যান্য পত্রিকায়ও তার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

দলিত সাহিত্য, বিশেষত লোকায়ত সাহিত্যের এবং লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ, কবিগান, লোককবি সংস্থা গঠন, মতুয়া আন্দোলন, গুরুচাদের বাস্তব কর্ম্মমুখী যুক্তিবাদী শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিবেশ বিষয়ক চিন্তাধারা প্রচারে ও প্রসারে সক্রিয় ভূমিকায় আছেন।

আকাশবাণী কলকাতায় বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচক ও কথক হিসাবে অংশগ্রহণ করেছেন। দূরদর্শনের একটি টিম নিয়ে বহিরগাছি ও তারকনগরে গাজন ও অষ্টকের দৃশ্য কলকাতার দূরদর্শনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় তাঁর উদ্যোগে। শ্রীরায় উভয়বঙ্গেই বিভিন্ন সময়ে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হয়েছেন।

তিনি প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ে কাজ করেছেন। ১৯৮০ সালে বহিরগাছি গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা নামে একটি সংস্থা তৈরি করেছেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন জায়গা প্রধানত শ্রীমা মহিলা সমিতি থেকে গাছের চারা সংগ্রহ করে ঐ সংস্থার জমিতে লাগান। খাল-বিল-নদী সংস্কার নিয়েও শ্রীমা মহিলা সমিতির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা এখনও আছেন। চন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে কলমার বিল সংস্কারে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন।

সমাজের বহু বুদ্ধিজীবি মানুষ যেমন- গৌরকিশোর ঘোষ, গৌরী আয়ুব, অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রমুখের সঙ্গে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক গৌর কিশোর ঘোষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। গৌর কিশোর ঘোষের স্ত্রী প্রয়াত নীলা ঘোষ শ্রীমা মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সেই সূত্রে আমরা তাঁদের বাড়িতে যেতাম এবং তাঁর বাড়িতে যতীনবাবুকে প্রায়ই যাতায়াত করতে দেখতাম। গৌর কিশোর ঘোষ-এর লেখা তিনটি

১. প্রেম নেই

২. জল পড়ে, পাতা নড়ে

৩. প্রতিবেশী

গ্রন্থগুলি পাঠ করে তিনি অবিভূত হন। তাঁর সম্বন্ধে স্থানীয় শঙ্খচিল পত্রিকায় দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। বর্তমানে তাঁর ইচ্ছে আছে গৌর কিশোর ঘোষকে নিয়ে একটি পৃথক গ্রন্থ লেখার।

বহিরগাছির উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায় যখন প্রধান শিক্ষক পদে আসীন ছিলেন সেইসময় ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রী-ছাত্ররা অনেক কিছু তাঁর কাছ থেকে শেখার ও দেখার সুযোগ পেয়েছে এবং আশাকরি যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে সেই শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া তাদের কর্তব্য। সেই কর্তব্য তারা নিশ্চই পালন করছে।

আমরা শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায়- যিনি একাধারে শিক্ষক, লেখক, সমাজসেবী, লোক-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক তাঁর সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। তাঁর মতো ব্যক্তির সমাজের জন্য অতি প্রয়োজন।

বাসুদেব মোশেল: একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়

একটি গাঁয়ের মানুষকে শহরে এসে বহু বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কোনো বিষয়টি মধুরে মধুর। আবার কোনো কোনো বিষয় নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়েছে। জীবনের না দেখা, না জানা বিষয় তাকে বিস্মৃত করেছে, আর সেই বিস্মৃত চোখে খুঁজে পেয়েছে বহু বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় ___যাকে বলা চলে ভালো মানুষের দেখা পাওয়া আর কী! ভালো মানুষের অর্থ অনেক হতে পারে। কিন্তু যে মানুষটির মধ্যে মাথার চুল থেকে নখ পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় তাকে তো কেবল মানুষ বলা যায় না। বলা যায় ঘুরিয়ে প্রিয়েরে দেবতা করি, দেবতারে প্রিয়ে। গ্রাম্য মানুষটির সঙ্গে আর একটি গ্রাম্য মানুষের পরিচয় হয়ে যায়___যে মানুষটি ছিলেন মানুষেরই বন্ধু। নিজে শিক্ষক তিনি সেই শিক্ষার আদর্শ নিয়ে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গনে ছুটে ফিরেছেন আজীবনকাল একটা লক্ষ্য বাঙলা ও বাঙালির লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিকে রক্ষা করাএবং করতে হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে জাতির সংস্কৃতিক ঐতিহ্য নেই সে জাতি কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। সংস্কৃতি মানুষকে পরিশীলিত করে,সতের সন্ধানে , আত্মানু সন্ধানের পথ দেখায়,সে পথ সহজ পথ নয়,সে পথের যাত্রী হতে হলে ___ত্যাগ ও তিতিক্ষা একটা বড়ো বিষয়। সংস্কৃতি চর্চা মানে একটা আত্মত্যাগ , যেখানে স্বার্থলেশহীন একটি আদর্শ ও লক্ষ্য থাকবে। এমনই একজন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল যতীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে। যাকে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে মূল্যায়ন করা একটি অসম্ভব ব্যাপার। সেই গ্রাম্য মানুষটির শ্রদ্ধা যতীনবাবুর প্রতি যতীনবাবু আপনার ভালোবাসা ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ

এক অনুজের কেবল প্রণতি নয় ,আপনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণে যেন আপনার পাশে থাকতে পারে এবং চায়ও। সেদিন ও ছিল আজও আছে ,সেই আপনার সঙ্গে ঢের আগে পরিচিত গ্রাম্য মানুষটির। আজীবনকাল যতীনবাবুর অপরিশোধ্য ঋণের কথা স্মরণ করে জানাবে _"ভূয়োহপি, নমো নমস্তে।"

বিপ্লব বিশ্বাসঃ মানুষ গড়ার কারিগর যতীন্দ্রনাথ রায়

'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক
আর কিছু নয়
এই হোক শেষ পরিচয়'।

---**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

যিনি কবিগুরুর এই কথাকে অবলম্বন করে জীবনের এতটা পথ পেরিয়ে এলেন, যিনি একজন মানুষ গড়ার কারিগর হয়েও সমাজকে সুন্দর করে তোলার দায়িত্ব আজও সমানভাবে পালন করে চলেছেন; তিনি আর কেউ নন, আমার এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধার মাস্টারমশাই শ্রদ্ধেয় শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়। মাস্টারমশাই বহিরগাছি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন আরও একটি বালিকা বিদ্যালয় হোক। শিক্ষকতার দায়িত্ব কর্তব্যে তিনি ছিলেন অটল। যার কারণে গ্রামের প্রত্যেকটা পরিবার মাস্টারমশাইকে অনাবিল ভালোবাসার বাঁধনে বেঁধে রেখেছেন আজও।

সেই সময়ে আমরা দেখতে পাই তিনি তাঁর সহশিক্ষক এবং বেশ কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গুণীজনের সাথে আপামর বহিরগাছি, প্রতাপগড় এলাকার সকলের অর্থ অনুদানে তিনি বেশ কিছুটা জমি কিনেছিলেন। যার দ্বারা বহিরগাছিতে 'গ্রাম উন্নয়ন সমিতি' আগেই গঠন করেছিলেন। সেই 'গ্রাম উন্নয়ন সমিতি'র নামে তিনি সমস্ত জমি কিনে রাখেন। আজ বর্তমানে সেই জমিতেই 'বহিরগাছি বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়েছে। সেটা আমাদের কাছে ভীষণ গর্বের।

মানুষের জীবন বাঁচাতে জল প্রকল্পের মতো মহৎ কাজ করেছেন তিনি। বর্তমানে কমিউনিটি হলের কাজও চলছে তাঁরই উদ্যোগে। মহিলা সমিতিকে মহিলা উন্নয়নের জন্য জমি দান করেছেন এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গঠনে তিনি শত চেষ্টা করেও কিছু করতে পারেননি, এটাই তাঁর জীবনের বড়ো আক্ষেপের কারণ।

কাজের মানুষকে কাজ খুঁজতে হয় না। কাজই তাদেরকে ঠিক খুঁজে নেয়। মাস্টারমশাই চিরকালই সাধারণের মাঝে নিজের সুখ দুঃখ ভাগ করে নিতে ভালোবাসেন। মাটির গন্ধ এবং শিকড়ের টান তাঁর মাঝে খুব শান্তির প্রলেপ দেয়। তাঁকে দেখে বারবার বুঝেছি, গ্রামীণ শিল্পকলাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে দেখে এসেছেন। তাই আজ থেকে কিছু বছর আগে মাস্টারমশাই লোকায়িত সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেন তৎকালীন আরও কিছু সৃষ্টিশীল শিক্ষা বিদগণের হাত ধরে শুরু করেন অন্য এক পথচলা। এই পথ চলাতে তিনি সহ অন্যান্য গুণীজনেরা সকলে মিলে বাংলার দুই বঙ্গের মধ্যে এক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির কাজে নিজেদেরকে নিযুক্ত করেন।

তিনি চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছেন মানুষের মাঝেই ঈশ্বর বিরাজমান। এই বিশ্বাস বা এই বাণী বহু বছর আগে যিনি প্রচার করেছেন তিনি হলেন দুই বঙ্গের মানুষদের শ্রদ্ধার প্রাণপুরুষ বাউল সম্রাট শ্রদ্ধেয় লালন সাঁইজি। যাঁর বাণী শুনলে সাধারণ একটা কাঁচও হিরে হয়ে যেতে পারে। মনে পড়ে যায় সেই পঙক্তি — 'মানুষ ভুজলে সোনার মানুষ হবি'।

এই বাণীকে আদর্শ করে শুরু করলেন ইংরেজি ১৯৯০ সালে লালন ফকিরের প্রয়াণ দিবসে ভীমপুর আসাননগরে লালনমেলা। তিনি আর পাঁচ জনের মতোই একজন সদস্য হলেন, কিন্তু সেটাই বা কম কীসের! একটা এত বড়ো সৃষ্টির সাক্ষী তো হতে পারলেন। এইভাবেই বাংলার ভিন্ন প্রান্তে বাংলার সৃষ্টিকে ঘরে ঘরে পোঁছে দেওয়ার কাজে ব্রতী হলেন।

একটা সময় নিজেও মাটির গন্ধ গায়ে মেখে চলতে চলতে পোঁছে গেলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কেউটিয়া গ্রামে। সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করলেন আরও এক নতুন অধ্যায়। কানে ভেসে আসা সেই বাস্তবের কথা এবং সুর-

'এই পৃথিবী যেমন আছে, তেমনই ঠিক রবে,
সুন্দর এই পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে'।

মরমী কবি বিজয় সরকারের এই কথাকে সাথী করে নিজের পায়ের তলার মাটিকে আরও একবার বাস্তবের মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। পরিচয় করতে পৌঁছালেন সরকার মহাশয়ের নিজ বাসভবনে। জানলেন, শুনলেন অনেক কিছু; সবশেষে তাঁর কোথাও গিয়ে মনে হল- কদমখালিতে যে কর্মযজ্ঞের সাক্ষী তিনি রইলেন, তারই বীজ যদি এই দুই প্রাণ পুরুষের স্মৃতিতে উদ্দেশ্যে বহিরগাছিতে বপন করা হয়! আর সেই বীজ থেকে যদি সুন্দর চারা গাছ জন্মায়, তাহলে তার ছায়া ফল সবটাই এই বহিরগাছির মানুষ পেয়ে ধন্য হবে। কথাটা শুধু চিন্তার মাঝে আটকে না রেখে সত্যি সত্যিই ইংরেজি ২০১২ সালে বহিরগাছিতে 'বিজয় লালন মেলা' নামক বীজটি বপন করলেন। যে ফলের মিষ্টি স্বাদ আমরা এবং সকল গ্রামবাসীরা আজও উপভোগ করে চলেছি।

এই মেলার মধ্য দিয়ে দুই বঙ্গের মানুষের একটা মেলবন্ধন তৈরি করতে পেরেছেন। সকলে দেখে, আর বলে- এ যেন বিনি সুতোর মালার মতো। মেলার প্রথম দিন থেকে ছাত্র হিসেবে আমরা মাস্টারমশাইয়ের সাথে ছিলাম, এখনও আছি। কারণ আমার ব্যক্তিজীবনে উনি আমার কাছে একটা বটবৃক্ষের মতো। যাঁর ছায়ার আশ্রয় পেয়ে ভীষণ আনন্দিত এবং গর্বিত আমি। তিনি মেলা চলাকালীন হঠাৎ করেই বয়সের ভার এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমাদের হাতে তাঁর এই কর্মযজ্ঞের ভার তুলে দিতে চান। সেই দায়িত্ব পেয়ে আমরা ভীষণ ভাবে আপ্লুত। কারণ একজন গুরু কতটা বিশ্বাস করলে তাঁর সৃষ্টিকে ছাত্রদের হাতে তুলে দিতে পারেন।

আজ প্রায় নয় বছর হতে চলল, আমরা আমাদের ঐক্যবদ্ধ সংস্থা যার নাম 'বহিরগাছি লাফিং ক্লাব'। সেই সংস্থা দ্বারা এই কর্মযজ্ঞ পালন করে আসছি। এটা করা সম্ভব হয়েছে মাস্টারমশাইয়ের আশীর্বাদ এবং সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের, গ্রামবাসীদের ভালোবাসা ও সহযোগিতার ফলে। এই জন্য আপনাদের কাছে আমরা যারা আছি সকলের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। শেষে একটা কথা বলি- এমন একজন শিক্ষককে পেয়ে আমরা ধন্য। কবিগুরুর ভাষায় এই কথাটা বলেই আমার

কথার ইতি টানতে চাই-

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে'।

ভালো থাকুন মাস্টারমশাই।

ডঃ বিরাট বৈরাগ্য, ডি লিট : লোকসংস্কৃতিচর্চায় প্রখ্যাত গবেষক শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায়ের ভূমিকা

বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি সংগঠক সমাজকর্মী যতীন্দ্রনাথ রায় বাংলাদেশের যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার অধীন রাধাকান্তপুর গ্রামে ২ অক্টোবর, ১৯৩৯ জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও এম. এ. পাশ করেন। দীর্ঘদিন তিনি বহিরগাছি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং এখনও প্রবীণ বয়সে সমাজের নানা কাজে ব্যস্ত আছেন।

শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ রায় লোকসংস্কৃতির নিষ্ঠাবান গবেষক ও সংগঠক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির জন্য লালায়িত নন। সারা জীবন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকেও সারা জীবন লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজীবন গবেষণা করে চলেছেন। লোকসংস্কৃতি চর্চায় তাঁর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এপার বাংলা ওপার বাংলার বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়, বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ড. আবু হাসান চৌধুরী, ড. জলিল সাহেব, সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ। লোকসংস্কৃতি চর্চা ও গবেষণার সূত্রেই তাঁর পরিচিতি বিদগ্ধ মহলে। সাধারণ মানুষ থেকে সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। সবালাপী, বিনয়ী এই মানুষটিকে সকলেই শ্রদ্ধা করেন। বাংলার বাউল, অষ্টক গান, লালনগীতি, কবিগান, মতুয়া ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য সংস্কৃতির দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত। উক্ত বিষয়গুলি যাতে সকলের মধ্যে প্রচারিত হয় তার জন্য তিনি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন।

তিনি লালনগীতি ও বাউল গান যাতে উভয় বঙ্গে প্রচারিত হয় তার জন্য তিনি নদিয়া জেলার ভীমপুর-আসাননগারে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালন মেলা সমিতি'। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। মেলার সম্প্রসারণে ও উন্নয়নে কার্যকরী সভাপতি ও সভাপতি হিসাবে ১৯৯০-২০০৮ এবং ২০১৮-২০১৯ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছেন এবং মেলার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবতাবাদের বাণী পৌঁছে দিতে শ্রী রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

কবিগানের প্রচার ও প্রসারে গবেষক যতীন্দ্রনাথ রায়ের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি লোককবি বিজয় সরকারের জন্মোৎসবে দীর্ঘদিন যুক্ত থেকেছেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষ করে বিজয় সরকারের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং বাংলাদেশে গিয়ে মহসিন হোসাইন, খন্দকার রিয়াজুল হক, নিরঞ্জন অধিকারী, কৃষ্ণকীর্তন দাস, মীনা বড়ুয়া এঁদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত করার ক্ষেত্রে এবং কার্যকরী সভাপতি হিসাবে গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীকালে লোককবি বিজয় সরকার স্মারক সমিতির

সভাপতি হিসাবে ২০০২-২০১৮ পর্যন্ত ফেরদৌসী রহমান, নাসিদ কামাল, নাদিরা বেগম, রওশন আলী, সাইফুল ইসলাম এবং আসাম ও ত্রিপুরার শিল্পীদের এবং মাননীয় মন্ত্রী অনিল সরকার (ত্রিপুরা) এবং সুভাষ চক্রবর্তী সকলের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে কবিপুত্র শ্রীকাজল অধিকারী ও যতীন্দ্রনাথ রায়ের ভূমিকা প্রশংসনীয়। শ্রী রায় উভয়বঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য স্থানে অংশগ্রহণ করে সম্মানিত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা EZCC CRI এবং বিভিন্ন স্থানে।

গবেষক যতীনবাবু কবিগানপ্রিয় মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের কবিগান যতটা বিদগ্ধ মহলে প্রচারিত হয়েছে ততটা পূর্ববঙ্গের কবিগান প্রচারিত হয় নি বলে যতীনবাবু সারা জীবন ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়, ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ড. শক্তিনাথ ঝা, ড. বিরাট বৈরাগ্যের সঙ্গে আলোচনা করে নানা পরিকল্পনা করে পূর্ববঙ্গের কবিগানের ধারার কবিদের নিয়ে আলোচনা সভায় যেমন বক্তব্য রেখেন তেমনি বিজয় সরকারের নামাঙ্কিত সংগঠনে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

অষ্টক লোকসংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা যা বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে কয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়, ড. বিরাট বৈরাগ্য এবং আরো কয়েকজন। সংগঠনগুলির মধ্যে উল্লেযোগ্য নদিয়া জেলার গাড়াপোতা গ্রামের বৈশাখী অষ্টক মেলা কমিটি। পঞ্চাশ বৎসরের বেশি গাড়াপোতাতে অষ্টক গান সাড়ম্বরে পরিবেশিত হয়ে চলেছে। এই কমিটির সঙ্গে মাননীয় যতীন্দ্রনাথ রায় ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। অষ্টক গান যাতে দূরদর্শনে প্রচারিত হয় তার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। অষ্টক গান যাতে বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে প্রচারিত হতে পারে তার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এখনও এই লুপ্তপ্রায় ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি কাজ করে চলেছেন। অষ্টক গান, কবিগান, মতুয়া ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমার সঙ্গে পরিচয় ঘটে শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে। আমার গবেষণা কর্মে প্রতিনিয়ত নানা তথ্য দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত বিষয়ে অবিরাম যোগাযোগ, সংহতি স্থাপন ও উভয়বঙ্গের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন করে চলেছেন শ্রী রায়। প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক রচনাতে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। লালন স্মারকগ্রন্থের দীর্ঘদিন সম্পাদকের দায়িত্ব ও শঙ্খচিল সাহিত্য পত্রিকার দায়িত্বও পালন করেছেন ৩৬ বৎসর। দলিত সাহিত্য বিশেষত লোকসাহিত্য এবং লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ, লোককবি সংস্থা গঠন, মতুয়া আন্দোলন, গুরুচাঁদ ঠাকুরের বাস্তব কর্মমুখী যুক্তিবাদী শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবেশ বিষয়ক চিন্তাধার প্রচার ও প্রসারে তাঁর অনবদ্য ভূমিকা লক্ষ করা যায়। আকাশবাণী কলকাতায় বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। দূরদর্শনের একটি টিম নিয়ে তিনি বহিরগাছি ও তারকনগরের গাজন এবং অষ্টক পালা অভিনয় দুরদর্শানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। তিনি এ পর্যন্ত নানা পুরস্কার ও সংবর্ধনা লাভ করেছেন।

(--সংক্ষেপিত)

ভূষণচন্দ্র বিশ্বাস: স্মৃতিচারণ

রানাঘাট স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া স্টাফ কো-অপারেটিভ হাউজিং অ্যান্ড ল্যান্ড মর্টগেজ সোসাইটি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্যামল ভৌমিক। তিনি রানাঘাট এসবিআই স্টাফ সংগঠনের মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। ১৯৭৩ সালে সমিতি গঠনের পরে শ্যামল ভৌমিক কল্যাণীতে সমিতির সদস্যদের জন্য জমি ক্রয় করে ফ্ল্যাট তৈরির কথা চিন্তা করেন। ফ্ল্যাটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা বলেন। তিনি বলেন স্বনামধন্য ব্যক্তি ও বিশিষ্ট সমাজসেবক পান্নালাল দাশগুপ্ত। সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ রায় ছাড়া তাকে নিয়ে আসার মতো কারো যোগাযোগ ছিল না। তাই সাহিত্যিক ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়কে অনুরোধ করেছিলেন পান্নালাল দাশগুপ্ত ও বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত সম্মানীয় আব্বাস হোসেন চৌধুরিকে উপস্থিত থাকার জন্য। যতীন্দ্রনাথ রায় যথাসময়ে তাদের দুইজনকে নিয়ে এসে ফ্ল্যাটের শিলান্যাস করেছিলেন। বলা বাহুল্য এদিকে যতীন্দ্রনাথ রায় ও শ্যামল ভৌমিক দুইজনেই ছিলেন একই সঙ্গে কৃষ্ণনগর গভমেন্ট কলেজের অধ্যাপক তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্বর্গীয় সুধীর চক্রবর্তীর ছাত্র। সৌভাগ্যক্রমে আমি তখন সেই ঐতিহ্যবাহী সমিতির সম্পাদক। সেইদিন দেখেছি সমিতির সদস্যদের উপচে পড়া ঢল। দেখেছি মঞ্চে উপবিষ্ট পান্নালাল দাশগুপ্ত আব্বাস হোসেন চৌধুরি সুধীর চক্রবর্তী যতীন্দ্রনাথ রায় ও শ্যামল ভৌমিক প্রমুখ ব্যক্তিদের। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন। তাদের আগমনে আমাদের সকলের মানসিক পরিধি বিস্তারে সহায়তা করেছিল। আর যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের এই অনবদ্য প্রয়াসে আমরা সকলে ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য।

মণীন্দ্রকুমার সরকার: আমার দেখা যতীনদা

এই মরজগতে নিজের সুকর্মের ফলে অনেক মহাজন ব্যক্তি অমরার সৃষ্টি করতে পারেন। স্বীয় সৎকর্মের ফলে সমাজে অমর হয়ে থাকেন। যতীন দা, মানে যতীন্দ্রনাথ রায়। বহিরগাছি গ্রামের বাসিন্দা। বহিরগাছি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক। শিক্ষক হিসেবে তিনি সার্থক প্রধানশিক্ষক ছিলেন। সহকর্মীদের সঙ্গে ভাতৃসম্বন্ধ নিয়েই চলতেন। ছাত্রছাত্রী ছিল তাঁর কাছে সন্তান স্বরূপ। গরিব দুঃখী ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য সহ বিভিন্নভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা বহিরগাছি উচ্চ বিদ্যালয়টিকে উচ্চতর বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। প্রতি বৎসর বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। যেমন যাত্রা থিয়েটার পুতুল নাচ এই জাতীয় শিল্প নিয়ে অনুষ্ঠান করতেন। তিনি একবার তাঁর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাংলার লোক কবিদের আমন্ত্রণ করে এনে তিনদিনের গানের আসর ও আলোচনা সভার ব্যবস্থা করেন। সেখানে লোককবিদের অভাব অভিযোগ সুবিধাঅসুবিধা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। এইসব শিল্পীদের কীভাবে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত করা যায় তার জন্য বিশেষভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। অনেক কণ্ঠশিল্পী যন্ত্রশিল্পী সরকারি অনুদানও পেয়েছেন। তিনি বাংলার পুতুলনাচ শিল্প নিয়েও অনেক কাজ করেছেন। লুপ্তপ্রায় পুতুল নাচকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এর জন্য নদিয়া জেলার বগুলার মুড়া

গাছা ও করিমপুরে তাকে অনেকবার যেতে হয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অকৃতদার। পিতামাতা ভাইবোন ও ভাইপোদের ঘিরে ছিল তাঁর সংসার। যৌথ পরিবারের এক আদর্শ বাড়িতে হালচাষের ব্যবস্থা করেন। মাঠে ছিল বিরাট আবাদ। পুকুরে মাছের চাষ। বাগানে ফলফুল সবজি চাষ। পরবর্তীকালে অবশ্য তাঁর সংসার ছোটো হয়ে যায়। কিন্তু এত কিছু থাকতেও সংসারের বাঁধন তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। তিনি বহির জগতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান লালনমেলা।

১৯৯০ সালে ভীমপুর আসাননগরের কদমখালি মহাশ্মশানের পাড়ে লালনবেদি স্থাপিত হয়। এবং প্রতি বছর লালনমেলা নামে বিশাল মেলা বসে। প্রথম থেকে এই রাজ্য লালনমেলা কমিটির কার্যকরী সভাপতির আসন গ্রহণ করে নিরলসভাবে কর্ম করে যান। সভাপতি মানিক সরকারের প্রয়াণের পর এই কমিটির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কয়েক বছর উক্ত পদে আসীন থাকেন। তিনি এপার বাংলা ও ওপার বাংলার মেলবন্ধন স্বরূপ। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ওপার বাংলার বিশিষ্ট লালনপ্রেমিক ব্যক্তিগণ লালন মেলায় যোগদান করতেন। তাঁর মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রফেসর আবুল আহসান চৌধুরির নাম উল্লেখযোগ্য। ওপার বাংলা থেকে প্রায় ৩০০ থেকে ৩৫০ বাউল ফকির এই মেলায় যোগদান করেন। বর্তমানে বয়সের ভারে তিনি আর মেলা কমিটিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারেন না। তবে এখনও তাকে তুই একদিনের জন্য মেলায় যোগদান করতে দেখা যায়। লালন মেলার আকর্ষণ এখনও কাটাতে পারেননি।

তিনি ওপার বাংলার অনেক সরকারি ও বেসরকারি অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। ঢাকা রাজশাহী ও অন্যান্য স্থানে তিনি অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। একসময় কেউটিয়াতে বিজয় সরকারের স্মরণসভা কমিটির মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বাংলা একাডেমির সাথেও যুক্ত ছিলেন। সেখান থেকেও তিনি সম্মানিত হয়েছেন।

তিনি এলাকায় একজন মানব প্রেমিক হিসেবে পরিচিত। এলাকার সমস্ত স্কুল ও ক্লাবগুলির বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য, উপদেশাবলি প্রদান করেন। তিনি মানবধর্মে দীক্ষিত। তাঁর কাছে মানুষের সেবায় বড়ো ধর্ম। আঞ্চলিক কোনো ধর্মই তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কারণ তিনি কোনো আঞ্চলিক ধর্মে বিশ্বাসী নন।

বাংলার গ্রামেগঞ্জের অষ্টক গানের উপরও তাঁর প্রাণের টান গভীর। বগুলার গাড়াপোতা গ্রামে বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রতিবছর অষ্টক গানের প্রতিযোগিতা হয়। এখনও প্রধান অতিথি হিসেবে সেখানে যোগদান করেন তিনি।

এই কর্মপাগল ব্যক্তি সম্বন্ধে অনেক কিছুই না বলা রয়ে গেল। আগে রেডিয়ো সেন্টারে প্রায়ই প্রোগ্রাম থাকত তাঁর মূল্যবান চিন্তাধারার। কেউ কোনো বিপদে পড়লে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালে স্বভাবসিদ্ধ ভাবে তিনি উপকার করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে আমাকে তিনি খুবই কাছের মানুষ মনে করেন। তাই উভয়ের সুখদুঃখের কথা সব সময় বিনিময় হয়। তিনি এখনও কলম হাতে রাতের পর রাত লেখালেখি করে যাচ্ছেন।

পরম করুণাময় তাঁর ওপর আশিস বর্ষণ করুন, যেন তাঁর মনোস্কামনা পূরণ হয়। বীরনগর

উষাগ্রামে তাঁর যোগাযোগ এখনও অব্যাহত। সেখানে বিভিন্ন সামাজিক কাজের উল্লেখ আছে। গাড়িভাড়া করেও এখনও অনুষ্ঠানে যোগদান করেন সেখানে। দত্তপুলিয়ার শ্রীমা মহিলা সমিতির সঙ্গেও তিনি যুক্ত।

একসময় তিনি ইস্টার্ন রেলওয়ের শিয়ালদা গেদে লাইনের নিত্যযাত্রীদের অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য হোতা ছিলেন। রেলের সাথেও তাঁর যোগাযোগ ছিল ভালো। যখন যেখানে সামাজিক কাজের উন্নয়নের সুযোগ পেতেন, তখন সেখানে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নিতেন নিজেকে। কাজেই এলাকায় যে কোনো অনুষ্ঠানে তাকে সভাপতি হিসেবে আসীন থাকতে হত। পরম করুণাময়ের নিকট তাঁর সুস্থ দেহ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করলাম।

মনোহরমৌলি বিশ্বাস : যতীন্দ্রনাথ রায়কে নিয়ে একটি দুটি কথা

শ্রদ্ধাভাজন যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে দীর্ঘদিন থেকে চিনি। তাঁর সদাচরণ যতটা আকর্ষণ করে, বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করা কোনো এক উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত এই প্রধান শিক্ষক মহাশয়, একটা দেশ ও জাতির আত্মার স্পন্দন নিজস্ব লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির ভুবনে যে বিরাজিত থাকে, তা তাঁর অনায়াস জ্ঞাত এক উপলব্ধ বিষয়। সেই বন্দরে নোঙর ফেলে তিনি কাটালেন তাঁর সারাটা জীবন। তাঁর সাদর আমন্ত্রণে কখনও কখনও নদিয়া জেলার বাউলমেলায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।

রতন নন্দী: আমার যতীনদা

লোকসংস্কৃতির গবেষণাসূত্রে আমার সঙ্গে যতীনদার পরিচয় হয় প্রায় চার দশক পূর্বে। সেই সময়ে ছিলেন আরও দুজন বিখ্যাত মানুষ--ড.তুষার চট্টোপাধ্যায় সুশান্ত হালদার। পরে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন লোককবি বিজয় সরকারের পুত্র কাজল অধিকারী। আমার শিক্ষক তুষারবাবু ও অগ্রজপ্রতিম সুশান্তদা সময়ের আগেই না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন। আমরা এখনও বয়স, অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছি। পেয়েছি নতুনপ্রজন্মেরআরো অনেককে।
'যতীনদা' এই সম্বোধন থেকেই বোঝা যায় মানুষটি আমার চেয়ে বড়ো, শুধুই বয়সের হিসাবে নয়, সর্বক্ষেত্রে----মানুষ হিসাবে তো বটেই। নানা ঘটনার সূত্রে যতীনদাকে কাছে পেয়েছি। বাউল মনের অধিকারী যতীনদা কাঁধে একটি ঝোলাব্যাগ নিয়ে বাস, রিক্সা, টোটো অটোয়--কিছুই না পেলে পায়ে মাইলের পর হেঁটে মেলার আসরে ধুলোর মধ্যেই বসে সাংস্কৃতিক রসাস্বাদন করেন ও তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। আমি তাই তাঁকে কৌতুক করে বলি গান্ধীজী ছাড়া এত হাঁটতে আর কাউকে দেখিনি। পোশাক পরিচ্ছদেও তিনি বিলাসিতা শতহস্ত দূরে। সামান্য কিছুতেই তাঁর পেটের চাহিদা, শোওয়া যখন যেমন,তখন তেমন।

নানা পরিবেশে আমি যতীনদাকে পেয়েছি। কখনও ভীমপুরের লালন মেলায়, কখনও ঘোষপাড়ার দোলমেলায়, কিংবা অন্য কোনও মেলায়। কেউটিয়ার বিজয় মেলার তো তিনি অন্যতম সংগঠক তথা সভাপতি। সেখানে প্রতি বছর দেখাতো হবেই। তাছাড়া রয়েছে

বহিরগাছির লালন ও বিজয় উৎসব। সবচেয়ে ভালো অভিজ্ঞতা কাজল অধিকারীর নেতৃত্বে যতীনদা ও অন্যান্যদের সঙ্গে বাংলাদেশের নড়াইল, ডুমদি, ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে অংশগ্রহণ। একবার বহিরগাছিতে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতির ছাত্র –ছাত্রীদের তিনদিন ব্যাপী ক্ষেত্রগবেষণার ব্যবস্থাপনা তিনিই করেছিলেন।

তিনি শিক্ষক, তাও প্রধান শিক্ষক। হেডমাস্টার শব্দ শুনলেই অনেকের ভয় হয়। যতীনদা অন্যধরনের মানুষ। তাঁকে দেখলে ভক্তির সম্ভ্রম জাগে,যার বলে তিনি সকলকে কাছে টেনে নেন।

বহুবিধ গুণাবলীতে যতীনদার চরিত্র স্মরণসুন্দর। তিনি লেখক,শঙ্খচিলের মতো সাময়িকপত্রের সম্পাদক। বহু পত্রিকার নিয়মিত লেখক। সুনিবিড় সম্পর্ক ছিল অন্নদাশঙ্কর রায়,মহাশ্বেতা দেবী সহ একালের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গে। কিন্তু তিনি নিজে নিরহঙ্কার সদাহাস্যময় অজাতশত্রু মানুষ। যতীনদার দীর্ঘ, সুস্থ কর্মময় জীবন কামনা করি।

শংকরনারায়ণ চক্রবর্তী: যতীন্দ্রনাথ রায়– কর্মযোগের নীরব সাধক

যতীন্দ্রনাথ রায় বাংলার লোকসংস্কৃতি জগতের এক পরিচিত নাম। শান্ত সৌম্য স্থির স্থিতধী স্বল্পবাক এক পুরুষ। রানাঘাট ২ নম্বর ব্লকের বহিরগাছি উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন প্রধান শিক্ষক। সুদীর্ঘ দিন এই দায়িত্ব পালন করে বিদ্যালয়টিকে বলতে গেলে নিজের হাতে তিনি গড়ে তুলেছেন। ভীমপুর কদমখালির লালন মেলার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আজও সেই মেলার সাথে তাঁর নিবিড় সংযোগ। আমাদের রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় এই মেলার বিকাশে তাঁর নিষ্ঠা এবং সক্রিয়তাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

দুই বাংলার বহু প্রথিতযশা লেখক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। বহুবার তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থার আমন্ত্রণে সে দেশে গিয়েছেন। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক বন্ধনকে দৃঢ় করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ওপার বাংলার অনেক লোকসংস্কৃতি গবেষক শিক্ষাবিদ লেখক শিল্পী তাঁর আমন্ত্রণে এ দেশে এসেছেন।

নদিয়ার লোক গায়কদের কাছে তাঁর অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসন। অনেক নামকরা বাউল এবং লোকশিল্পীদের কাছে তিনি এক পিতৃতুল্য মানুষ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এদের অনেককেই তাঁকে ‘বাবা’ বলে সম্মোধন করতে শুনেছি। মরমি কবি বিজয় সরকারের স্মৃতি রক্ষার কাজেও তিনি এক নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিত্ব। এক্ষেত্রেও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা।

লেখালেখির সাথেও তিনি বিশেষভাবে সংযুক্ত। তাঁর লেখার অধিকাংশই লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ। লোকসংস্কৃতি গবেষকদের কাছে এগুলি মূল্যবান সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি আদ্যন্ত এক নিরহঙ্কারী মানুষ। ছোটো বড়ো যে কোনো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেলে তিনি হাসিমুখে তা গ্রহণ করেছেন এবং সে সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেছেন।

শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতির কর্মযজ্ঞে তিনি নিরলস এক কর্মসাধক। সৃজনশীল চিন্তাভাবনায় নিজেকে সর্বক্ষণ মগ্ন রাখায় তাঁর জীবনধর্ম। প্রচার সর্বস্বতার এই যুগে প্রচারের যাবতীয় উপকরণ

তাঁর কাছে মজুত থাকলেও তিনি সজ্ঞানে সে সব উপেক্ষা করে নিঃশব্দে মেতে আছেন তাঁর কাজে। সত্যিই তিনি কর্মযোগের নীরব সাধক।

শক্তিনাথ ঝাঁ: সৎ গৃহস্থ সন্ন্যাসীর মতো মানুষ

যতীন্দ্রনাথ রায়কে আমি চিনেছি লালন মেলার এবং বিজয় সরকারের স্মরণ সভার সূত্রে। তাঁর সঙ্গে বহু জায়গায় গিয়েছি। একজন সৎ, গৃহস্থ সন্ন্যাসীর মতো মানুষ তিনি। নানা বিষয় নিয়ে তিনি চর্চা করেছেন এবং লিখেছেন। এ সব লেখায় নূতনত্ব আছে। প্রধান শিক্ষক, গবেষক হিসাবে যতীন্দ্রনাথ রায় মান্য কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি অসামান্য।

শান্তনু দত্ত চৌধুরী: লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণের জন্য নিবেদিত প্রাণ শ্রদ্ধেয় যতীন রায়

মানবিক মূল্যবোধের আমাদের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন ও সর্বজনপ্রিয় মাস্টার মশাই শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় ৮৪ বছর পূর্ণ করেছেন সংবাদটি পেয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এই ক্ষুদ্র লেখাটি লিখছি। আমি যদিও তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র নই এবং তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছাত্রজীবন অতিবাহিত হবার অনেক পর, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ হবার কিছুদিন পর থেকেই তাঁকে আমি একজন প্রকৃত শিক্ষক বলে মনে করেছি। তিনি হচ্ছেন এক বিরল ধারার লোক শিক্ষক। যদিও তাঁকে আমি দাদা বলেই সম্বোধন করি।

শ্রদ্ধেয় যতীনদার সঙ্গে আমার আলাপ সম্ভবত ১৯৮৮ সালে। তখন আমি রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগে কর্মরত। কিছুদিন আগে বিভিন্ন জেলায় কাজ করে সবে মহাকরণে এসেছি। ওই বিভাগে তখন লোকসংস্কৃতির দায়িত্বে ছিলেন উপ তথ্য অধিকর্তা শ্রদ্ধেয় মানিক সরকার মহাশয়। তিনি বাংলার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পরিকল্পনায় ওই সময় থেকেই তথ্য বিভাগ লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে থাকে। তাঁর সঙ্গে পূর্ব থেকে যতীন রায় মহাশয়ের পরিচয় ছিল। তিনিই আমাকে যতীন রায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। মানিকবাবু তখন অবসর গ্রহণের দ্বারপ্রান্তে। তাঁরা দুজনে উদ্যোগ নিয়ে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার স্থানীয় জনসাধারণকে সমবেত করে ভীমপুর--আসাননগর অঞ্চলে কদমখালি বাউল আশ্রম স্থাপন করেন। গঠিত হয় রাজ্য লালন মেলা সমিতি। যতীনদা কাছেই বহিরগাছি হাই সকুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এরপর সম্ভবত ১৯৯০ সাল থেকে ওই বাউল আশ্রমকে কেন্দ্র করে শুরু হয় রাজ্য লালন মেলা। বিপুল সংখ্যক বাউল ফকির এই মেলায় আসেন। এমনকি প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকেও বাউল ফকিররাএই মেলায় আসেন। আমি এই মেলায় কয়েকবার গিয়েছি। এই মিলন মেলায় গিয়ে মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে। একবার এই মেলায় আমার সঙ্গে বাংলাদেশের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক তানভীর মোকাম্মেল এসেছিলেন। তানভীর এই মেলায় এসে মুগ্ধ হন। লালন ফকিরের জীবনীর ওপর তাঁর পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনী চিত্র আছে। এই মেলায় গিয়ে যতীনদার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছি। দেখেছি তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ও লোকশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর গভীর আত্মিক সম্পর্ক।

উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া থানার বাণীপুরে স্বাধীনতার পর মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদি শিক্ষা

ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আশ্রমিক শিক্ষার আদর্শে গড়ে ওঠে একটি শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র। ওই শিক্ষাকেন্দ্রের পক্ষ থেকে শিক্ষার সঙ্গে লোক -- সাধারণের সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশে ১৯৫৬ সালে বাণীপুর লোক উৎসব শুরু হয়। কালক্রমে এই মেলাটি সুবিখ্যাত হয়ে ওঠে। কিন্তু গত শতকের ৭০ এর দশকে এসে উৎসবটি বন্ধ হয়ে যায়। এর কারণ গান্ধীজি ও গুরুদেবের শিক্ষাদর্শ থেকে দেশ তখন অনেক দূরে সরে গিয়েছে। আর পুরাতন শিক্ষকমন্ডলীর অবসর গ্রহণ। আমরা ওই বুনিয়াদি শিক্ষায়তনে যারা পড়েছি তারা ১৩ বছর বন্ধ থাকার পর ১৯৮৬ সাল থেকে আবার উৎসবটি শুরু করি। প্রথম থেকেই যতীনদার কাছ থেকে প্রভূত সহায়তা লাভ করেছি। তিনি বিভিন্ন জেলার লোকশিল্পীদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন। প্রায় প্রত্যেক বছর আমাদের উৎসবে এসেছেন। উৎসবের শেষ দিন লোকশিল্পীদের মিলন সভায় সভাপতিত্ব করেছেন। একাদিক্রমে ৩৮ বছর এই উৎসবটি করার পর রাজনৈতিক দলাদলি ও হস্তক্ষেপের জন্য ২০১৪ সাল থেকে আমি আর এই উৎসবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিনি।

কিন্তু যতীনদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ আছে। আমাদের বাণীপুরে Banipur Art Society and Institute of Culture (BASIC) এর উদ্যোগে যখন আমরা ' পুতুল নাট্যে' র ওপর একটি কর্মশালা করি তখন যতীনদা প্রভূত সহায়তা করেন। তিনি বগুলা থেকে কয়েকটি তারের পুতুলনাচের দল পাঠান। যোগাযোগ করিয়ে দেন অন্যান্য অঞ্চলের পুতুল নাচের দলের সঙ্গে। একই সহায়তা পেয়েছিলাম ' অষ্টক ' পালাগানের ওপর কর্মশালা করার সময়।

বিলুপ্তপ্রায় লোক সংস্কৃতির সংরক্ষণের জন্য যতীনদা সদা সচেষ্ট। তিনি, প্রয়াত পুলকেন্দু সিংহ ও অন্যান্যরা একত্র হয়ে একদা গঠন করেছিলেন বঙ্গীয় লোক সংস্কৃতি সংসদ। সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। সুবিখ্যাত কবিয়াল বিজয় সরকার মহাশয়ের জন্ম শতবর্ষ উদযাপন মেলায় কাঁকিনাড়ায় গিয়ে দেখেছি কবির সুপুত্র কাজল অধিকারী মহাশয়ের সঙ্গে যতীনদার উজ্জ্বল উপস্থিতি। বাংলাদেশের লোকশিল্পী অনেকের সঙ্গেই তাঁর গভীর যোগাযোগ। যতীনদা পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্ত যখন জলাভূমি সংরক্ষণকল্পে ' মীন মঙ্গল ' কর্মসূচি শুরু করেন তখন যতীনদা তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। ওই সময় বহু জলাভূমিতে তিনি পান্নালাল দাশগুপ্তের সঙ্গে মাছ ছাড়েন। গভীর মানবতাবাদী সাহিত্যিক অন্নদা শঙ্কর রায় যতীনদাকে তাঁর লোকায়ত সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা, দৃঢ় অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা এবং উদারবাদী মনোভাবের জন্য খুবই স্নেহ করতেন। যতীন দার সঙ্গে খুবই প্রীতির সম্পর্ক বাংলাদেশের লালন অনুগামী মানুষজন ও বাউল ফকিরদের সঙ্গে।

শ্রদ্ধেয় যতীনদার দীর্ঘজীবন কামনা করি। তিনি আমাদের মধ্যে থেকে সমাজকে আলোকিত করুন। এই সার্বিক অবক্ষয়ের যুগে তিনি আমাদের মধ্যে আছেন এটিই আমাদের কাছে মস্ত বড় আনন্দের সংবাদ।

শুভেন্দু মাইতি: যতীনদা অনন্যমানুষ

যতীনদা অনন্য মানুষ। যতীনদা দীর্ঘকাল প্রধান শিক্ষকতা করেছেন। তার থেকে বড়ো কথা হল লোকসংস্কৃতির বিষয়ে তাঁর প্রবল আগ্রহ। এবং বিশেষত বিজয় সরকারের প্রতি তাঁর আগ্রহ

এবং তাঁর কন্ট্রিবিউশান। এই গান প্রসারের জন্য এ কাজে যতীনদার তুলনা হয় না। বিজয় স্মৃতি যে রক্ষা কমিটি রয়েছে, এখানেও তাঁর প্রেসিডেন্ট। এই বয়সেও এখনও সক্রিয় আছেন। এবং ‘যদ্দিন পারব কাজ করব’ এই মানসিকতা নিয়ে কাজ করে চলেন তিনি। লড়াই করে চলেছেন। এখন নিজেও একটা লালন মেলা করছেন।

শুভেন্দু শুকুলঃ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নির্মাণের কারিগর যতীন্দ্রনাথ রায়

লালগোলা গামী ট্রেনে উঠেই যতীন বাবুর কানে স্মার্টফোনের কানেক্টর ওয়্যার লাগিয়ে দিলাম। আমি নিশ্চিত, তিন ঘন্টার জার্নিতে তাঁকে বিড়ম্বনা সইতে হবে না। ইন্টারভিউ চলছিল। অধ্যাপক আবদুল্লা আবু সাঈদ ও ফেরদৌসি রহমান। সঙ্গে আব্বাস উদ্দিনের কিংবদন্তি কন্যার গান। মুগ্ধতার এক নাম।

লক্ষ্য করছি, যতীনবাবু পরিবেশ ভুলে আপন মনে চক্ষু মুদে গানের সুর তালের সঙ্গে হাত নেড়ে নিজেকে সম্মেলিত করে চলেছেন। আমাদের উদ্দিষ্ট মুলুক বেলডাঙ্গা। অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা মহোদয় আয়োজিত বাউল সম্মেলন। আমন্ত্রিত অতিথি যতীন্দ্রনাথ রায়। তাঁর সঙ্গী পাঁচজন- গোষ্ঠগোপাল আশিসপুষ্ট সত্যরঞ্জন মন্ডল অনুপ মন্ডল সুপ্রতিম বিশ্বাস ও আমি। যতীনবাবুর সঙ্গে দীর্ঘ নিবিড় সংযোগ থাকার কারণে তাঁর অন্তরতম প্রদেশের ‘আট কুঠুরি নয় দরজা’ আমার নিকট উন্মুক্ত ছিল।

তিনি সংগীত প্রিয়। মানুষ মাত্রেই এ বিষয়টা স্বাভাবিক। যতীন বাবুর ক্ষেত্রে গীত সুধা ঈপ্সার প্রাবল্য একটু বেশিই ছিল। আধুনিক গজল ঠুংরি ঠাট মেল বাউল পল্লীগীতি বিজয় গীতি সহ সকল প্রকার গান তিনি ভালোবাসতেন। লক্ষ্য করা গেছে তিনি সব থেকে বেশি আকর্ষণ বোধ করতেন উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি। উচ্চাঙ্গ সংগীত আসরের সংবাদ জানতে পারলেই তিনি শত বাধা বিপত্তি দূর করে পৌঁছে যেতেন আসরে।

এর জন্য তিনি অনেক রাত শিয়ালদহ প্লাটফর্মে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন। তিনি একটি সবিশেষ ঘটনার কথা শুনিয়েছিলেন- তখন তিনি স্কটিশে। কলেজের বাৎসরিক সংগীতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে খ্যাতনামা তারকা শিল্পী সমাবেশ। যতীন বাবুর খুব ইচ্ছা, উক্ত সঙ্গীতাসরে প্রবাদপ্রতিম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গুরু ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতি। শোনা গেল, পন্ডিত ভীষ্মদেব বারো বছর কাল মৌনবত পালন করছেন। সংগীত জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। যতীনবাবুর সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা আর আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে এক সহপাঠী সহ উপস্থিত হলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। যতীন বাবুর সবিস্তারে সংগীতানুষ্ঠানের বার্তা উপস্থাপন করলেন। পরিশেষে বিনয়ের সহিত সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানালে তিনি সম্মতি প্রদান করেন। ঘটনা- ১২ বছরের ধ্যান ভঙ্গ। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় কলেজ ফাংশানে জয় জয়ন্তী কানাডায় আরোহে পরিবেশে স্বর্গলোক রচনা করলেন। স্তব্ধ বাক্যহারা শ্রোতৃকুল।

তিনি ডুবে যেতেন, অখিলবন্ধু ঘোষ নজরুলের হৃদয় রাঙানো গানে। মানুষের অভিজ্ঞান রূপে চিনে নিয়েছিলেন স্বজন। অন্নদাশঙ্কর রায় পান্নালাল দাশগুপ্ত গৌরকিশোর ঘোষ আরতি সেন মহাশ্বেতা দেবী প্রণবেশ সেন শান্তিদেব ঘোষ বাদল সরকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আবুল বাশার

আবু সাঈদ আইয়ুব ডক্টর সুধীর চক্রবর্তী ডক্টর অরুণ বসু এই সম্পর্কগুলি আরও বিস্তারিত হয়ে পার হয়ে গেল কাঁটাতার। সেখানেও নিবিড় সম্পর্কের আত্মীয়দের পেয়ে গেলেন। ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ডক্টর শামসুজ্জামান খান ডক্টর আনোয়ারুল করিম কামাল লোহানি শাহিদা খাতুন শামসুর রহমান ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

যতীন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'প্রাজ্ঞ মনীষী বিবেক শিল্পী' কবিতায় উল্লেখ করেছেন- 'মানবিক মূল্যবোধ ও জীবন দর্শনের জাগরণ, বিশ্ব নাগরিকের স্পর্শে বোধ ও বোধির উন্মেষ'।

দেশ কালের সর্বত্র মানবতার দ্রুত অপচয় প্রত্যক্ষ করে যতীন্দ্রনাথ রায় বারংবার শক্তি ও শান্তি খুঁজে নিতে চেয়েছেন অগ্রজ কর্মীষ্ঠ নারী পুরুষগণের সৃষ্টি লোকে। কেন না তাঁরাই তো চিরকালের অনাহত বিশ্বছন্দের খবর রাখেন। তাদের নিকট হতে প্রত্যয় সংগ্রহ করেন। বিগত শতকের ষাটের দশকের প্রথম দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অনার্স ও ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে শহুরে সুযোগ উপেক্ষা করে ফিরে এলেন পল্লী জীবনের কর্মক্ষেত্রে। ১৯৬৬ সালে নদিয়া জেলার বহিরগাছি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করলেন। সাত বছর বয়সে জন্মভূমি যশোর জেলার ঝিনেদা মহকুমার হাটগোপালপুর ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে- যতীন্দ্রনাথ রায়ের চিন্তা চেতনায় সুতীক্ষ্ণ ভাবে প্রোথিত হয়ে আছে দেশ বিভাগের বিভ্রান্তিকর ইতিহাস, সাম্প্রদায়িকতার আত্মঘাতী কুচক্র, দ্বিজাতি তত্ত্ব, বাঙালির জাতিসত্তা, স্বাধীনতার প্রহসন ইত্তাকার অজস্র সংকট। তাই তিনি শিক্ষকতায় আর সাহিত্যাশ্রয়ে সুস্থির হতে পারেন নি। সেই কারণে নিজেকে নিবেদন করলেন মানবপ্রেমে। বাউলগান বিজয়গীতি কবিগান অষ্টকগান সারি-জারি -ভাটিয়ালি কীর্তন লোকগীতি লোকযাত্রা। লোকউৎসব। এ জগৎটা যতীনবাবুর খুবই চেনা জগৎ। জাত ধর্ম ভুলে এখানে অজস্র অসংখ্য মানুষ ভিড় করে। গানগুলি মানবপ্রেমের বাণী ছড়ায়। যতীন্দ্রনাথ রায় এই পথেই 'ভারতীয় মানুষ সত্যে'র ঐতিহ্যকে সযত্নে বহন করে চলেছেন।

শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ: বিদগ্ধ ও সুবিনীত মানুষ যতীন্দ্রনাথ রায়

যতীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় বাংলাদেশে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর সম্মেলনের প্রথম দিন। আমার মতো উনিও ডেলিগেট। তাঁর সাথে প্রথম পরিচয় ওখানেই। একটু রোগা ধুতি- পাঞ্জাবি পরা শান্ত স্বভাবের মানুষটিকে খুব ভালো লেগেছিল। তিনিও এই নদিয়ার। শঙ্খচিল নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। মূলত প্রাবন্ধিক। লালন বিষয়চর্চা নামে একটি সংস্থার সংগঠক। তাকে নিয়ে বইটি যেন সব দিক দিয়ে সাফল্য লাভ করে এই শুভেচ্ছা বার্তা রইল।

সত্যরঞ্জন মন্ডলঃ তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রেরণাদায়ক

যতীন্দ্রনাথ রায় বহিরগাছি হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক। এলাকার সার্বিক উন্নয়নে যথা শিক্ষা স্বাস্থ্য সংস্কৃতির উন্নয়ন সহ সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নে প্রথমে তাঁকে স্মরণ করতে হয়। আপাদমস্তক মিতভাষী নিপাট শিক্ষিত ও ভদ্র মানুষটিকে নিয়ে কলম ধরতে গেলে তাঁর সম্পর্কে অনেক

কিছুর খোঁজখবর নিতে লাগে। বিগত ৫০-৬০ বছর ধরে তাঁর বহু সংগ্রামের জীবন কাহিনিকে তুলে ধরতে গেলে বহু সময় ও পরিশ্রম করে তথ্য তুলে আনার প্রয়োজন। সেই ধৈর্য তিতিক্ষা সংযোগ রক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে আনতে পারলে নতুন এক ইতিহাস নবদিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। বলাবাহুল্য, চিরকুমার এই মানুষটি আশিটি বসন্তকে অবলীলাক্রমে পার করে দিয়ে এসে জীবনের পশ্চিমাচলে অস্তগামী এক সূর্যের মতো আজও নিজেকে মেলে ধরেছেন। সুদীর্ঘ জীবনে তিনি সমাজের নির্যাতিত নিপীড়িত ব্রাত্যজনের সংস্পর্শে এসে তাদের আপনজন হয়ে উঠতে পেরেছেন বলেই তাদের দাবি ও অধিকার নিয়ে এত সরব হতে পেরেছেন। তাই বিভিন্ন সময়ে তাঁর লেখা নানা পত্রপত্রিকায়ও বাঙময় হয়ে ওঠে। বহুজনের মাঝে নিজেকে মেলে ধরার ও তাদের ব্যথাবেদনা চাওয়াপাওয়াকে এত কাছ থেকে আর কেই বা অনুধাবন করতে পেরেছে?

প্রথমে দূর থেকে দেখেছি। সম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে তাঁর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করেছি। সেই মানুষটিও কবে থেকে যেন আমার এত কাছের মানুষ ও আপন স্বজন হয়ে উঠলেন ভাবতেও আলাদা এক সুখ অনুভব করি। গানের সুবাদেই সেই কবে কত বছর আগে আমার ছাত্রজীবনে ভীমপুর আসাননগর কদমখালি রাজ্য লালনমেলা সমিতি আয়োজিত লালনমেলায় সংগীত পরিবেশন যেন সম্পর্কের সূচনা করে। বাউল গানের সাথে সাথে কিছু লালনগীতিও ততদিনে আয়ত্ত করেছি। শ্রদ্ধেয় যতীনবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় অনাড়ম্বর লালনমেলায় গানের শুরু থেকেই। মানিকবাবু স্বপনবাবুদের সাহচর্যে যতীনবাবুর সানুগ্রহে লালনমেলায় সংগীত পরিবেশন যেন তাঁর ও আমার মধ্যে এক ভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধন, এক সেতু বন্ধনের কাজ করে তুলল। ক্রমান্বয়ে যতীনবাবু রাজ্য লালনমেলায় সভাপতি পদে নিযুক্ত হলেন। গণপতিবাবু কালিদাসবাবুদের সহযোগিতা ও সম্পাদনায় লালনমেলা ধীরে ধীরে বৃহদাকার ধারণ করল। সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী লালনমেলার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। যতীনবাবুর প্রচেষ্টায় ওপার বাংলার খ্যাতনামা লালনগীতি শিল্পী ও লোকগবেষকরা এপার বাংলায় এসে লালন মঞ্চের অনুষ্ঠানে সামিল হলেন।

ওপার বাংলার লোকসাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তা ও পারিষদবর্গের সাথে বহু অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুললেন। ওপারের লালন বিশেষজ্ঞ আবুল আহসান চৌধুরি আলম আরা জুঁই মনিরুজ্জামান মনির আব্বাসউদ্দিন পুত্র, এপারের শুভেন্দু মাইতি অন্নদাশঙ্কর রায় শুভেন্দু শুকুল কাজল অধিকারী প্রমূখ লোকসাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও শিল্পীদের সাথে লেগে রইলেন। লোকসংস্কৃতি গবেষণায় নিজেকে সদা ব্যস্ত রাখতেন। মগ্ন হয়ে রইলেন লোকসংস্কৃতি চর্চা ও তার প্রচার প্রসার নিয়ে। ছুটে চলেছেন এপার ওপার। ক্রমে শক্তিনাথ ঝাঁ সুধীর চক্রবর্তীর মতো লেখকদের সান্নিধ্যে এসে যেন নিজেকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করে তুললেন। বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রেরণাদায়ক।

গাড়াপোতার অষ্টকমেলার বার্ষিক অনুষ্ঠানে তাঁর ভূমিকা যথেষ্ট, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন এলাকা থেকে অষ্টকের দলকে এই অনুষ্ঠানে সামিল করা, রাতভর অনুষ্ঠানে থেকে পরিচালক ও কমিটির সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার পিছনে তাঁর যে ভূমিকা সেটা প্রশংসার

যোগ্য বটে! লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা নিয়ে তিনি লিখে চলেছেন। দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল অচিরেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে চলেছে। আমরা সুনিশ্চিত তাঁর লেখা বাংলার লোকসংস্কৃতির রুপরেখা তাঁর বৈচিত্র্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরবে। নতুন করে যেন হারিয়ে যাওয়া, ভুলে যাওয়া সংস্কৃতিকে তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে চলেছেন। খুব শীঘ্রই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

মনে পড়ে ২০১৯-২০২০ সালে। ওপার বাংলার কুষ্টিয়া ছেউড়িয়া লালন সাঁইজির বার্ষিক জন্মোৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে যাবার কথা। কদমখালি রাজ্য লালনমেলা সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে আমি ও যতীনবাবুর ওপারে লালন জন্মোৎসবে যোগদান করার সুন্দর মুহূর্তের কথা। নির্দিষ্ট দিনে আমিও যতীনবাবু গেদে বর্ডার হয়ে নির্দেশিত পথে পোঁছে গেলাম ওপারে ছেউড়িয়াতে। বিশিষ্ট লালনগবেষক ও সাহিত্যিক মনিরুজ্জামান মনিরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলাম। তার স্ত্রী সম্মানীয়া আলম আরা জুঁই যিনি নিজেও একজন কবি সাংস্কৃতিক ব্যস্ততম সংগঠক। বছর কয়েক আগে স্বামীকে হারিয়ে সংস্কৃতির বাতাবরণে নিজেকে মেলে ধরে আছেন। পুত্র কন্যার সংসার সামলিয়ে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির বহু সংগঠনের তিনি মধ্যমণি। যতীন্দ্রনাথ রায় তার কাছে গুরুদেবের সমান। পরিচিত হলাম যতীনবাবুর মাধ্যমে। সংস্কৃতিপ্রাণা মহীয়সী এক নারী। নিজেও অনেক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। প্রায় প্রতিদিনই তার অনুষ্ঠান থাকে। তার বাড়িতে তার আতিথ্য গ্রহণের সাথে সময় নিয়ে লালন সাঁইজির জন্মোৎসবে যোগদান করা। তিনি নিজেও ওই কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। নিজে সঙ্গে করে লালন উৎসবে পাশে থেকে আমাদের সমাদর করেছেন। উৎসবে কমিটির বিশিষ্ট জনেদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অনেক রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠানে থেকে সময় দিয়েছেন। যতীনবাবুর প্রতি তাঁর এই আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা অতুলনীয়।

এল সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত মাহেন্দ্রক্ষণ। গুটি গুটি পায়ে যতীনবাবু আমি ও কবি আলম আরা জুঁই পোঁছে গেলাম কাছেই লালন সাঁইজির স্মরণোৎসবে। অনেক শিল্পী, দেশবিদেশ থেকে আশা বহু লালন প্রেমী ও অনুষ্ঠানের আয়োজকদের সাথে মিলিত হবার বাসনা চরিতার্থ হল। যতীনবাবু ও জুঁইদিরর সান্নিধ্যে লালন সাঁইজির মাজার দর্শন করে ধন্য হলাম। পাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বহু শিল্পী আপন মনে ডুগি একতারা সহযোগে লালন সাঁইজির গানে মত্ত হয়ে আছে। এখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গান শুনে ফিরে এলাম মূল মঞ্চে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আলাদা খাতির যত্ন পেলাম। জুঁইদির ব্যবস্থাপনায় মঞ্চে ডেকে আমাদের দুজনকেই কমিটির তরফ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হল। এক ঝাঁক যন্ত্রশিল্পীরা মঞ্চ আলো করে বসে। তারই মাঝে মঞ্চে দাঁড়িয়ে যতীনবাবু সাবলীলভাবে লালনমাহাত্ম্য ও দর্শনকে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরলেন। মুহুর্মুহু করতালির মাঝে সে বক্তব্য শ্রোতাকে উদ্বেল করে তুলল। কি সুন্দর ভাষায় হাজার হাজার শ্রোতাদর্শকের মন জয় করে নিলেন যতীনবাবু।

সামনে স্ট্যান্ডের ওপর বসানো বাংলাদেশের বিভিন্ন নামকরা সংবাদমাধ্যম ও টিভি চ্যানেলের ক্যামেরা। তারপরে আমার গানের ঘোষণা হল। যতীনদার পাশে চেয়ারে বসে সমস্ত ঘটনা যেন ক্যামেরাযর চোখ দিয়ে দেখলাম। লালন সাঁইজিকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর গানেই তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি

জানালাম। যতীনদা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। অজস্র শ্রোতার হাততালিতে সেদিন সত্যরঞ্জনের শিল্পীসত্তা অন্য এক বার্তা পেয়ে যেন প্রাণিত হয়ে উঠল। লালন সাঁইজির মাজারে এসে গান করার এই স্বপ্ন সার্থক হবার পিছনে যে যতীনবাবুর সম্পূর্ণ অবদান!

পরদিন জুঁইদির সহযোগিতায় একজন পথপ্রদর্শকের সাথে যতীনদা ও আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মক্ষেত্র শিলাইদহে হাজির হলাম। ওখানে পৌঁছাতেই আশেপাশের বহু দোকানদার ও মানুষেরা যতীনবাবু ও আমাকে দেখে ছুটে কাছে এলেন। গতরাতের অনুষ্ঠানে টিভি চ্যানেলের দৌলতে সারা বাংলাদেশ জুড়ে যে টিভি সম্প্রচার হয় তারই ফলশ্রুতি এটি। আমাদের ঘিরে ধরে যতীনবাবুর অসাধারণ বক্তব্যের জন্য ভূয়সী প্রশংসায় ভরিয়ে তুললেন। আমার গাওয়া লালন সাঁইজির গানও তাদের মন ভরিয়ে দিয়েছে বলে বেশ খাতির করলেন। পাশের দোকানে বসিয়ে চা খাইয়ে সমাদর করল। এটাই বাড়তি পাওনা। শিলাইদহে রবি ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত নানা দ্রব্য পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এত ভালো লাগছিল তা বলার নয়। যতীনবাবু আমি পুকুরের পাশে বসে নানা জায়গা থেকে আসা ভ্রমণকারীদের গান কবিতা শুনে এক আলাদা আনন্দ অনুভব করলাম। গড়াই নদী পেরিয়ে নৌকা করে ওপারে আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করেছি দুজনে। সেই মধুর স্মৃতি চিরকাল ও আজীবন বয়ে বেড়াব আমরা।

ঊষাগ্রামে স্বনির্ভর গোষ্ঠী পরিচালিত যে ট্রাস্টি তার সাথেও যতীনবাবু ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। হস্ত ও কারুশিল্পে নানা দিকে উৎপাদিত পণ্য সম্ভার তৈরির কর্মশালা ও বিকেন্দ্রীকরণে ঊষাগ্রামের এই সংস্থা এলাকা ও বাইরেও যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে। বিজয় সরকারের একান্ত অনুগত, তাঁর গানের প্রচার ও প্রসার যতীনবাবুর অসামান্য অবদান। বহিরগাছি হাইস্কুল ময়দানে দীর্ঘবছর যাবৎ তারই প্রেরণা ও ব্যবস্থাপনায় উদযাপিত হয় রাজ্য বিজয়লালন ও লোকসংস্কৃতি উৎসব। রাজ্য ও বাংলাদেশ থেকে বহু খ্যাতনামা বিজয় লালনগীতি ও লোকশিল্পীরা যতীন বাবুর আহবানে অনুষ্ঠানে সামিল হয়। লোকসংস্কৃতিচর্চা ও গবেষণায় তিনি নিজের সারাজীবনকে যেন উৎসর্গ করেছেন। লিখে চলেছেন বহু ধারায় তার গবেষণালব্ধ ফসল। বাংলার লোকঘরানাকে সমৃদ্ধ করে তুলবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিজয়লালন অনুষ্ঠানে তাঁকে নতুন করে পেলাম। বয়সের ভার এখন সাধ দিতে চায় না। অসক্ত শরীরেও অনুষ্ঠানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একভাবে অভিভাবকের মতো সব সামলেছেন। পাশে থেকে দেখেছি তাঁর চোখে খুশির চমক, আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। বিশাল লোকসংস্কৃতির সাগরে তিনি যে তাঁর নৌকা বেয়ে চলেছেন; কে বেয়ে নিয়ে যাবে তাঁর সাধের তরী? না, এখন বেশ আশ্বস্ত লাগছে! তাঁর অনুপ্রেরণায় তাঁর আদর্শে প্রাণিত হয়ে এগিয়ে এসেছে অনেক যুবক। তরুণ, বিপ্লব, তাপস, সুজিতের মতো ছেলেদের মনের মাঝে তিনি এই বীজ বপন করতে পেরেছেন তাই এই তরী বইঠা বেয়ে কূলে পাড়ি দেবার মতো পারদর্শীরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর স্বপ্ন তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে বহিরগাছি লাফিং ক্লাব সম্পূর্ণভাবে তৈরি। এই সান্ত্বনা, এই আশ্বস্ত হবার ছবি তাঁর দু নয়নে দেখেছি। এটাই যে তাঁর কাছে মহাশান্তি। জীবনের শেষলগ্নে এসে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত ও সার্থক হতে দেখলে কার না চোখ দুটি ভিজে ওঠে? তাই কি ধুতির কোঁচার খুট দিয়ে চোখের কোণে জমে ওঠা আনন্দ

অশ্রুকে বারবার মুছে নিচ্ছেন! এ দৃশ্য লেখকের চোখ এড়াতে পারেনি। তাঁর এই আনন্দের মাঝে আমিও এক অপার আনন্দ অনুভব করেছি। তাঁর আদর্শ ও চিন্তা চেতনায় আমার সংগীত জীবনও যে অনেকাংশে উদ্বুদ্ধ। তাঁর প্রেরণা যে আমার পাথেয়। তিনি যে আমার আদর্শ।

ড. সত্যরঞ্জন বিশ্বাস লোকসংস্কৃতির নিষ্ঠ সংগঠক যতীন্দ্রনাথ রায়

লোকায়ত সংস্কৃতির সংরক্ষণ যে কোনো জাতির ঐতিহ্যের স্মারক। বিশ্বায়নের আগ্রাসনে নিজস্ব সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা এখন খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র লোকগবেষকদের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে -সৃষ্ট ও মাটির গন্ধে আমোদিত বাঙালির একান্ত সংস্কৃতি চর্চার সংরক্ষণ সম্ভব নয়। এরজন্য চাই লোকসংস্কৃতির সংগঠক। যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ক্রম-অবলুপ্তির হাত থেকে সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। যতীন্দ্রনাথ রায় দীর্ঘ প্রায় ছয় দশক ধরে লোকায়ত সংস্কৃতির সংগঠক হিসেবে সেই কাজটি করে চলেছেন। অধুনা বাংলাদেশের যশোর জেলায় জন্ম। ফলে মৃত্তিকালগ্ন সংস্কৃতির বীজ অন্তরে রোপিত হয়েছে শৈশবেই। জারি সারি ভাটিয়ালি ভাওয়াইয়া কীর্তন বাউল কবিগানের সুরে প্রাণ-মন সিক্ত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। সেই প্রবাহ তিনি বয়ে নিয়ে চলেছেন আজও।

আমার সঙ্গে যতীনবাবুর পরিচয় দু'হাজার সালের গোড়ার দিকে। তখন কবিয়াল রসরাজ বিজয় সরকারের জন্মশতবর্ষ চলছে। আমি তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত কিছু কবিয়ালের সাক্ষাৎকার নেবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি কবি গানের আসর থেকে আসরে। যতীনবাবু তখন বারাকপুরের আনন্দপুরীতে বিজয় সরকারের জন্মশতবর্ষ পালনের জন্য সাত দিনব্যাপী একটা অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যস্ত। শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়ে পুরোপুরি নেমে পড়েছেন বাংলা লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ও সংরক্ষণে। ইতিহাসের ছাত্র হলেও কর্মজীবনের শুরু থেকেই হার্দিক ঘনিষ্ঠতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল লোকসংস্কৃতির বিদগ্ধ গবেষক, লোকসঙ্গীত শিল্পী, লোকায়ত ক্ষেত্রের সংগ্রাহকদের সঙ্গে। সেই তালিকায় ছিলেন ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়, ড. বরুণ চক্রবর্তী, ড. মানস মজুমদার,ড.অচিন্ত্য বিশ্বাস, ড. রতন নন্দী, ড. পবিত্র চক্রবর্তী বাংলাদেশের ড. আশরাফ সিদ্দিকি, ড. মোমেন চৌধুরী, ড. আবুল আহসান চৌধুরীর, খোন্দকার রিয়াজুল হক, মহসিন হোসাইনের মতো বহু প্রথিতযশা লোকসংস্কৃতিবিদ। লোকসঙ্গীত শিল্পী গোষ্ঠ গোপাল দাস, অমর পাল, শুভেন্দু মাইতি সহ বিভিন্ন জেলার অখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গেও সখ্য গড়ে তুলেছেন লোকসংস্কৃতির স্বার্থেই। তিনি নদিয়ার স্থায়ী অধিবাসী। ফলে নদিয়ার দুই খ্যাতনামা লোকসংস্কৃতিবিদ ড. সুধীর চক্রবর্তী ও ড. শক্তিনাথ ঝা -এর সঙ্গে দীর্ঘ পরম্পরায় নানা লোকবিষয়ে সংযুক্ত থেকেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলার লুপ্তপ্রায় নানা লোকনাট্য, লোকাভিনয়, লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ ও সরকারীভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন।

কবিয়াল বিজয় সরকার ও ফকির লালন সাঁইয়ের প্রতি একটু বেশিই দুর্বল যতীনবাবু। বিজয় সরকারের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের সময় প্রত্যক্ষ করেছিলাম, কী তৎপরতা, কী গভীর আন্তরিকতায় এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে তিনি ত্রিপুরা -বাংলাদেশ -পশ্চিমবঙ্গকে এক করে

ফেলেছেন। কেউটিয়াতে বিজয় সরকারের বসতবাড়িতে যে উৎসবের প্রতিপালিত হয়,তারও সূচনা করেছিলেন তিনি। বিজয় সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাজল অধিকারীকে নিয়ে যতীনবাবুই এ অনুষ্ঠানের সমস্ত পরিকল্পনা করেছিলেন। বাংলাদেশের লোকশিল্পী মীনা বড়ুয়া, ফিরদৌস রহমানের মতো অনেকেই এ বঙ্গে এসেছেন গান গাইতে, তেমই লোকগবেষকরাও এসেছেন তাঁর হাত ধরে নানা কর্মশালায়। যতীনবাবু এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন নদিয়ার কদমখালিতে রাজ্য লালন মেলা সংগঠনের ক্ষেত্রে। ১৯৯০ থেকে ২০০৮ পযর্ন্ত কখনও কার্যকরী সভাপতি, কখনও সভাপতির ভূমিকা পালন করেছেন। লালন স্মারকগ্রন্থ 'অচিন পাখি' সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘদিন। এই মেলায় দুই বাংলার মেলবন্ধন ঘটানোর মূল কারিগর ছিলেন তিনিই। ওপারের বহু গবেষক, বহু শিল্পী এই মেলায় এসেছেন তার হাত ধরে। 'শঙ্খচিল' নামের একটি পত্রিকা সম্পাদনা করে চলেছেন এখনও, যার শুরু হয়েছিল আড়াই দশক আগে। কাজ করেছেন লোকাভিনয় অষ্টক নিয়েও।

বহিরগাছিতে 'বিজয় -লালন মেলা'রও স্রষ্টা তিনি। এ বছরও বাংলাদেশের শফি মণ্ডলের মতো যশস্বী লোকশিল্পী এসেছেন এই মেলায়। বহু পত্র -পত্রিকায় লোকবিষয়ে লিখেছেন, এখনও লিখছেন। আকাশবাণীতে নানা সময়ে আলোচনায়,কথকথায় অংশ নিয়েছেন।

লোকবিষয়ে দুই বাংলার মেলবন্ধনে একটি গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা এখনও পালন করে চলেছেন অশীতিপর যতীন্দ্রনাথ রায়। লোকসংস্কৃতির প্রতি নিবেদিত প্রাণ এই মানুষটি প্রত্যন্ত গাঁ-গঞ্জের বহু লোকশিল্পীকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছেন, যারা প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও পড়ে ছিল অবহেলায়,অন্ধকারে। লুপ্তপ্রায় লোকায়ত বহু বিষয়কে উজ্জীবিত করার প্রচেষ্টায় নিরত আছেন এখনও। বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে একজন নিষ্ঠ সংগঠক হিসেবে যতীন্দ্রনাথ রায়ের অবদান অনস্বীকার্য।

সমর রায়: শিক্ষাসাহিত্য সংস্কৃতিপ্রেমী ও সমাজ হীতব্রতী। মাস্টারমশাই যতীন্দ্রনাথ রায়

শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই যতীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় দীর্ঘ ৫০ বছরের। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়- ১৯৭৪ সালে আমার শ্রীকৃষ্ণ কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়ে বগুলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় গড়ে ওঠে। এই সুদীর্ঘ কালের যাত্রা পথে নানা উপলক্ষে, নানা কাজে, নানা অনুষ্ঠানে নানা ঘটনা পরম্পরায় তাঁকে দেখার ও জানার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।

তিনি ছিলেন হাট বহিরগাছি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে স্কুলটি মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়। তখন আমি ও সত্যদা (অর্থাৎ প্রয়াত অধ্যাপক সত্যরঞ্জন রায়) তাঁর অনুরোধে কিছুদিনের জন্য ওই স্কুলে একাদশ শ্রেণির আংশিক সময়ের ইংরেজি শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছিলাম। বস্তুত সেই সময় থেকে আরও নিবিড় ভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাস অনার্সের ছাত্র তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওই বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি লাভ করেন। সমাজসেবী পান্নালাল দাশগুপ্তের অনুপ্রেরণায় তিনি নানাবিধ

সমাজসেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি অকৃতদার। তাঁকে আমরা দেখি প্রধান শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব পালনের সঙ্গে সারা জীবন নানা গ্রামোন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে। তাঁর জীবনের আর একটা উল্লেখযোগ্য দিক হল– বাংলা সাহিত্যের বর্তমান কালের প্রোথিতযশা কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ ও সুগভীর পরিচিতি। তাঁর সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ছিল অন্নদাশঙ্কর রায় গৌরকিশোর ঘোষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় বাদল সরকারের মতো সাহিত্য জগতের বহু দিকপাল মনীষীর।

একবার তাঁর আমন্ত্রণে বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন ঘরানার নাটকের স্রষ্টা বাদল সরকার তাঁর নাট্যদল নিয়ে যতীনবাবুর বহিরগাছির বাড়িতে এসেছিলেন। আমরা হাটবহিরগাছি স্কুলের মাঠে তাঁর নাট্যদলের দুটি ছোট্ট নাটকের অভিনয় দেখেছিলাম। দুটি নাটকের একটি নাম ছিল –হট্টমেলার ওপারে। আর একটার নাম আজ আর আমার মনে নেই। তবে তার পটভূমি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তারপর দিন তাঁরা রানাঘাট লালগোপাল হাইস্কুল প্রাঙ্গণে ভূমা নামের আরেকটি নাটকের অভিনয় উপস্থাপিত করেছিলেন। কীভাবে কোনোরূপ সাজসজ্জা ও স্টেজ নির্মাণ ব্যতিরেকে তাঁর নাট্যকর্মীরা তাদের অভীষ্ট নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করেছিলেন তা ভাবলে আজও বিস্ময়াভিভূত হই। প্রথম নাটকটিতে একজন অভিনেত্রী হাওয়াই চটি পরা পায়ে খালি গলায় দুলাইন রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে অপূর্ব রোমান্টিক আবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। দ্বিতীয়টিতে বাদলবাবু হঠাৎ তাঁর শরীরটাকে দুমড়ে মুচরে হিরোশিমা নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের ফলে কত মানুষ বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে তার মর্মন্তদ ছবিটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। হিটলারের জার্মানিতে তখন কীভাবে মানুষকে বিষাক্ত গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করা হত তা ফোটানোর জন্য আর একটা দৃশ্যে দেখি হঠাৎ ৪-৫ জন অভিনেতা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে মুখে বিষাক্ত গ্যাস নিঃসরণের শব্দ করতে থাকে এবং ভিতরে দাঁড়ানো আরেকজন মানুষ। কিছুক্ষণ পরে হত চেতন হয়ে মনুষ্যনির্মিত গ্যাস চেম্বারের বাইরে ছিটকে পড়ে। ভূমা নাটকটিতে দেখানো হয়েছিল কীভাবে সুন্দরবন অঞ্চলের অসহায় মানুষেরা প্রবল ঝড় ও প্লাবনের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচার চেষ্টা করছে। লাউডস্পিকারে মুখ লাগিয়ে ঝড়বৃষ্টি ও প্লাবন আসার এফেক্ট সৃষ্টি করা হয়েছিল। ঝঞ্ঝা ও প্লাবন বিধ্বস্ত মানুষদের ভয়ার্ত কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের অসহায় বিপন্নতার ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। তার মধ্যে ভূমা নামক চরিত্রটি কাতর কণ্ঠে বলতে থাকে– বাবু ভূমার খিদা লাগে। ঝঞ্ঝা ও প্লাবন বিধ্বস্ত পরিবেশের মধ্যে তার অসহায় দুঃখার্ত কণ্ঠস্বর মনে করে আমাদের মন আজও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

আমরা মফসসলে থাকি। সব সময় কলকাতা গিয়ে এই ধরনের নাট্যকর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ নিতে পারি না। যতীনবাবু আমাদের কাছে সেই সুযোগ এনে দিয়ে তাঁর কাছে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আর শুধু এপার বাংলার কবি সাহিত্যিক নাট্যব্যক্তিত্বের সঙ্গে নয়, ওপার বাংলার বর্তমান কবি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জগতের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গেও তাঁর ব্যাপক ও নিবিড় পরিচয় গড়ে উঠেছে। তিনি অনেকবার বাংলাদেশে তাঁর এরকম অনেক বন্ধুর নিমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছেন। আবার ওদেশের অনেক বন্ধুকে তিনি এপারে আমন্ত্রণ করে এনে নানারূপ সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক আলোচনার ব্যবস্থা

করেছেন। মনে পড়ে, তাঁর ব্যবস্থাপনায় বহিরগাছিতে একবার এরকম একটি আলোচনা সভায় ওপার বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক ও সাহিত্য গবেষক ড. আবুল আহসান চৌধুরির বক্তব্য শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের। এভাবেই আপন ও একক উদ্যোগে এপার ও ওপার বাংলার চিরদিনের অন্তর্লীন যোগসূত্রকে অটুট রেখে তিনি এক অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

শঙ্খচিল নামক একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য সাময়িকী সম্পাদনা ও প্রকাশনা তাঁর আরেকটি প্রশংসনীয় কর্মদ্যোগ। বাংলা সাহিত্যের সব শাখায় উন্নত মানের লেখা ছাপিয়ে এটি একটি প্রথম শ্রেণির সাহিত্য পত্রিকার স্বীকৃতি আদায়ে সমর্থ হয়েছে। স্বনামধন্য অধ্যাপক ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরি তাঁর পত্রিকায় একজন নিয়মিত লেখক। এতে প্রকাশিত শ্রী রায়ের সাহিত্য সমালোচনা ও গবেষণামূলক লেখাগুলো থেকে তাঁর গভীর এবং বিশাল সাহিত্য অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রয়াত শ্রদ্ধেয় মানিক সরকারের সঙ্গে তিনিই নদিয়া জেলার মাজদিয়ার সন্নিকটে ভীমপুর কদমখালিতে বাৎসরিক লালন মেলা শুরু করেছিলেন –যা আজও অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। প্রখ্যাত কবিয়াল দুই বাংলার জনদরদী লোকসংগীত শিল্পী বিজয় সরকারের স্মরণে এপার বাংলার বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত বিজয়মেলার সঙ্গেও তিনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বগুলাতে আমরা ডক্টর বি আর আম্বেদকর স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে বাবা সাহেবের আদর্শ প্রচারে যে সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করি, সেগুলোতেও আমরা সব সময় তাঁর সহযোগিতা লাভ করে থাকি। সারা জীবন শিক্ষাশিল্প ও সাহিত্য ও সমাজ সেবামূলক নানাবিধ শুভকর্মে নিবেদিত প্রাণ শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ রায় একজন বিরল দৃষ্টান্ত। আত্মপ্রচার বিমুখ মিষ্টভাষী শোভন হৃদয় মানুষ। আমি তাঁর দীর্ঘ সুস্থ ও সুখী জীবন কামনা করি।

সম্বিতি পোদ্দার: বাবার সাথে একটা সম্পর্ক ছিল

যতীন্দ্রনাথ রায় সম্পর্কে বলতে গেলে আমাকে অনেক অতীতে চলে যেতে হবে এবং আমার বাবা লোককবি সুরেন্দ্রনাথ সরকারের কথা না বললেই নয়। বাবার সাথে একটা সম্পর্ক ছিল সেটা অবশ্যই লোক সাংস্কৃতিক জগতের মধ্যে দুজনেই বিচরণ করতেন বলে। সাংস্কৃতিক জগতের বেশির ভাগ অনুষ্ঠানেই যাওয়া আশা ছিল। যতীন্দ্রনাথ রায়কে আমি কাকু বলি। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। বিভিন্ন জায়গায় বাবাকে দিয়ে কবিগান করাতেন। আমিও বাবার সাথে সাথে কবিগানে যেতাম। ভীম পুর লালন মেলা আয়োজনে কাকুর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বহুদিন ধরে লালন মেলা পরিচালনা করে আসছেন। আমিও বহুবার কাকুর আমন্ত্রণে সেই মেলায় তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের থেকে বাউল গান গাইবার সুযোগ পেয়েছি। পুরোহিত বর্জিত শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান, বিবাহের উদ্দোগের আয়োজনে কাকুর বিশেষ ভূমিকা দেখেছি। একবার ওনার কোনো নিকট আত্মিয়ের বিয়োগে বাবাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের কাজ করতে ডেকে ছিলেন আমিও ছিলাম বাবার সাথে মনে পড়ে। সামাজিক দুস্থ শিশুদের নিয়ে ওনার অনেক চিন্তা ভাবনা দেখেছি। বাগদা শ্রীরামপুর বলে একটি অনাথ আশ্রমেও কাকুর আয়োজনে সঙ এন্ড ড্রামা ডিভিশন

থেকে সেখানে গান গাইতে গিয়েছি। কাকুর এই সমাজ সেবা মুলক কাজ সারা জীবন ধরে করে এসেছেন। এখনও বয়স কে তুচ্ছ করে কাজ করে চলেছেন। আরও অনেক কাজের সাথে আমার থাকার সৌভাগ্য হোয়েছে। আমি এমন একজন মহৎ মানুষের স্বান্যিধ্য পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি। ওনার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সলিল বিশ্বাস: তাঁকে যেমন দেখেছি

পশ্চিমবাংলায় লোকসংস্কৃতির চর্চায় যে ক'জন নিবেদিত অগ্রজ মানুষ বর্তমান, যতীন্দ্রনাথ রায় তাদের অন্যতম। নবতিপর বয়সেও লোকসংস্কৃতি সাহিত্যের খবরাখবরে তিনি মগ্ন। প্রধান শিক্ষক ছিলেন বহিরগাছি উচ্চ বিদ্যালয়ের। চিরকুমার। সংসার রন্ধন নেই। শিক্ষকতার বাইরে সংস্কৃতিচর্চায় সমর্পিত যাপন। তাঁর বৃত্ত পরিক্রমা করতে গেলে বৃহৎ পরিসর প্রয়োজন। যা এখানে সম্ভব নয়।

তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ আসাননগর ভীমপুর এর মধ্যবর্তী কদমখালি আশ্রমে। ৯০ সাল। লালনমেলার গোড়াপত্তনের বছর। সদা অবসরপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপসংস্কৃতি অধিকর্তা মানিক সরকারের পৌরহিত্যে চলছিল লালন তিরোভাব শতবর্ষ উদযাপনের প্রস্তুতি। সে বছর পয়লা কার্তিকে লালনের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হবে। সে উপলক্ষে আশ্রম প্রাঙ্গণে সভা। উপস্থিত পাশাপাশি দু গ্রামের উদ্যোগী কিছু যুবক ও নানা স্থান থেকে আগত সংস্কৃতিপ্রেমী গুণীজন। আলোচনা শেষে সভাপতি মনোনীত হন মানিক সরকার। সহ-সভাপতি যতীন্দ্রনাথ রায় ও বগুলা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক সুশান্ত হালদার। সংগঠনের নামকরণ হল লালন তিরোভাব শতবর্ষ উদযাপন সমিতি। যা পরের বছর থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালন মেলা সমিতি নামে ক্রম চলিষ্ণু।

সহ সভাপতি হলেও প্রথম থেকে যতীন্দ্রনাথ রায়ের সক্রিয়তা ছিল সর্বাধিক। যা তাকে পরবর্তীতে দীর্ঘ বছর সভাপতির পদে অভিষিক্ত করে। তাঁর যোগাযোগে বহু বরেণ্য গুণী মানুষ মেলায় এসেছেন। তালিকা করতে গেলে দীর্ঘ হয়ে যাবে। তবু কয়েকজনের নাম না বললে নয়। গৌরকিশোর ঘোষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আবুল বাশার আবুল আহসান চৌধুরির উপস্থিতি এক গৌরব উজ্জ্বল মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল লালনমেলাকে। দুই বাংলার বুদ্ধিজীবী শিল্পী মহল ও সাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল 'মানুষ সত্য' এর জয়গান।

নানা লোক সংগঠন সহ কবিয়াল বিজয় সরকার স্মারক সমিতিরও তিনি সভাপতি এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বয়সের ভারে যদিও এখন আগের মতো সক্রিয়তা নেই। তবে চেষ্টায় আছেন দীর্ঘ পথ পরিক্রমার ঝাঁপি খুলে গ্রন্থ প্রকাশ করার। তাঁর চেষ্টা সফল হোক। আমরা তাঁর অজানাকে জেনে আরও সমৃদ্ধ হব। তিনি শতবর্ষ অতিক্রম করুন।

ড. সাইমন জাকারিয়াঃ একজন সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ

যতীন্দ্রনাথ রায় এমন একজন সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ যিনি লোকায়ত সংস্কৃতির চর্চা, বিকাশ ও পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। তাঁর আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায়

গাড়াপোতা গ্রামে সুকান্ত স্মরণী ক্লাব আয়োজিত বৈশাখী অষ্টক মেলায় যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত অষ্টক দলের পরিবেশনার সঙ্গে বাংলাদেশের অষ্টক-সংস্কৃতির সম্পর্কসূত্র আবিষ্কার করে অত্যন্ত ঋদ্ধ হয়েছি। এছাড়া, যতীন্দ্রনাথ রায় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন নদীয়ার মুড়াগাছা, হাঁসখালী, বগুলায়, পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন জয়শ্রী পুতুল নাচ দলের শিল্পীদের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে অনুভব করেছি, তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোকায়ত শিল্পীদের পরম-আত্মীয়। প্রতিটি মানুষকে তিনি লোকায়ত সংস্কৃতি চর্চায় যেভাবে প্রেরণা দেন তা এ-যুগে বিরল। এমনকি গবেষকদের তিনি যে সাহায্য, সহযোগিতা করেন তা দেখে অভিভূত হতে হয়। যতীন্দ্রনাথ রায়ের মতো লোকায়ত সংস্কৃতি সাধকের সাক্ষাৎ না পেলে আমার গবেষণার অনেক কিছু অপূর্ণ থেকে যেতো। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে কিংবদন্তিতুল্য লোক-সাধক যতীন্দ্রনাথ রায়কে ভক্তিপূর্ণ প্রণতি জানাই।

সিদ্ধার্থ বসু: একটি বর্ণময় জীবন

রানাঘাটে তখন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নাটক গান কবিতার আসর নিয়ে একদল তরুণ যখন মগ্ন সেই সময়েই আমার পরিচয় ঘটে বহিরগাছি স্কুলের হেডমাস্টার মশাই যতীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে। খুবই সাধারণ চেহারা। ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা লম্বা চেহারার মানুষটির কাঁধে থাকত শান্তিনিকেতনী ঝোলা ব্যাগ। আড়চোখে চশমার আড়ালে থাকা চোখ দুটোর ঔজ্জ্বল্য ছিল আকর্ষণীয়।

তিনি তখন লোকসংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে যুক্ত। তার সঙ্গে চলেছে তাঁর শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত টেগোর সোসাইটির কাজ নিয়ে ছুটে বেড়ানো। কখনও কলকাতা কখনও দত্তপুলিয়া, বাণীপুর সর্বত্র তাঁর যাতায়াত। দত্তপুলিয়ার শ্রীমা মহিলা সমিতি থেকে পান্নাবাবু প্রতিষ্ঠিত 'কম্পাস' কাগজের কাজে ব্যস্ত একটি মানুষ।

অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে তিনি কখনও লালনমেলা নিয়ে ছুটে চলেছেন এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলায়। বিজয় সরকারের অনুষ্ঠানে তাঁর আন্তরিক ডাকে বাংলা আকাদেমি ঘরে উপস্থিত লেখক মহাশ্বেতা দেবীর মতো মানুষ। যতীন্দ্রনাথ রায়ের কথা আমি স্মরণ করেছি আমার 'অন্য মহাশ্বেতা' বইতে। তিনি তাঁর কর্মময় জীবনে সান্নিধ্যে এসেছেন এপার ও ওপার বাংলার বহু গুণী মানুষের। তাদের মধ্যে অন্যতম অন্নদাশঙ্কর রায়। আবু আহসান চৌধুরি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মানুষ। সব মিলিয়ে সদা কর্মময় ও বর্ণময় জীবনের অধিকারী তিনি।

সুধাংশুকুমার বিশ্বাস: আমার চেনা যতীন্দ্রনাথ রায়: সংস্কৃতিবান এক নিপাট ভালো মানুষ

যতীনবাবুকে চিনি সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। তখন আমি স্কুলে পড়ি। তাকে বহিরগাছি উচ্চ বিদ্যালয়ের সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত, হালকা গড়ন, রাশভারী এক প্রধানশিক্ষক হিসেবে প্রথম চিনি। তাঁর পোশাকের মতোই আপাদমস্তক সাদা মনের মানুষ তিনি। সময় গড়ানোর সাথে সাথে নিকট সান্নিধ্য পেয়েছি তাঁর। বুঝেছি অকৃতদার এই মানুষটি গৃহের

কারাগারে বন্দি হতে চাননি। দু'হাত বাড়িয়ে অনিঃশেষ জ্ঞানের আলোক বিলিয়ে দিয়েছেন অসংখ্য শিক্ষার্থীর অন্তরে।

একদা ছায়াঘেরা বহিরগাছি গাঁয়ের শান্ত ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সান্নিধ্য পান ফরিদপুরের গাঁধি চন্দ্রনাথ বসু আর সমাজবন্ধু পান্নালাল দাশগুপ্তের। তাদের সঙ্গে দত্তপুলিয়া বড়বড়িয়া বরণবেড়িয়া সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থার আমুল সংস্কারের কাজে সপে দিয়েছিলেন নিজেকে। যতীন বাবুর জীবনে প্রত্যাশাহীন উদারতার বীজ বোধ হয় তাঁরাই বপন করে দিয়েছিলেন। চোদ্দ পুরুষের ভিটেহারা উদ্বাস্তু মানুষের উজান বেয়ে যাওয়া সময়ে তাদের সমব্যথী হয়ে তিনি পাশে দাঁড়িয়েছেন। পরবর্তীতে শ্রদ্ধেয় পান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'কম্পাস' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। সেই শুরু, পরে 'দিশারী' পত্রিকা চালু করা, ১৯৮৮তে 'শঙ্খচিল' পত্রিকা সম্পাদনা থেকে শুরু করে ১৯৯০ এ ভীমপুরের বিখ্যাত লালন মেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিয়োজিত করেছিলেন নিজেকে। কবি 'বিজয় সরকার স্মারক সমিতি'র সভাপতিত্ব, কলকাতার 'ভাষা শহিদ স্মারক সমিতি'র সহ সভাপতি দায়িত্ব পালন করেছেন একনিষ্ঠভাবে। আর এসব করতে গিয়ে এপার বাংলা ওপার বাংলার অসংখ্য গুণী মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন। কাজ করেছেন অনেকের সাথে। এপার বাংলার কবি অন্নদাশঙ্কর রায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পন্ডিত অম্লান দত্ত মানিক সরকার সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল সুখবিলাস বর্মা আবু সৈয়দ আইয়ুব গৌরী আইয়ুব প্রমুখের সাথে যেমন সখ্য তৈরি হয়েছে, তেমনই ওপার বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শামসুর রহমান সাইমন জাকারিয়া ইয়াসমিন আরা সাথি প্রমুখের সাথে হয়েছে পরিচয়। 'মনের মানুষ' ছবির নেপথ্য সংগীতশিল্পী জনাব লতিফ শাহ্ তো তাকে গুরু বলে সম্মোধন করেন। তাঁর আহবানে বিশিষ্ট নাট্যকার শ্রদ্ধেয় বাদল সরকার সদলবলে বহিরগাছি গাঁয়ে এসে নাটক করে গেছেন। আমি যতদূর জানি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট লেখক শ্রী স্বরোচিষ সরকার মহাশয় টুনটুন ফকির সহ অনেক গুণী পন্ডিত তাঁকে অসম্ভব ভালোবাসেন।

শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ রায় ২৪ বছর হল কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। বয়স হয়েছে। এখনও সমান প্রাণপ্রাঞ্চল, লোকসংস্কৃতির অনলস পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন। আমি কৃতজ্ঞ এই ভেবে যে, আমার মতো সামান্য মানুষের সাথেও তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। প্রণাম জানাই এই গুণীকে।

সুব্রত বিশ্বাস: শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় —মাস্টারমশাই

লালন ফকিরের তিরোভাব শতবর্ষে কুষ্টিয়ার (বাংলাদেশ) ছেউড়িয়াস্থিত লালন সাঁইজির আখড়াবাড়ি থেকে মাটি সংগ্রহ করে ১৯৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার আসাননগর ভীমপুর গ্রামের সংযোগস্থলে কদমখালি লালন তীর্থে লালনের নামাঙ্কিত সর্বপ্রথম বেদি ও মেলার সূচনা করেন দুই বাংলার লালন অনুধ্যানী বিশিষ্টজনেরা। সদ্য কলেজ পড়ুয়া ছাত্র হিসাবে আমার পারিবারিক দু একজ্ন অগ্রজ ও তাদের বন্ধুবান্ধব অগ্রজদের লালন সম্পর্কিত কাজের প্রচার বা মানবতাবাদের প্রসারে লোকায়তিক সংস্কৃতির অগ্রণী সৈনিক বা সংগঠকের ভূমিকায়

দেখেছি। দেখেছিলাম লোকসংস্কৃতির ধারক বাহকদের, বাউল ফকিরদের আপনজন যতীন্দ্রনাথ রায়কে। কবে কখন বলতে পারব না, নিজের অজান্তেই কিছুটা বইপত্রের সৌজন্যে পরিষ্কার ধারণা জন্মেছে মহাজন ও তাদের পদের আবেদন লোক ধর্মমতের প্রাসঙ্গিকতা, লোকায়ত সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা, ধর্ম উপধারা ও তার ধারক বাহকদের প্রতি। ধারনাটিকে পরিস্ফুট করেছেন আলোচনার মাধ্যমে তাদের মধ্যে অন্যতম যতীন্দ্রনাথ রায়।

প্রকৃতির নিজস্ব একটা দর্শন আছে। আর একে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত করে মানুষ যা সৃষ্টি করে তা হল সামাজিক। প্রাকৃতিক আইন মেনে যদি মানুষ ইতিবাচক তথা মানবিক দর্শনের জন্ম দিত। তাহলে মানুষের জীবন এবং বোধ আলোকিত থাকত সব সময়। সংস্কৃতি সত্ত্বায় এমন বিশ্বাসগুলো যদি স্থায়ীভাবে গ্রথিত থাকত, তাহলে মানব সংস্কৃতি এত নিম্নদিকে ধাবিত হত না। যেদিন থেকে শাস্ত্রধর্মের যাত্রা শুরু হয়েছে। কিংবা অজানা বিষয়ের প্রতি মানুষ মাথা নত করেছে। কিংবা শাসকের শাসন লিপ্সায় মানুষের মানবিকতায় পরাজিত হয়েছে। সেদিন থেকে হারানো শুরু করেছে মানুষের প্রকৃত ধর্ম।

ধর্মকে অধর্ম এবং অধর্মকে ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার যারা কারিগর তাদের সক্রিয়তার পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। লালন বিজয়ের প্রদর্শিত পথে এদের বিরুদ্ধে আপনার লড়াই আরও বেগবান হোক। অসাম্প্রদায়িক চেতনার একজন আলোকিত মানুষ হিসাবে আপনার পাশে থেকে আপনার কাজের শরিক হতে চাই আরও অনেক বছর। আপনি সুস্থ থাকুন মাস্টারমশাই। আপনাকে প্রণাম।

প্রফেসর সুরঞ্জন মিদ্দে: কারোর কাছে 'যতীন বাবু' কারোর কাছে 'যতীন দা'

● মানুষ যতীন দা:

যতীন দা। যতীন বাবু। যতীন্দ্রনাথ রায় একজন নম্র বিনয়ী মানুষ। যিনি ৩৩ বছর হেডমাস্টার ছিলেন। তাঁর নম্রতায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জাগায়। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। যেন তিনি আমার আত্মার আত্মীয়। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়- বিজয়মেলা ও লালনমেলাকে কেন্দ্র করে। মানুষ যতীন্দ্রনাথ একজন অসাধারণ মানবপ্রেমিক যোদ্ধা। সারা জীবন সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তিনি সবার সাথে মেশেন। সবার সঙ্গে কথা বলেন। সবার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। তাঁর কাছে যে কোনও সমস্যার কথা জানালে সমাধানের চেষ্টা করেন। মানে, আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন। কার গবেষণা কোথায় করাতে হবে? কার থেকে উচ্চশিক্ষার বই সংগ্রহ করতে হবে? সবার সমস্যায় তিনি অগ্রণী ভূমিকায় সবার আগে যান। শীত হোক, ঝড়-জল হোক, সবার আগে যতীন দা ছুটে যান। মানুষ যতীন্দ্রনাথ রায় যেন সাধারণ দলিত শোষিত মানুষের লোকায়ত রায়। তিনি প্রকৃত শিক্ষক। আদর্শ শিক্ষক। তাঁর রক্তের মধ্যেই শিক্ষকতার বীজ আছে। তাই তাঁকে জাত শিক্ষক বলা হয়। তিনি শুধু ক্লাসের মধ্যেই তাঁর শিক্ষকতার সীমানায় আটকে থাকেন না। তাঁর শিক্ষার বিস্তার প্রসারিত হয়েছে- স্কুলের সীমানার বাইরে। তাঁকে দুই বাংলার অগণিত মানুষ ভালোবাসেন। দুই বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চায় তাঁর নাম সবাই জানে। যতীন দা আসলে দুই বাংলার সেতু বন্ধন।

ফেলে আসা পূর্ব বাংলার মায়া তিনি কখনও ভুলে যেতে পারেননি। পশ্চিমবাংলার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েও তিনি বারবার ছুটে গেছেন পূর্ববাংলার রূপসী বাংলার পল্লি ছায়ায়। মানুষ হিসাবে তিনি অনন্য। প্রগতিবাদী। তাঁর কাছে ধর্ম- বর্ণ —রাজনীতি, ধনী - গরীব সবাই সমান। তাঁর ৮৫ তম বছরে তাঁর প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা।

● সম্পাদক সংগঠক যতীনদা:

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ। দেশ ভাগ হয়ে গেছে। যশোরের জন্মভূমির মায়া ফেলে মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি ভারতে এলেন। সেই ১২ বছর বয়স থেকে ৮৫ বছর বয়স পর্যন্ত একটি জীবন; যেন একই সঙ্গে ইতিহাস ও ভূগোল হয়ে উঠেছেন। বিখ্যাত স্কটিশ চার্চ কলেজের (১৮৩০) ইতিহাস অনার্সের কৃতি ছাত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম এ করলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। তাঁর শিক্ষকেরা ছিলেন এক একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। অসীম দাশগুপ্ত সুশোভন সরকার থেকে অমলেশ ত্রিপাঠী। তাঁদের আদর্শে তিনি স্বদেশ ব্রতে উজ্জীবিত হয়েছিলেন। যা তিনি আজও ৮৫ বছর বয়সেও বিচ্যুত হননি। মরমি কবি বিজয় সরকার মেলা মানে যতীনদা। লালন ফকির মেলা মানেই যতীনদা সভাপতি। সভাপতি যতীন দা দুই বাংলাকে মিলিয়ে ছিলেন বাউল মেলার মিলন মোহনায়। আজও দুই বাংলার বাউল প্রেমী মানুষেরা যতীনদাকে ভালোবাসেন। এখনও তাঁরা মনে করেন- যতীন্দ্রনাথ রায় লালনমেলার সভাপতি আছেন। যতীন দা ছাড়া লালনমেলা বা বিজয়মেলা বেমানান।

আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। বিজয়পুত্র কাজল অধিকারী- যতীন দাকে আজও শ্রদ্ধা করেন। পরামর্শ মতো কাজও করেন। আজও আমায় বিষয় লাগে- নদিয়ার বহিরগাছি থেকে ঠিক সময়ে কলকাতার অনুষ্ঠানে হাজির থাকেন। তাঁর 'লেট' নেই কোনো অনুষ্ঠানে। আর লালনমেলা বা বিজয়মেলা হলেই স্মারক পত্রিকা বার হবেই। মেলা থেকে পত্রিকা সব কিছুতেই যতীন দার সক্রিয় শ্রম থাকবেই। ঠিক সময়ে পত্রিকা প্রকাশ করবেনই। আমাদের মতো অর্বাচীনকে তিনি লেখার জন্য বার বার ফোন করে, লেখা নেবেনই। যতীন দা আসলে কাজের মানুষ; দায়িত্বশীল মানুষ। সমাজের প্রতি, সংস্কৃতির প্রতি তাঁর দায়িত্ব নিষ্ঠা ভরে পালন করেছেন। আমি বলি- যতীন্দ্রনাথ রায় কর্মবীর। কাজের মধ্যেই তিনি ভালো থাকেন। নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে সংস্কৃতি চর্চার সংগঠন করেন। নিজের অর্থ ব্যয় করে ৩৬ বছর ধরে 'শঙ্খচিল' পত্রিকা প্রকাশ করে যাচ্ছেন। এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা।

যতীনদার সঙ্গে আমরা বাংলাদেশের নড়াইলে গিয়েছিলাম। বিজয় জন্মোৎসবে। তখনই অনুভব করেছিলাম সংগঠক যতীনদার সাংগঠনিক দক্ষতা। তিনি আমাদের নড়াইলের বিজয়গ্রাম থেকে লালন ফকিরের আখড়া হয়ে শিলাইদহ পর্যন্ত ঘোরাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। যার জন্য আমি সারা জীবন তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। সংগঠনে তাঁর দক্ষতার ক্ষমতার প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম- আজীবন তা থাকবে। এখনও তিনি ৮৫ বছর বয়সে সদা সক্রিয় আছেন।

তাঁর কর্মমুখর জীবনে- নবীনদের তিনি সবসময় উৎসাহ দিয়ে গেছেন। তাঁর হেডমাস্টারের তকমা ঝেরে ফেলে সবার সঙ্গে বন্ধুর মতো মিলে যেতেন। এখানেই যতীন্দ্রনাথ রায় যেন জনগণের রায় হয়ে গেছেন। মানুষের হৃদয়ের শিক্ষক হয়েছেন। তিনি শুধু হেড স্যার নন- তিনি দক্ষ সংগঠক, সুচারু সম্পাদক।

সুশান্ত রায়: যেমন দেখেছি

জন্ম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের যশোর জেলা রাধাকান্তপুর নামক গ্রামে। ভারত স্বাধীন হলে আমার ঠাকুরদা ঠাকুরমা, বাবা এবং যতীন দা ভারতবর্ষের বহিরগাছি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ঠাকুরদা ছিলেন প্রবল শিক্ষানুরাগী। তিনি বাবার সাহায্যে আড়ংঘাটা ইউএম ইনস্টিটিউশনে নবম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। তারপর মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ হয় সব কলকাতায়। আমরা ছোটোবেলায় খুবই কম দেখেছি দাদাকে। আমি তখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি তখন আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দাদাকে পাই। বহিরগাছি অঞ্চলের আবাসিক উত্তরসূরীদের শিক্ষার প্রয়োজনে ভিটামাটি ছেড়ে আসা এলাকার বাসিন্দারা সমবেতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন বহিরগাছি হাইস্কুল। যে স্কুলটি গড়ার প্রয়োজনে প্রথম জমিটি দান করেছিলেন অন্যতম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় কেশবলাল রায়। আমাদের জ্যাঠামশাই এবং তারই প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের অনুমোদন সম্ভব হয়। কেশবলাল রায় আড়ংঘাটা ইউএম ইনস্টিটিউশন এবং পালচৌধুরি স্কুলের জন্য অর্থ দান করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র মৃধা প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলে প্রধান শিক্ষকের শূন্যস্থানে সদ্য স্নাতকোত্তর পাস দাদাকে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হয়। প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী ও জ্ঞানের অধিকারী। বিশেষভাবে ভাষা ও ইতিহাস বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অসীম। ছাত্ররা তাঁর শিক্ষালাভের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। তবে তিনি ছিলেন কঠোর প্রকৃতির শিক্ষক।

তিনি বহু মানুষের উন্নতির জন্য সামাজিক দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন কখনও অর্থ বা পুস্তক সাহায্যের মাধ্যমে। নিজে অকৃতদার থেকে গৃহ সমাজের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাছাড়া বহিরগাছি রেলস্টেশন, বহিরগাছি বালিকা বিদ্যালয়, উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে কমিউনিটি সেন্টার গঠনে তাঁর প্রধান ভূমিকা রয়েছে। তাঁর বিশেষ অবদান বহিরগাছি লালন বিজয় উৎসব উৎযাপন। তাছাড়া আসাননগর ভীমপুরে লালন উৎসবের উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। সৃষ্টিকাল থেকে সামগ্রিক উন্নয়ন ও সাংগঠনিক ভাবে তিনি অনেক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সেই দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন।

তাঁর বিশেষ উৎসাহে শিল্পী ও সাহিত্য নিয়ে তিনি এপার বাংলা ওপার বাংলায় পরিচিত হয়েছেন। সব শিল্পী সাহিত্যিকদের সাথে তিনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিলেন। আমি নিজেও কয়েকবার তাঁর সঙ্গে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। মাজদিয়াতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতেও সাহিত্যসভার তিনি ছিলেন সভাপতি। তিনি কবিগানের ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজে একজন নাট্যরসিক ব্যক্তি ছিলেন এবং বহিরগাছিতে ‘দিশারী’ নামক নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘদিন পরিচালনা করেছিলেন। পুতুলনাচ এবং বিশেষ করে হারিয়ে যাওয়া গ্রাম বাংলার আর একটি শিল্পও অষ্টকগান পুনরুদ্ধারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি একজন চলমান বহুমুখী প্রতিভা। তাঁর কথা কোনোভাবেই লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমার মতো বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে তো একেবারেই অসম্ভব। তিনি বহুবার লালন জন্মভূমি কুষ্টিয়ার ছেউরিয়াতে গেছেন। সেখানে পরিবেশিত তাঁর বক্তব্য দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হয়েছে। তাকে বহু স্থান থেকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। তাঁর সুললিত বক্তব্য দুই বাংলা দূরদর্শন থেকে সম্প্রচারিত হয়েছে।

তাছাড়া তিনি প্রধানশিক্ষক থাকাকালীন আকাশবাণী বেতার কেন্দ্রে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ক্লাস করিয়েছেন। আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অংশকালীন শিক্ষক ডঃ সুজিতকুমার বিশ্বাস মহাশয় যখন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে দাদাকে নিয়ে একটি বই লিখবেন, এবং তাতে আমাকে দুইশত শব্দের মধ্যে একটি লেখা দিতে হবে। তখন আমি অকুল সমুদ্রে পড়লাম। যে, কীভাবে তাঁর কথা অল্প কথাতে প্রকাশ করব? তবে তাঁর মতো দিকপালকে নিয়ে লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবু কর্তব্য সমাধা করতে কলম ধরা।

নিজের লেখালেখি ও পত্রিকার সম্পাদনার মধ্যেই নিয়োজিত থাকতেন আমার দাদা। তিনি ছিলেন মিতব্যয়ী। অকারণে কিছুই খরচ করতেন না। না সময়, না অর্থ, না নিজের পরিধেয় বস্ত্র নিজের মধ্যেই নিজেকে ধ্যানমগ্ন করে রাখতেন। আমার ধারণা তিনি ধর্ম তথা হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ছিলেন। তথাকথিত কোনো ধর্মমতের প্রতি তাকে আকর্ষিত হতে দেখিনি। প্রচলিত কুসংস্কার প্রবল বিরোধী আমার দাদা। তাঁর মতো পন্ডিত বিদগ্ধ বহুমুখী প্রতিভার মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য; কিন্তু বিধি নাচার।

তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বকে আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে দূরে থাকতাম। ব্যক্তিগত জীবনে তাকে কোনোদিন অলসতা বা খেলা আড্ডা মারতে দেখিনি। তিনি যখন পুকুরে স্নান করতে যেতেন, সবাই শত হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি ছাত্রদের নিজের সন্তানের মতোই দেখতেন এবং ছাত্রদের উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন। অল্প পারিশ্রমিক থাকলেও তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষকের অনুপস্থিতির কারণে সৃষ্ট শুন্য ক্লাসে দায়িত্বে তিনি ক্লাস নিতেন। প্রয়োজনে সারাদিন একটানা ক্লাস নিতেন আর যেকোনো বিষয়ের ক্লাস নিতেই তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

তিনি 'শঙ্খচিল' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করেন। সম্পাদক হিসেবে আমাকে অনেকবার বলেছেন লেখা দিতে কিন্তু আমি বকলম। এত দেশ-বিদেশে তিনি ঘুরে বেড়ান বিভিন্ন কাজকে ভালোবেসে। দাদার মতো বটবৃক্ষের সান্নিধ্য পেয়ে এখনও কিছু লেখা হল না এটাই আফসোস। আমার দাদা ও শিক্ষক মহাশয়কে প্রণাম জানিয়ে এখানে সমাপ্তি টানলাম।

স্বপনকুমার গুহ : শিক্ষক, গবেষক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক শ্রীযুক্তবাবু যতীন্দ্রনাথ রায়

শ্রীযুক্তবাবু যতীন্দ্রনাথ রায় মহোদয় বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশমনাতায় নিরুলস কর্মউদ্যোগী মানুষ। লোকজ সাংস্কৃতিক চর্চায় সৃজনশীল শিল্পী ও স্মরণীয় সুধীজনদের সৃষ্টিশীল কর্মের সাথে পরিচিতি ও সংযুক্তির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কর্মরত একজন নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক ও উদ্যোক্তা। বাংলার লোকপ্রিয় কবিয়াল বিজয় সরকারের সৃজনশীল কর্মের সাথেযুক্ত শিল্পী, গবেষক, সংগঠক, শ্রোতাদের মেলবন্ধন সৃষ্টির জন্য বিজয় সরকারের পুত্র কাজল অধিকারীর সাথে যুক্ত হয়ে কেউটিয়ায় গড়ে তোলেন "লোককবি বিজয় সরকার স্মারকসমিতি"।

এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে পশ্চিম বাংলায় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক লোকসংস্কৃতি গবেষক, শিল্পীদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও

কর্মসহায়তায় যুক্ত করেছেন। বাংলাদেশের কবি বিজয় সরকার ফাউন্ডেশন (নড়াইল) এর সাথেও সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছেন। ২০০২ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যতবার বাংলাদেশে এসেছেন এবং আমি কেউটিয়া, শান্তিপুর, নদিয়া, রানাঘাট, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গিয়েছি, ততবারই তিনি আমাকে বিজয়-লালন ও লোক সাংস্কৃতিক ধারা চর্চা ও গবেষণা কর্মের সাথে যুক্ত বিশিষ্টজনদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্মসহযোগী হিসেবেও যুক্ত করেছেন। ১৯৯৫ সাল থেকে ঐতিহ্যবাহী লোকজ ধারা পটগানের নবরূপায়নের কাজ করেছি। আমাদের সংগঠন রূপান্তর-এর মাধ্যমে। বর্তমান সময় পর্যন্ত দুই শতাধিক পটগান তৈরি করেছি। বাংলাদেশ, ভারত, সুইডেন, চীন, লাও, থাইল্যান্ড, কানাডা, শ্রীলঙ্কা, কেনিয়ার মত দেশে এই ধারার চর্চায় যুক্তকরণের কাজে যুক্ত রয়েছি। কবি বিজয় সরকারের জীবন ও কর্মের উপর তৈরি পটগানটি নড়াইলের উৎসবে দেখার পর যতীন্দ্রনাথ রায় ও কাজল অধিকারী মহোদয়ের উদ্যোগে কেউটিয়ায় কয়েকবার প্রদর্শনী করেছি। বিজয় সরকারের উপর যেসব কাজ করছি তার জন্য তিনি নদিয়া জেলার, বাহিরগাছিতে আয়োজিত বার্ষিক 'পশ্চিমবঙ্গ বিজয়-লালন মেলা ও লোক উৎসব' (২০১৪)- তে সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান করেন আমাকে এবং আমার সহযোদ্ধা কবি ইলিয়াস ফকিরকে।

বাংলাদেশের স্বনামধন্য লোকসংস্কৃতি গবেষক, কুষ্টিয়ার ফোকলোর ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ড. আনোয়ারুল করিম ও কবি বিজয় সরকার ফাউন্ডেশনের উদ্যোক্তা আকরাম সাঈদ চুন্নুর সাথে যতীন্দ্রনাথ রায় ও কাজল অধিকারীর উদ্যোগে পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট গবেষকবৃন্দ ও বাংলাদেশের গবেষকবৃন্দের সম্মিলিত অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। বাংলাদেশের লোকজ ধারা অষ্টকগান, জারিগান, তর্জন, কড়চা, কবিগান, হালুইগান, প্যাঁচালী, পুঁথিপালা, পালা কীর্ত্তণের মত ধারাসমূহের বিকাশমানতা ও চর্চায় কর্মরত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের গবেষণাধর্মী কর্মকান্ড পরিদর্শন ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় খুলনাতে। ড. রতন নন্দী, ড. সুরঞ্জন মিদ্দে, ড. শক্তিনাথ ঝা, সোহিনী চক্রবর্তী ও আরও গুণীজনের উপস্থিতি ছিল। আমাকে পশ্চিম বাংলার সমাজ উন্নয়নের কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শনে সহায়তা করেছিলেন। রানাঘাটের 'ঊষা গ্রাম'। তাছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন কর্মউদ্যোগ সম্পর্কে পরিচিতি ও ধারণা বিনিময়ে সহায়তা করেছেন। পান্নালাল দাসগুপ্তের টেগর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্টের কর্মকান্ড এবং 'কম্পাস' এর মত পত্রিকার লেখক হিসেবেও অনেক কিছু জানার সুযোগ হয়েছিল। 'কাটা তারের এপার ওপার'-এর লেখক হিসেবেও তিনি সম্মানিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যতীন্দ্রনাথ রায়কে আমি দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মৈত্রী ও লোকজ সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক, প্রেরণাদায়ক ও মানবদরদী শিল্পসেবক হিসেবে মূল্যায়ন করছি। সেই সাথে সার্বিক সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনাও রইলো।

স্বপনকুমার ভৌমিক: যতীন্দ্রনাথ রায় আমার এক প্রিয় মানুষ

সালটা ১৯৮৩ সুশান্ত বাবু শ্রদ্ধাভাজন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুশান্ত হালদার আমি তাকে মাস্টার মশাই বলেই ডাকতাম। তিনি আমাকে বললেন স্বপন এবারে আমরা কৃষি সাহিত্য

পত্রিকা ওই স্কাসের যৌথ উদ্যোগে মাজদিয়া রেলবাজার হাই স্কুলে গুণীজন সম্মাননা ও কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করব।

আমি বললাম এটা খুবই আমাদের আনন্দের কথা। সেইমতো আমরা প্রস্তুতি নিলাম। অনুষ্ঠানের দিন সর্বপ্রথম মাজদিয়া রেলবাজার হাই স্কুলের হলঘরে পরিচয় হলো। সুশান্ত বাবু মাস্টার মশাই পরিচয় করিয়ে দিলেন, বললেন ইনি যতীন্দ্রনাথ রায় বহিরগাছি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক খুবই গুণী মানুষ যোগাযোগ রেখো যতীনদার সাথে।

সেই শুরু আজও তার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তারপরে ১৯৯০ সালে পান্নালাল দাশগুপ্ত এসেছেন পরবর্তীতে সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এসেছেন দুবার ১৯৯০ সালে একবার ১৯৯১ সালে আর একবার।

আমাদের প্রতিটি অনুষ্ঠানে যতীন বাবুর উপস্থিতি আবশ্যিক ছিল। আমরা বগুলা আরংঘাটা মাজদিয়া কলকাতা পরবর্তীতে ভীমপুরের কদমখালী সর্বত্র যতীনবাবু ছাড়া আর সুশান্ত হালদার ছাড়া আমরা কোন অনুষ্ঠানে কথা ভাবতেই পারতাম না। বেশিদিন নয় এক বছর আগেও আরংঘাটা তে চূর্ণী নদীর তীরে আমি ডেকে এনেছি নদীর দূষণ সম্পর্কে কথা বলার জন্য। তিনি শ্রাদ্ধ হয়ে একটি মারুতি গাড়ি ভাড়া করে ছুটে এসেছেন সাক্ষাৎকার দিতে। এমনই আন্তরিক টান ছিল আমার প্রতি। ছোটো ভাইয়ের মতোই স্নেহ করতেন সবসময়ই। এটা ছিল আমার বাড়তি পাওনা।

প্রায় প্রতিদিন তিনি ফেসবুকে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন এমনকি মেসেঞ্জারেও লেখেন বার্তা। আমাদের আরেকজন সকলের প্রিয়জন শ্রী মোহিত রায়ের যেকোনো বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে তিনি ছুটে এসেছিলেন বিশেষত অষ্টক ও শিবনিবাস বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত।

আজকের সমাজে সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে যতীন বাবুদের মত মানুষের বিশেষ প্রয়োজন। তার কাজকর্মে তিনি আমাদের মধ্যে আছেন এবং থাকবেন।

যাদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে

অনির্বাণ বসুঃ কিউরেটর, ঐতিহ্য সংগ্রহশালা, রানাঘাট
অনুপকুমার ঘোষঃ শিক্ষক ও গীতিকার
অনুপ মণ্ডলঃ কবি চিত্রশিল্পী সাংবাদিক ও সংগঠক
অপূর্ব দেঃ অধ্যাপক অভিনেতা নাট্যকার
অরুণ বিশ্বাস -গোঁসাইঃ লোককবি ও সংগ্রাহক
আনোয়ারুল করিম: বিশ্বমানের শিক্ষাবিদ ও লেখক, বাংলাদেশ
আলম আরা জুঁইঃ অধ্যক্ষ,মানসিক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ
উৎপল ঝাঃ প্রাক্তন সচিব পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরঃ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও রাজ্য সম্পাদক, প্রগতি লেখক সংঘ।
করুণাপ্রসাদ দেঃ কবি ও সাহিত্যিক
কল্যাণী ঠাকুরঃ দলিত সাহিত্যের লেখিকা

কাকলিধারা মন্ডল অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কাজল অধিকারীঃ লোক সংস্কৃতির সংগঠক ও লোককবি বিজয় সরকারের সুযোগ্য পুত্র
কার্তিকচন্দ্র বিশ্বাসঃ সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ নৌকাবাইচ সংস্থা
কুঞ্জবন বিশ্বাস, প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক, লেখক, লোকগবেষক ও সংগঠক
কৃষ্ণপদ বিশ্বাসঃ সাহিত্যিক, লোককবি বহিরগাছি
ক্ষিতীশচন্দ্র বর -সরকারঃ লোককবি
খৈবর রহমান খানঃ লোকশিল্পী বাউল
গণেশচন্দ্র মন্ডলঃ আকাশবাণী অধিকর্তা
গৌতম অধিকারীঃ শিক্ষক, হিন্দু স্কুল, বক্তা ও লেখক
গৌতম চট্টোপাধ্যায়ঃ প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ও লেখক
জীবন রায়ঃ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, বোস্টন, আমেরিকা
তপন বাগচিঃ কবি ও ফোকলোরবিদ; বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক
তরুণ রায়ঃ বহিরগাছি
দীনবন্ধু সরকারঃ শিক্ষক ও সংগঠক
দেবদুলাল কুণ্ডুঃ শিক্ষক ও লেখক- গবেষক
দেবাশিস বিশ্বাস -মুরারিঃ শিক্ষক ও গীতি সংগঠক
নিতাইচন্দ্র বিশ্বাসঃ সহকারী বাংলা শিক্ষক, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য সমালোচক, বোলপুর, শান্তিনিকেতন
নিতাইপদ সরকারঃ লোকসংস্কৃতি কর্মী, কেউটিয়া
নিরঞ্জন অধিকারীঃ বাংলাদেশ
নিশিকান্ত বিশ্বাসঃ প্রাক্তন শিক্ষক ও সম্পাদক ছাত্রশিক্ষক মিলন মঞ্চ
নীতীশ বিশ্বাসঃ প্রাক্তন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার , কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
নীলাদ্রিশেখর সরকারঃ সরকারি কর্মী ও কবি সংগঠক
নূরে আলম ফকিরঃ লোকশিল্পী
পরিমল রায়ঃ লেখক
পলাশকান্তি বিশ্বাসঃ কবি ও লেখক
পল্লবকান্তি বিশ্বাস ভারতীয় খাদ্য নিগমের ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত
বাণী সরস্বতীঃ সম্পাদিকা, শ্রীমা মহিলা সমিতি
বাসুদেব মোশেলঃ বরিষ্ঠ গবেষক, গবেষণা পরিষদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক
বিপ্লব বিশ্বাসঃ সরকারী কর্মী ও লোক সংগঠক
বিরাট বৈরাগ্য- ডিলিটঃ প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক ও মতুয়া গবেষক লেখক
ভূষণচন্দ্র বিশ্বাসঃ প্রাক্তন কর্মী, এসবিআই
মণীন্দ্রকুমার সরকারঃ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও লেখক
মনোহরমৌলি বিশ্বাসঃ দলিত সাহিত্যের বিদগ্ধ লেখক
রতন নন্দীঃ লেখকও ডিরেক্টর, বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্র
শংকরনারায়ণ চক্রবর্তীঃ প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক ও সাংস্কৃতিক কর্মী
শক্তিনাথ ঝাঃ প্রাক্তন অধ্যাপক, লেখক ও লোকসংস্কৃতি গবেষক

শান্তনু দত্তচৌধুরিঃ অবসরপ্রাপ্ত উপ তথ্য অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শুভেন্দু মাইতিঃ বিদগ্ধ লোকশিল্পী ও সংগঠক
শুভেন্দু শুকুলঃ শিক্ষক ও সাহিত্য সংগঠক
শ্যামাপ্রসাদ ঘোষঃ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও লেখক
সত্যরঞ্জন মন্ডলঃ বিদগ্ধ লোকশিল্পী ও লেখক
সত্যরঞ্জন বিশ্বাসঃ প্রাক্তন শিক্ষক, লোকশিল্পী ও গবেষক
সমর রায়ঃ প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বগুলা কলেজ ও লেখক
সম্বিতি পোদ্দারঃ কবিয়াল সুরেন সরকারের কন্যা
সলিল বিশ্বাসঃ প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালনমেলা সমিতি
সাইমন জাকারিয়াঃ উপপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ
সিদ্ধার্থ বসুঃ জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ও লেখক
সুধাংশুকুমার বিশ্বাসঃ প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক ও লেখক
সুব্রত বিশ্বাসঃ লোকসংস্কৃতি কর্মী, আসাননগর
সুরঞ্জন মিদ্দেঃ অধ্যাপক ও লেখক
সুশান্ত রায়ঃ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, বহিরগাছি
স্বপনকুমার গুহঃ প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, রূপান্তর, বাংলাদেশ
স্বপনকুমার ভৌমিকঃ লেখক, পত্রিকা সম্পাদক ও পরিবেশকর্মী
**ভূমিকা লিখেছেন ড আবুল আহসান চৌধুরি, বাংলাদেশ